পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ

পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ

মোফাখ্‌খার হুসেইন খান

পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস
ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ

পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ

মোফাখ্‌খার হুসেইন খান

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪০৩/ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

বাএ ৩৫০৪
(৯৬-৯৭ গসফো : গবেষণা : ১৫)

পাণ্ডুলিপি
গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক
আশফাক-উল-আলম
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা-১০০০

মুদ্রাকর
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

PABITRA QURAN PRACHAARER ITIHAAS-O-BANGAANUBAADER SHATABARSHA by Dr. Mofakhkhar Hussain Khan, Published by Ashfaque-ul-Alam, Director-in-charge, Research Compilation and Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka-1000, Bangladesh. First edition : February 1997. Price : Taka 120.00 only.

ISBN 984-07-3513-6

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

সূচি

ভূমিকা	সাত
উপক্রমণিকা	১
কুরআন প্রচারের ইতিহাস	৩
কুরআন অনুবাদের ইতিহাস	১১
বাংলা ভাষায় কুরআন প্রচার	১৯
কুরআন বঙ্গানুবাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা	২৫
গিরিশচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুবাদ	৩৫
ব্রিটিশ যুগের বঙ্গানুবাদ	৫৪
পাকিস্তান যুগে কুরআন বঙ্গানুবাদের অগ্রগতি	১১৫
বাংলাদেশ আমলে কুরআন অনুবাদ (১৯৭২–১৯৯৫)	১৪১
গ্রন্থপঞ্জি	১৪৫–২৮৭
সার সংক্ষেপ ও উপসংহার	২৮৮
বর্ণানুক্রমিক তথ্য–সূচি	২৯৯
সংশোধনী	৩০৯
সংযোজন	৩১৫
নির্ঘণ্ট	৩১৭

ভূমিকা

সমগ্র বিশ্বচরাচরের অধিকর্তা ও প্রতিপালক সর্বপ্রদাতা করুণাময় ও কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে এ প্রারম্ভ। সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক, মহান, করুণাময়, কৃপানিধান, বিচার-দিনের অধিপতি একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যই সমগ্র প্রশংসা। তাঁরই প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল মুহম্মদ-এর প্রতি মহান আল্লাহ থেকে শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর বংশধর, অতীতে যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করেছেন এবং আগামী-বিচার দিবস পর্যন্ত যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করবেন তাঁদের প্রতিও আল্লাহ্ শান্তি ও আশীর্বাদ প্রেরণ করুন।

সমগ্র মুসলিম উম্মার মধ্যে ইহা সুবিদিত যে আল্লাহ্ তা'য়ালা মানবজাতির সামগ্রিক বিধানের উদ্দেশে তাঁরই প্রেরিত সর্বশেষ রসুল মুহম্মদ (দঃ) নিকট স্বচ্ছ, সুন্দর, অত্যাকর্ষণীয় ও অননুকরণীয় আরবি ভাষায় পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেন। অবতরণ মুহূর্ত থেকে শুরু করে (৬১০ খ্রি.) অদ্যাবধি মুসলমানগণ রসুলুল্লাহ্ থেকে আল্লাহ্‌র এ বাণীকে গ্রহণ করে, মুখস্থ করে, লিখে রেখে, মুদ্রিত করে, ব্যাখ্যা-ভাষ্যের মাধ্যমে কিংবা অনুবাদ করে পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় সংরক্ষণ করে আসছে। মহান আল্লাহ্ নিজেই তাঁর প্রেরিত বাণীকে সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন : "নিশ্চয়ই আমি এ স্মারক [গ্রন্থ] অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমিই ইহার সুনিশ্চিত সংরক্ষক"। (কুরআন ১৫ : ৯)

সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কুরআন প্রচার ও প্রসার মাধ্যম সম্পর্কিত বিষয়ক একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থপঞ্জির উপর দীর্ঘকাল যাবৎ আমি গবেষণারত আছি। বর্তমানে উপস্থাপিত কাজ "পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ" গ্রন্থটি দীর্ঘ আঠার বৎসর পূর্বে সূচিত গবেষণা "Historical Bibliography of the Holy Qur'an" — এর-ই একটি অংশ। একমাত্র আল্লাহ্‌রই পথে নিবেদিত এ কাজে সাধারণভাবে কুরআন প্রচারের ইতিহাস ছাড়াও বিশেষভাবে বঙ্গদেশে কুরআন প্রচার ও প্রসারের ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে। বঙ্গানুবাদ, বঙ্গানুবাদের মুদ্রণ, প্রকাশন ও সংরক্ষণ কুরআন প্রচারেরই একটি অংশ। উপস্থাপিত গ্রন্থটি কুরআন-বঙ্গানুবাদের সচরিত — গ্রন্থপঞ্জিও (Bio-bibliography) বটে।

সর্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় যতগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে — এ গুলোর একটি সবিস্তার সমীক্ষাও এ পুস্তকের পরিধি। এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হলো বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও কুরআন সম্পর্কিত পুস্তকগুলির সনাক্ত, যাচাই, মূল্যায়ন করে এমনভাবে এগুলির বিবরণ উপস্থাপন করা যাতে পাঠকগণ এগুলির প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান জেনে নিয়ে অতি সহজে অভিষ্ট গ্রন্থ নির্বাচন ও সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

জ্ঞানান্বেষণে অধীত বিষয়গুলির মধ্যে "ঐতিহাসিক গ্রন্থপঞ্জি" খুবই কঠিন। হয়তো আমি এ বিষয়ের যথাযথ গবেষক নাও হতে পারি। সেজন্য আশা করি পাঠকগণ আমার ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করবেন আর পণ্ডিতগণ আমার সীমাবদ্ধতাকে ক্ষমা করে স্ব স্ব অবদানে বিষয়টিকে সমৃদ্ধ করবেন। যিনিই গ্রন্থের ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রদর্শন করে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সুপারিশ করবেন তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ থাকব। কাজটি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে নিবেদিত। আর জ্ঞান-বিজ্ঞান তারই দান। তাঁর কাছ থেকেই আসে সাফল্য ; তাঁকেই আমি বিশ্বাস করেছি, তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন।

বক্ষমান বিষয়ে পূর্বসূরিদের কাজের আলোচনা

কুরআন মুদ্রণ, প্রকাশ ও সম্প্রচারের প্রতি সম্ভবত সর্বপ্রথম মনোযোগ আকৃষ্ট হয় প্রখ্যাত গ্রন্থপঞ্জিকার খ্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিক শ্নুরার-এর। তিনি হ্যালে থেকে ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থপঞ্জি "বিবলিওথেকা এরাবিকা" প্রকাশ করেন। ল্যাটিন ভাষায় প্রণীত এ পুস্তকের "কুরআনিকা" নামক অধ্যায়ে তিনি মুদ্রিত কুরআন, কুরআন বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক ও বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত কুরআনের অনুবাদ তালিকাভুক্ত করেন। তখনও কুরআনের কোনো বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় নি।

ভিক্টর চৌভিন আমাদের শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থপঞ্জিকার। ফরাসি ভাষায় সংকলিত আরবি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থপঞ্জি "বিবলিওগ্রাফি ডেজ ওভরেজেস আরাবেজ"-এর দশম খণ্ডের আখ্যা হলো : লে কোরআন এট লা ট্রেডিশন। এ খণ্ডটি ১৯০৭ খ্রি: প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। এ খণ্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত কুরআন ও হাদিস সম্পর্কিত পুস্তকগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কুরআনের প্রাচ্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদ সমূহের তালিকায় গিরিশচন্দ্র সেন ও নইমুদ্দীন-এর বঙ্গানুবাদ দুটিও এ গ্রন্থে স্থান লাভ করে।

ভারতের দেওবন্দস্থ দারুল উলুম একটি সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শুধু ভারতই নয়, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বহু আলেমই এ মাদ্রাসায় ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত শিক্ষালাভ করেন। দেওবন্দ মাদ্রাসায় মজলিস-ই মা'রিফ আল-কুরআন নামে একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আছে। এ প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো কুরআন-এর পঠন-পাঠন ও গবেষণার উন্নয়ন। ১৯৬০ সালে এ মজলিস সারা বিশ্বে প্রকাশিত পবিত্র কুরআন অনুবাদের একটি গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ কাজটির দায়িত্ব দেয়া হয় এ মাদ্রাসারই অধ্যাপক মুহম্মদ সালিম কাসমী, সৈয়দ আব্দুর রউফ আলী ও সৈয়দ মাহবুব রিজভি-এর উপর। দীর্ঘ সাত বৎসর গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর ১৯৬৮ সালে উক্ত পণ্ডিতত্রয় "জায়েজা তারাজিম কুরআনী" নামে উর্দু ভাষায় ১৮৮ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থপঞ্জি দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকেই প্রকাশ করেন।

উল্লিখিত "জায়েজা"টিতে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় অনূদিত কুরআন অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতীব কৌতূহলের বিষয় এই যে বাংলা ভাষাকে তাঁরা এতই অবহেলার চোখে দেখেন যে, এটিকে ভারতের প্রধান ভাষা সমূহের মধ্যে স্থান না দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সঙ্গে তালিকাভুক্ত করেন। এ গ্রন্থের "বাঙালী তারাজিম' অংশে তাঁরা গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ সম্পর্কে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁরা লেখেন, কোনও উলামা-বোর্ড একটি বঙ্গানুবাদ করলে ১৮৮২ সালে গিরিশচন্দ্র সেন তরজমাটির "নজর-সানী" করেন। নইমূদ্দীনের অনুবাদের তারিখ লেখা হয় ১৮৯৯। মধুমিঞা যে ১৯০১ সালে উর্দু অনুবাদক আবদুল হক হক্কানীর উর্দু তরজমার মুকাদিমার বঙ্গানুবাদ করেন তা অবশ্য এতে লেখা হয়েছে। তাঁরা জানান যে, ১৯৩০ সালে শাহ রফিউদ্দীন দেহলভীর উর্দু তরজমার নাকি একটি বঙ্গানুবাদ হয়েছে। পাকিস্তান হওয়ার পরে আরও হয়ত কিছু তরজমা হয়েছে, তবে তা তাঁদের "সামনে নেহি আ-সেকে"।

উপর্যুক্ত গ্রন্থপঞ্জিগুলি ছাড়াও হিজরি ১৪০০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশের ও পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা কুরআন সংখ্যা বের করে। এ গুলির মধ্যেও বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে বহু সত্য-অসত্য ও আনুমানিক তালিকা পরিবেশিত হয়েছে।

তুর্কীস্থ OIC Research Centre for Islamic History, Art and Culture এর ডাইরেক্টর জেনারেল ইকমেলেদ্দীন ইহ্সানুগ্লু ১৯৮৬ সালে ইস্তানবুল থেকে "World bibliography of the translations ... of the Qur'an" নামে একটি গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে পৃথিবীর যত

ভাষায় কুরআন অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে সব ভাষাই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে বঙ্গানুবাদও স্থানলাভ করেছে। বঙ্গানুবাদ অংশে যে পুস্তকগুলি অনুবাদ হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে তার সবগুলিকেই যদি আমরা কুরআনের অনুবাদ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করি, তবে ইসলাম সম্পর্কিত যে কোনো পুস্তকই হবে কুরআনের অনুবাদ। তদুপরি পাঞ্জাবি ভাষায় কুরআনের একটি অনুবাদকেও এ পুস্তকে বঙ্গানুবাদ বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এই গ্রন্থপঞ্জিটি সম্পর্কে আমার পুস্তক Bibliographic Control of Qur'anic Literature (Dhaka : 1993)-এ সবিস্তার আলোচনা করেছি।

উপরে আলোচিত কাজগুলি হলো কুরআনের সামগ্রিক গ্রন্থপঞ্জি বিষয়ক। এখন আমরা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জি সম্বন্ধে তথ্য তুলে ধরবো।

পাণ্ডুলিপি আকারে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ বা এ বিষয়ক গ্রন্থের বিশেষ কোনো সন্ধান নেই। কাজেই বাংলা পাণ্ডুলিপির মুদ্রিত বা অমুদ্রিত তালিকাসূচিগুলি উক্ত বিষয়ের কোনো সূত্রেরই সন্ধান দেয় না।

বাংলা ভাষায় মুদ্রণ প্রচলন শুরু থেকে (১৭৭৭ —) অদ্যাবধি যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তার কোনো সামগ্রিক সংগ্রহ বাংলাদেশে তো নয়ই পৃথিবীর কোথাও একত্র সংগৃহীত হয় নি। তবে, মুদ্রণ ও প্রকাশনের বিধি নিষেধ আরোপের জন্য জারিকৃত আইন-কানুনের আওতায় সরকারি দফতরে পুস্তক-পুস্তিকার কপি জমা দেয়ার রেওয়াজ গোড়া থেকেই চলে আসছিল। কিন্তু এগুলি সংরক্ষণ ও তালিকা প্রণয়নের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত সামগ্রিক কোনো গ্রন্থপঞ্জিরও অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই ১৭৭৭ থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত কালকে পরিসীমা ধরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পি. এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ "History of Printing in Bengali Characters upto 1866"-এর দ্বিতীয় খণ্ডে উক্ত সময়ে প্রকাশিত পুস্তকগুলির একটি গ্রন্থপঞ্জি উপস্থাপিত করি। এ গ্রন্থপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি পুস্তকই আমি নিজে দেখে পরীক্ষা করে তবে তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছি। ইহা এখনও অপ্রকাশিত।

গ্রন্থ মুদ্রণ, প্রকাশন, বিপণন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে এ কালের মতো সেকালেও আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ কোনো গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু, বিলাতের তৎকালীন প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদগণ ভারত উপমহাদেশে মুদ্রিত পুস্তকগুলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও এদের তালিকা তৈরি করার জন্য চাপ দিয়ে আসছিলেন। পণ্ডিতদের এ চাপের প্রতি নতিস্বীকার করে ১৮৬৬ সালে ভারত সরকার The Printing Press and Newspapers ACT (Act xxv of 1866) জারি করে। এ আইনানুযায়ী প্রতিটি মুদ্রাকরকে মুদ্রিত পুস্তকের তিন তিনটে কপি রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্স-এ জমা দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। রেজিস্ট্রার-এর কর্তব্য হয় পুস্তকগুলির একটি তালিকাসূচি তৈরি করা। আর পুস্তকগুলির এক কপি কলকাতার ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি (ভারতের বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগার), এক কপি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি আর তৃতীয় কপিটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরি) সংরক্ষণের জন্য পাঠানো।

উপর্যুক্ত ব্যবস্থানুযায়ী রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্স ১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে মুদ্রাকরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পুস্তকগুলির তালিকা প্রথমে India Gazette ও পরে Calcutta Gazette-এ Quarterly Supplement হিসেবে Bengal Library Catalogue আখ্যায় প্রকাশ করতে থাকেন। এ কাজটি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। স্বনামধন্য অধ্যাপক আলী আহমদ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর নিয়ে ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ডের দুষ্প্রাপ্য পুথি ও পুস্তক সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কাজে আত্মনিয়োগ

করেন। সেই সময়েই সম্পূর্ণভাবেই স্বীয় উদ্যোগে মুসলিম সাহিত্যের একটি গ্রন্থপঞ্জি তৈরির পরিকল্পনা করেন। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংগ্রহ, পত্র-পত্রিকার বিবৃতি-বিজ্ঞাপন, পুস্তক সমালোচনা ইত্যাদি পরীক্ষা ছাড়াও Bengal Library Catalogue দেখারও সিদ্ধান্ত নেন।

সুন্দরভাবে বাঁধাইকৃত Bengal Library Catalogue-এর একটি পূর্ণাঙ্গ সেট আমি একমাত্র India Office Library-তেই সংরক্ষিত দেখেছি। বাংলাদেশের কোথাও এটি এভাবে সংরক্ষিত হয় নি। তথাপি অধ্যাপক আহমদ বিভিন্ন সম্ভাব্য অসম্ভাব্য অফিসে ধর্ণা দিয়ে উক্ত গেজেটগুলির সঙ্গে বাঁধাইকৃত Supplement দেখে দেখে তাঁর গ্রন্থপঞ্জির সংলেখ তৈরি করেন। অধ্যাপক আহমদের পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের ফল "বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি" আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এক দুর্লভ ও অনন্য অবদান। বাংলা একাডেমী ১৯৮৪ সালে এটি প্রকাশ করে সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে।

অধ্যাপক আহমদের গ্রন্থপঞ্জিটি একটি বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থকার তালিকা। এর শেষে বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারিক আমিরুল মোমেনীন একটি বিষয়ভিত্তিক নির্ঘন্ট তৈরি করে দেন। এ নির্ঘন্টটির সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ক পুস্তক সহজেই বের করে নেয়া যায়। "কুরআন" শীর্ষক বিষয় দেখে সহজেই আমরা কুরআনের বঙ্গানুবাদ গুলির অস্তিত্ব বের করে নিতে পেরেছি।

বিশেষভাবে ইসলাম সম্পর্কিত পুস্তকাবলী সন্ধানের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, আবদুর রাজ্জাক সংকলিত গ্রন্থপঞ্জি "বাংলা ভাষায় ইসলামী পুস্তকের তালিকা" (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০) একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক। গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়নের মূলনীতি অনুযায়ী প্রকাশিত কোনও গ্রন্থের অস্তিত্ব (location) আবিষ্কারের পর ইহাকে সনাক্ত (identify) করে যাচাই (verify) করতে হয়। সনাক্ত ও যাচাইকরণের পর-ই গ্রন্থপঞ্জির সংলেখ্য হিসেবে এর দৈহিক (Physical) ও বিষয়-সংক্রান্ত (intellectual) বর্ণনা তৈরি করতে হয়। আব্দুর রাজ্জাক তাঁর সংকলন তৈরির সময় গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়নের এ মূলনীতিগুলি অনুসরণ না করে যেভাবে যে নাম পেয়েছেন তাই তাঁর গ্রন্থপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই তাঁর গ্রন্থে মওলানা রুহল আমিনের আলিফ-লাম-মীম-পারার তফসিরটি আমরা ফুরফুরার পীর আবু বকরের নামে (পৃ. ৯৯) দেখতে পাই। অতীব ত্রুটিপূর্ণ এ গ্রন্থপঞ্জিটি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়।

গ্রন্থবিদ্যা বা গ্রন্থপঞ্জির অন্যতম একটি শাখা হলো সমীক্ষা। বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের বেশ কয়েকটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে আলোচিত এ সমীক্ষাগুলির মধ্যে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত আমপারার অনুবাদের ভূমিকা অন্যতম। গবেষণার সূত্র হিসেবে এ সমীক্ষাটি অনুবাদগুলির সম্ভাব্য অস্তিত্ব (Probable location) হিসেবে দেখতে হবে। এ গ্রন্থে বিবৃত তথ্যকে প্রকৃত তথ্য হিসেবে ধরে নিলে অনেক ক্ষেত্রেই পাঠকগণ বিভ্রান্ত হবেন।

কবি আবদুল কাদির শুধু কবি, সাহিত্যিক কিংবা গবেষকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাঁর কালের সাক্ষী। তৎকালে প্রকাশিত অসংখ্য পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা তিনি সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। এ সংগ্রহের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বঙ্গানুবাদ কুরআন শরীফও ছিল। প্রধানত স্বীয় সংগ্রহের উপর নির্ভর করেই তিনি ১৯৬১ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত *ইসলামিক একাডেমী পত্রিকার* প্রথম সংখ্যায় "কুরআন মজীদে"র বাংলা অনুবাদ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রত্যক্ষ সূত্রের উপর নির্ভর করে রচিত বলে এ প্রবন্ধে সরবরাহকৃত তথ্যগুলি খুবই নির্ভরযোগ্য।

১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আরাফাত পত্রিকা একটি কুরআন সংখ্যা বের করে। এ পত্রিকায় অধ্যাপক আলী আহমদ "বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে তিনি এমন সব নতুন তথ্য পরিবেশন করেন যা কবি আবদুল কাদির-এর প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

কুরআনের "ঐতিহাসিক গ্রন্থপঞ্জি" বিষয়ে যে অনুসন্ধান আমি চালিয়ে যাচ্ছিলাম তা বিশেষভাবে বাংলা ভাষার জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না। সারা বিশ্বের যেখানেই, যে ভাষায়ই কুরআন সম্পর্কিত পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে তার একটি সামগ্রিক সমীক্ষা ছিল আমার অধীত বিষয়। ইরান ও নাইজেরিয়ায় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে অধ্যাপনাকালীন বছরগুলিতে গ্রীষ্মাবকাশই ছিল আমার তথ্য সংগ্রহের একমাত্র সময়। আর তথ্য সংগ্রহের প্রকৃষ্ট স্থলই ছিল ইউরোপ। তাই আমি প্রতিবৎসরই গ্রীষ্মের ছুটিতে চলে যেতাম ইউরোপের বিভিন্ন স্থানের গ্রন্থাগারগুলি ব্যবহারের জন্য। অনুরূপভাবে ১৯৮১ সালের গ্রীষ্মাবকাশে ইউরোপ থেকে নাইজেরিয়ার বায়ারো ইউনিভার্সিটি কানুতে ফিরে বঙ্গানুবাদ সম্পর্কিত আমার আহরিত নোটগুলির সঙ্গে কবি আবদুল কাদির ও অধ্যাপক আহমদের প্রবন্ধের সঙ্গে মিলানোর পরে দেখতে পাই যে আমার হাতে অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্য এসে গেছে। তাই আমি "A History of Bengali Translations of the Holy Qur'an" নামে একটি প্রবন্ধ লিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Muslim World–এ পাঠালে পত্রিকাটি ইহার এপ্রিল ১৯৮২ (৭২:২) সংখ্যায় প্রকাশ করে।

১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালের হজ্ব সফরের সময় মক্কার উম্মুল কুরা ও মদিনা–র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে তথ্য সংগ্রহ করি। সে সময় উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আমার সতীর্থ ও বন্ধু মুহম্মদ আবদুল লতিফ আমাকে অবহিত করেন যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের উপর অভিসন্দর্ভ লিখে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েরই পি. এইচ. ডি–ডিগ্রি লাভ করেছেন। সংবাদটিতে আমি অতীব আনন্দিত হই। যাহোক, কুরআন সম্পর্কে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলেই যাচ্ছিল। ১৯৮৫ সালের গ্রীষ্মাবকাশে নাইজেরিয়ার বাইরে কোথাও যাওয়া হলো না। এ সুযোগের সদ্ব্যহার করে English Translations of the Holy Qur'an : a bio-bibliographic study এবং Translations of the Holy Qur'an in the African Languages লিখে যথাক্রমে Islamic Quarterly (England) Muslim World (USA)-তে পাঠালে তা' যথাক্রমে ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়।

১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক পদে যোগদান করার পর দেখতে পাই যে মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের পি. এইচ. ডি থিসিসটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন সবেমাত্র "বাংলা ভাষায় কুরআন–চর্চা" আখ্যায় প্রকাশ করেছে। পাঁচশত চৌষট্টি পৃষ্ঠার এ পুস্তকটিতে কুরআন অনুবাদের প্রথম পুস্তক থেকে ভারতবিভাগ কাল পর্যন্ত সময়ে কুরআন সম্পর্কে যত পুস্তক–পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে তার একটি কালানুক্রমিক সমীক্ষা দেয়া হয়েছে। গ্রন্থকার এতে পুস্তক–পুস্তিকাতে অন্তর্ভুক্ত করেছেনই পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত কুরআন সম্পর্কিত প্রবন্ধ এবং অনুবাদও আলোচনা করেছেন।

পি. এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ আকারে মুজীবুর রহমান–এর "বাংলা ভাষায় কুরআন–চর্চা" পুস্তকটি লেখার সূচনা ঘটে ১৯৬৪ সালে। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডিগ্রি প্রাপ্তির ফলে কাজটির সফল সমাপ্তি ঘটে। এতে দেখা যায় গ্রন্থকার চৌদ্দটি বছর এ পুস্তকের পেছনে কাজ করেছেন। পুস্তক প্রকাশ পেতে আরও সময় লাগে চার বছর। সুদীর্ঘ ১৮ বছর পরিশ্রমের পরে তিনি পুস্তকটি প্রকাশে সাফল্য লাভ করেন। অতএব পুস্তকটির কাজে তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন তা' বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ডক্টর মুজীবুর রহমান তাঁর গবেষণা কালে যখন যেখানে যা পেয়েছেন নির্দ্বিধায় যথাযথ রেফারেন্স সহ সংকলন করে দিয়েছেন। কিন্তু সংকলন কালে এ সব তথ্যের সত্য–মিথ্যা যাচাই করেছেন বলে মনে হয় না। ফলে প্রচলিত ভুল তথ্যই তাঁর সংকলনেও স্থান পেয়েছে। উদাহরণ

স্বরূপ তাঁর পুস্তকের সপ্তম পৃষ্ঠায় তিনি লেখেন "প্রাচীন হিন্দি ভাষাই কুরআন-এর প্রথম অনুবাদের গৌরব অর্জন করে ... ৮৮৩ খ্রি:"। এ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি *জাহানে নও*, *তারিখুল সিন্ধ* এবং সর্বশেষে মূল সূত্র বুজুর্গ [অথবা বুজুর্ক] বিন শাহরিয়ার-এর বরাত দিয়েছেন।

ভাষা ও ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থে দেখা যায় যত "প্রাচীন"-ই হোক চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে হিন্দি ভাষার জন্মই হয় নি। তা হলে, নবম শতাব্দীতে "প্রাচীন হিন্দি ভাষা"-য় কুরআন এর অনুবাদ হলো কি করে? উচ্চ কাশ্মীর ও নিম্ন কাশ্মীর-এর মাঝখানের একটি রাজ্যে অনুবাদটি হয়েছিল বলে কথিত। সে রাজ্যের রাজার নাম ছিল "রাজা মাহরুক"। আর ইরাকের এক আলেম এ অনুবাদটি করেছিলেন "রাজা মাহরুক"-এর কাছে মৌখিকভাবে। ভারতবর্ষের, কাশ্মীর রাজ্যের কিংবা পাঞ্জাবের কোনো ইতিহাসেই "রাজা মাহরুক" বলে কথিত কোনো রাজার অস্তিত্ব নেই।

রাজা, রাজ্য এবং ঘটনা যদি সত্যও হয় তবুও আযাইব আল হিন্দ পুস্তকে-বুজর্গ বিন শাহরিয়ার-এর বাচনিক উক্ত অজ্ঞাত ইরাকী আলেম বলেছেন, 'আমি রাজা মাহরুকের নিকট "হিন্দিয়া" ভাষায় কুরআনের "ব্যাখ্যা করেছি।" আরবিতে বক্তব্যটি হল "উফাস্‌সির লাহু" মানে "তাকে আমি [কুরআন] বুঝিয়েছি কিংবা ব্যাখ্যা করেছি। আলেম যদি বলতেন "উতারজিম লাহু" তা হলে আমরা মানে করতে পারতাম "তার কাছে আমি তরজমা করেছি"।

আরবিতে "হিন্দিয়া" শব্দের মানে হলো "ভারতীয়"। এ "ভারতীয়" ভাষাটি কোন্ ভাষা ছিল তা বুজর্গ তার বই-এর কোথাও বলেন নি।

তৃতীয় পক্ষীয় উৎস (tertiary source) থেকে কোনো তথ্য পেলে দ্বিতীয় পক্ষীয় উৎসের (secondary source) মাধ্যমে প্রাথমিক উৎসে (primary source) উত্তরণ করতে হয়। এভাবে উত্তরিত প্রাথমিক সূত্রটির সত্যাসত্য যাচাই-এর মাধ্যমে গবেষণার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হয়। ড. মুজীবুর রহমান সম্ভবত কোনো তথ্যই এভাবে পরীক্ষা করে দেখেন নি। এতে তিনি নিজেও হয়রান হয়েছেন প্রচুর ; অধিকন্তু ভুল তথ্য সরবরাহ করে পাঠকদের তো বিভ্রান্ত করেছেনই ইতিহাসকেও দুষিত করে ফেলেছেন। এ প্রসঙ্গে আমিরুদ্দীন বশুনিয়া সম্পর্কিত তথ্যের উদাহরণ দেয়া যায়। তিনি বাংলা একাডেমী প্রকাশিত আমপারার বঙ্গানুবাদের ভূমিকা আর মতিউর রহমান বসুনীয়ার প্রবন্ধ পড়ে সম্ভবত মূলে না যেয়ে — আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মূল বক্তব্য পরীক্ষা না করেই চলে যান কোলকাতার সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারের ৫০২ ও ৫২০ সংখ্যক গ্রন্থ খুঁজতে। খুঁজে তিনি পান নি। কারণ এ দুটি কপিই গ্রন্থবিদ্যার ভাষায় ভৌতিক কপি (Ghost copies)। তবুও তিনি রায় দিয়ে দিলেন "তিন তিনটে কপি মওজুত ছিল"। ফলে এ ভুল তথ্য শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয় আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

উক্ত ভুল তথ্যের ফলে দেশে কি হয়েছে তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। অধ্যাপক মুজীবুর রহমানের মতোই একজন লেখক আবুল কাসেম ভুঞা। কোথাও আকর্ষণীয় কোনো বিষয় চোখে পড়লে তিনি তাকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করে নিজের ভাষায় লিখে বিভিন্ন জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৯৭৪ সালে আবুল কাসেম ভুঞা কুরআনের অনুবাদ সম্পর্কেও একটি রচনা প্রকাশ করেন। থিসিস লেখাকালে অধ্যাপক মুজীবুর রহমানের হাতে পড়লে তিনি তাঁর গ্রন্থে রচনাটি সম্বন্ধে কড়া সমালোচনায় ভুলতথ্যে পরিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন। পরে ১৯৮৬ সালে ড. মুজীবুর রহমানের 'বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা' প্রকাশ পেলে আবুল কাসেম এ বইটিও পড়ে ফেলেন। মুজীবুর রহমানের তথ্যের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হন। ফলে, ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা 'মদীনা'-য় "কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদক কে?" নামক রচনায় পুনরায় তিনি ড. মুজীবুর কর্তৃক সরবরাহকৃত আমিরুদ্দীন বশুনিয়ার ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুর্কির ড. ইহসানুগলুর World Bibliography ... of translations of the Qur'an সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। ইহসানুগলুও ড. মুজীবুর-এর জালে জড়িয়ে পড়েছেন। এ বিষয়ে আমি আমার Bibliographic Control of Quranic Literature (Dhaka ; 1993) ও Islamic Quarterly (37 :2, second quarter 1993)-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

মুজীবুর রহমান সম্ভবত নিজেও নিজের লেখা ভালোভাবে পড়েন নি। পড়লে তাঁর গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "আলহাজ্ব সাইয়েদ আবদুল্লাহ (১৮৪০-১৯২০)" এই গ্রন্থেরই ২৬ পৃষ্ঠায় "সৈয়দ আবদুল্লাহ (মরহুম)" হয়েও ১৮৬৮ সালে (বাংলা ১২৭৫) আকবর আলি-র "তরজমা আমছেপারা বাঙ্গালা" প্রকাশ করতে পারতেন না। এ বিষয়টি সম্বন্ধে আমরা এ গ্রন্থেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ড. মুজীবুর তার গ্রন্থপঞ্জিটিতে গ্রন্থকার, আখ্যা, প্রকাশক, মুদ্রাকর ইত্যাদির নাম ধাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন। "সেরপুরের" যে প্রেসে গিরিশচন্দ্রের অনুবাদের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয় তার নাম ছিল "চারুযন্ত্র" ; মুজীবুর রহমান লিখেছেন "চারুচন্দ্র প্রেস"। অনুরূপভাবে "বিধান যন্ত্র"-এর নাম একবার লিখেছেন "বিধান প্রেস" আবার লিখেছেন "বিধানচন্দ্র প্রেস।" শুধু তাই নয়, উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে তিনি উদ্ধৃতির ভাষারও পরিবর্তন করেছেন। রেফারেন্স দিতে গিয়ে তিনি রেফারেন্সের আখ্যাও বদল করেছেন। এস্রাইল করমজীর "মিশকাতের বঙ্গানুবাদে গিরিশবাবুর ভ্রম" শীর্ষক প্রবন্ধকে তিনি "বঙ্গানুবাদে গিরিশ বাবুর ভ্রম" লিখেছেন।

ড. মুজীবুর তাঁর গ্রন্থে বহু কথা সম্ভবত অনুমানের ভিত্তিতেও বলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ পুস্তকটির ৪৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় তিনি লিখেছেন যে "শাহ আবদুল কাদির ... কৃত উর্দু তাফসীরের নাম 'মযিহুল কুরআন'? অপর নাম "তাফসীরে মুরাদী"। ... এই তাফসীরে মুরাদী মোট ৭ খণ্ডে সমাপ্ত ১৩০৮ ; দিল্লীর আহমদী প্রেস এবং খাদেমুল ইসলাম প্রেসে মুদ্রিত"। এই তথ্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে তফসির মুরাদিয়ার প্রণেতা হলেন মুরাদুল্লাহ আনসারী সিনবলি ক্বাদরী নকশবন্দী হানাফী। এটি তিনি ১১৮৬ হিঃ খ্রিঃ ১৭৭১ সালে রচনা করেন। পুস্তকটি ১৮৩৪ সালে সর্বপ্রথম কলকাতায় মুদ্রিত হয়। এটি আমপারার একটি পূর্ণাঙ্গ 'তফসির' — 'অনুবাদ' নয়।

উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে যদি আমরা ড. মুজীবুর-এর "বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চার" ত্রুটি বের করতে থাকি তা হলে সম্ভবত সমালোচনাটি অনুরূপই আর একটি গ্রন্থের রূপ ধারণ করবে। মোদ্দা কথা হলো, ড. মুজীবুর রহমানের, পুস্তকটিতে যতটি অনুবাদ বা অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে তার চেয়েও বেশি সংখ্যক ভুলের সমাহার ঘটেছে।

দুঃখের বিষয়, পুস্তকটির সঙ্গে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যাঁরাই জড়িত ছিলেন তাঁরা কেউ এটি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন বলে মনে হয় না। পুস্তকটির প্রকাশনা পরিচালক সম্ভবত পুস্তকে প্রদত্ত বাংলা তরজমার পরিসংখ্যান দেখেই মুগ্ধ হয়ে যান। ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর মহাপরিচালক "নিষ্ঠা সহকারে আদ্যন্ত পাঠ"-এর উপদেশ দিলেও নিজে পাঠ করেছেন এ বিশ্বাস অন্তত আমি করি না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. হাবিবুর রহমান বইটি পড়ে বলেন যে, মুজীবুর রহমান "কোথাও স্বীয় ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হন নি ... কোথাও কোন সিদ্ধান্ত অনুমানের উপর ভিত্তি করে চাপিয়ে" দেন নি। যেকোনো পাঠকই ড. হাবিবুর রহমানের প্রশংসাপত্র ও ড. মুজীবুর রহমানের ভূমিকা পড়লে দেখতে পাবেন উভয় ডক্টরই "স্বীয় ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত।" ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত না হলে ডক্টর মুজীবুর রহমানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কাল উল্লেখের জন্য ড.

হাবিবকে "দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে . . . বিলেতে বসে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে গবেষণা কর্মে ব্যস্ত" থাকার প্রয়োজন হত না। অনুরূপভাবে, "ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত" না হলে ড. মুজীবুর রহমানকেও প্রফেসর আবদুল বারী এর প্রেরণার কথাটি বলতে "গোধুলী বেলা" থেকে "সোনালী সন্ধ্যা" পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতোনা।

ডক্টর মুজীবুর যে "অনেক তথ্য অনুমানের উপর ভিত্তি করে"ই লিখেছেন তা ইতিমধ্যেই আমি দেখিয়েছি। তবে চাপিয়ে দিতে পারেন নি। কারণ গবেষণা ও অনুসন্ধানের শুরুই আছে শেষ নেই।

ড. মুজীবুর রহমান-এর গ্রন্থটি পড়লে মনে হবে এটি একটি মুসাবিদা। প্রকাশের পূর্বে কোনও ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়ে পুস্তকটি আগাগোড়া সম্পাদনা করিয়ে তবে প্রকাশ করা উচিত ছিল। লেখক যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন সম্পাদনা না করে পাশ্চাত্য দেশের কোনো প্রকাশকই পুস্তক প্রকাশ করেনা। পুস্তকের ভাষার সম্পাদনা করলে কখনই গ্রন্থকারের মর্যাদা হানি হয়না। প্রকাশনা জগতে প্রবাদই আছে "সম্পাদক গ্রন্থকার তৈরি করে।"

নিম্নে উপস্থাপিত "পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ" গ্রন্থটিতে দুটি অংশ আছে। প্রথমাংশ বিষয়ের ঐতিহাসিক বিবরণ, আর দ্বিতীয়াংশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কুরআনের বঙ্গানুবাদ এবং কুরআন সম্পর্কিত পুস্তকগুলির বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি।

পুস্তকের প্রথমাংশকে দশটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। "উপক্রমণিকা"-য় বিষয়টি উপস্থাপনের পর পরই বিশ্বব্যাপী 'কুরআন প্রচারের ইতিহাস' বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন প্রচারের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে "কুরআন অনুবাদের ইতিবৃত্ত" স্থান পেয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। স্থান, কাল, ভাষা ভেদে কুরআন প্রচার পদ্ধতির কি পরিবর্তন হয়েছে? এ বিষয়টি সমেত "বাংলা ভাষায় কুরআন প্রচার আলোচিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। পঞ্চম থেকে নবম অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের কালানুক্রমিক সমীক্ষা স্থান পেয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে "বঙ্গানুবাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা" সম্পর্কে আলোচনার পর ষষ্ঠ আধ্যায়ে বাংলায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদটির এক বিশদ আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে। পরবর্তী অনুবাদগুলি সপ্তম অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে কালানুক্রমিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্বশেষ ও দশম অধ্যায়টিতে উপসংহার হিসেবে বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চার একটি সামগ্রিক চিত্রের সার সংক্ষেপের মাধ্যমে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

১৮৬৮ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি (১৯৯৫) বাংলা ভাষায় কুরআন বিষয়ক যত পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে — তার মধ্যে স্বীয় অনুসন্ধানের ফলে যেগুলির অবস্থান নির্ণয় করতে পেয়েছি তার একটি বর্ণনামূলক গ্রন্থপঞ্জি সংকলন করে দিয়েছি দ্বিতীয়াংশে। এ অংশে সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ অনুবাদগুলি কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো হয়েছে। আমপারা অংশে আমপারার সে সব অনুবাদ স্থান পেয়েছে যেগুলি সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ অনুবাদের অংশ নয়। সূরা সমূহের বঙ্গানুবাদ, সূরার নামে বর্ণানুক্রমিক, আয়াতের বঙ্গানুবাদগুলি অনুবাদকের নামের শেষ অংশের বর্ণানুক্রমিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআন সম্পর্কিত ও কুরআনে আলোচিত বিষয় সমূহের গ্রন্থ বর্ণানুক্রমিক বিষয় শিরোনামের অধীন গ্রন্থকারের নামের শেষাংশের বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো হয়েছে।

গবেষণা-পদ্ধতি

এ কাজটি সম্পর্কে বলতে যেয়ে প্রথমেই বলেছি যে, এটি ছিল একটি বৃহত্তর গবেষণার অংশ। অতএব তথ্য সংগ্রহের কাজ পুরাপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাংলা ভাষার কাজটিকে ব্যাপক

কাজটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া হয় নি। বর্তমানে একে আলাদা করে নিয়ে স্বীয় ভাষায় লিখলেও একে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বৃহত্তর কাজ Historical Bibliography of the Holy Qur'an–এর তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। পূর্ণাঙ্গ কাজটির প্রথম খণ্ড Bibliographic Control of Qur'anic Literature (Dhaka : 1993) ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড : History of Printing of the Holy Qur'an ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ চলছে। কাজটির চতুর্থ খণ্ড : English Translations of the Holy Qur'an : a bio-bibliographic Study বর্তমানে এক প্রকাশকের হাতে। অন্যান্য খণ্ডগুলি কম্পিউটারস্থ করা হয়েছে। আল্লাহ্ হায়াত দিলে ইনশাআল্লাহ্ প্রকাশিত হবে।

উপস্থিত সাহিত্য

গবেষণার সাধারণ নিয়মানুযায়ী শুরু থেকেই কুরআন বিষয়ে পৃথিবীর যে কোনোও স্থানে যে কোনো ভাষায় যা কিছু প্রকাশ লাভ করেছে তার ব্যাপক অনুসন্ধান করা হয়েছে। এভাবে অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত তথ্যাবলী যথাযথ রেফারেন্স সমৃদ্ধ করে সংগ্রহ করা হয়েছে। যে সমস্ত ভাষায় আমার দখল নেই সে ভাষায় লেখা উপকরণগুলি সুযোগ্য ভাষাজ্ঞানীদের দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নিয়েছি। এ তথ্যগুলির মধ্যে যেগুলি কুরআন, কুরআনের অনুবাদ, কুরআনের বিষয়াবলী কিংবা কুরআন সম্পর্কিত পুস্তক সেগুলি দৈহিক ভাবে পরীক্ষা করে AACR II অনুযায়ী গ্রন্থ বিবরণী তৈরি করেছি। যে সমস্ত পুস্তক প্রথমানুবাদ, প্রথম সংস্করণ ও দুষ্প্রাপ্য -– সেগুলির ক্ষেত্রে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করে সংলেখ তৈরি করে রেখেছি।

যে সমস্ত পুস্তক বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না সেগুলি সাহিত্যের, মুদ্রিত তালিকাসূচি কিংবা প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থপঞ্জির সঙ্গে আড়াআড়ি পরীক্ষা ও তুলনামূলক বিচার করে রেখে দিয়েছি। এভাবে গ্রন্থটির দৈহিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে, অন্তত দুটি প্রমাণ না পাওয়া গেলে একে ভৌতিক পুস্তক (ghost title) মনে করে বাদ দিয়েছি।

গ্রন্থকার ও অন্যান্য নাম–ধাম লেখায় আমি গ্রন্থে যেভাবে আছে সেভাবেই লিখেছি। একই গ্রন্থকার একাধিক ভাবে নাম লিখলে মূল ভুক্তিতে একটি বানান লিখেছি কিন্তু Individual পুস্তকের ক্ষেত্রে পুস্তকের বানান রেখে দিয়েছি।

সংলেখ তৈরিতে নিয়ম–পদ্ধতির ব্যতিক্রমও হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। সমস্ত পুস্তকটিই রচিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আহরিত মাল–মসলার মাধ্যমে। গ্রন্থাগার, ব্যক্তিগত সংগ্রহ, গ্রন্থ–মেলা, বই–এর দোকান এবং দ্বিতীয় পাক্ষিক উৎস — এসব ক'টি সুযোগই নেয়া হয়েছে এ গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলনে। সময় ও সুযোগের অভাবে অনেক সময় হয়তো ত্রুটি–বিচ্যুতি হয়ে যেতেও পারে। উদাহরণস্বরূপ হয়তো কোনও একটি পুস্তক দেখতে পেলাম কারও হাতে কোনও বিমান বন্দরে — সময়ের স্বল্পতার জন্য তখন হয়তো স্কেল দিয়ে মেপে ঝুপে, প্রিন্টার্স মার্ক অবলোকন করে সংলেখ লেখার সুযোগ নেই, কোনো সময় এমনও হয়েছে যে সংলেখটি বই–এর দোকানীর অসহযোগিতার দরুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতের তালুতে লিখে নিতে হয়েছে তবে এগুলি হলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

এ গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহকালে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলির সংগ্রহ পরীক্ষা করার সুযোগ হয়েছে। গ্রন্থ সংগ্রহের সুনির্দিষ্ট কোনো নীতির অভাবে প্রায় প্রতিটি গ্রন্থাগারের সংগ্রহই বিক্ষিপ্তভাবে আহরিত। তদুপরি কোনো গ্রন্থাগারেরই তালিকাসূচি নেই। কাজেই বই থাকলেও এগুলি বের করে নেয়া খুবই দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষেরই উচিত এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

এ পুস্তকে গ্রন্থকার, প্রকাশক বা অন্যান্য ভাবে জড়িত থাকার কারণে বহু ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তিরই নাম উল্লেখে নামের সঙ্গে কিংবা পরে "শ্রদ্ধেয়, জনাব, সাহেব, মনীষী, বাবু" ইত্যাকার সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করি নি। আধুনিককালে এ জাতীয় শব্দাবলী উপাধি হিসেবে নামের সঙ্গে জড়িত না থাকলে সাহিত্যকর্মে ব্যবহৃত হয় না। সেজন্য আশা করি তাঁরা আমার অপরাধ নিবেন না।

এ পুস্তকের কাজে বহু ব্যক্তি আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। আমার এ কাজে সর্বপ্রধান উদ্যোগী হলেন আমার প্রিয় শিক্ষক বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির প্রথম গ্রন্থাগারিক ও ইসলামিক একাডেমীর প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক আহমদ হুসাইন। তাঁরই নির্দেশে আমি এ গবেষণায় হাত দিই। পরে আমার পি. এইচ. ডি-র গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ও প্রিয় শিক্ষক J. D. Pearson আমাকে উৎসাহিত করেন।

গবেষণা কাজ চলা কালে বহু ব্যক্তি তাঁদের সংগ্রহ সম্ভার ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। অনেকে পরের কাছ থেকে ধার করেও পুস্তকাদি আমার বাড়ি পর্যন্ত বহন করে নিয়ে এসেছেন। অনেকে কোনও পত্রিকায় কোনো প্রবন্ধ দেখতে পেলে তা নিজ খরচে ফটোকপি করে আমার বাড়িতে পৌছে দিয়ে গেছেন।

বাংলাদেশের এবং বাইরের সকল গ্রন্থাগার কর্মীই আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। এ সব গ্রন্থাগার কর্মীগণ আমার সহকর্মী তাই সর্বত্রই তাঁরা আমার প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়েছেন।

এ গবেষণা কর্মের অযুহাতে আমি আমার মাতা-পিতাকে গ্রীষ্মাবকাশে তাঁদের কাছে আমার উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত করেছি। এখন যখন আমার গবেষণা লব্ধ ফল গ্রন্থিত হতে যাচ্ছে তখন তাঁরা আর এ দুনিয়াতে নেই। প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ তুমি আমার পিতা মুনসুর বিন নওয়াব ও মাতা তাবেন্দা বিনতে একরাম-কে তোমারই উদ্দেশে নিবেদিত এ কাজের জন্য পুরস্কৃত কর।

আমার স্ত্রী রওশন আরা বিনতে খানবাহাদুর ফজলুর রহমান কাজের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত শুধু ত্যাগ স্বীকারই করেন নি সব সময়ই আমাকে তাগিদ দিতে থাকেন যাতে আমি আমার গবেষণা লব্ধ ফল জনসমক্ষে প্রকাশ করি।

বাংলা ভাষায় যখন এ নিবন্ধটি লিখতে শুরু করি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি বিভাগের প্রধান ও বর্তমানে অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিঞা আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। উক্ত গ্রন্থাগারেরই অফিসার আবদুল হকও অনেক পুস্তক অনুসন্ধান করে এগুলির খসড়া সংলেখ তৈরি করে দিয়ে আমার সময় বাঁচিয়ে দিতেন। অতি তাড়াতাড়ি হাতের লেখাগুলি উক্ত গ্রন্থাগারেরই আকিজউদ্দিন হাসিমুখে টাইপ করে দিতেন। তাড়াহুড়া ছিল বলে হুমায়ুন কবীরও কিছু অংশ ডিকটেশন থেকে টাইপ করেন। পরে খোরশেদ আলমও এ কাজে শরিক হন।

বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারের আমিরুল মোমেনীন বাংলা সাহিত্য সেবীদের কাছে এক সুপরিচিত ব্যক্তি। প্রথমে বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ড, পরে বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারে বিগত বত্রিশ বৎসরে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ থেকে শুরু করে এ নগণ্য গ্রন্থকার পর্যন্ত বাংলাদেশে এমন কোনো কবি সাহিত্যিক ও গবেষক নেই যে সেখানে গেলে আমিরুল মোমেনীন-এর দক্ষতাসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার সেবা, বরাতী সেবা, সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে থাকেন নি। আমার এ গ্রন্থটির ক্ষেত্রেও যদি তিনি এগিয়ে না আসতেন তবে আমার এ কথাগুলি অলিখিতই থাকত।

বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক মোহাম্মদ হারুন-উর রশিদ-এর সময় এ গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য গৃহীত হয়েছিল। বর্তমান মহাপরিচালক প্রফেসর মনসুর মুসা বইটি প্রকাশে যে

উপক্রমণিকা

বিশ্বব্যাপী কুরআন প্রচারের মাধ্যমে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা বা ইসলামি ভাবধারার আওতাধীন করাই ছিল মহানবী ও তাঁর অনুসারিদের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে কাজে পরিণত করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা থেকেই কুরআনের সংগ্রহ সংরক্ষণ ও সম্প্রচারের অতীব সুশৃঙ্খল অথচ সুদক্ষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ফলে আজ সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছর পরেও পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণ অক্ষত ও অবিকৃত থেকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে সরল, সঠিক ও সার্বিক জীবন-পদ্ধতির নির্দেশ দিচ্ছে।

পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণ ও বিশ্বব্যাপী এর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই, রসূলুল্লাহ (সা:) ও তাঁর অনুসারিগণ যেরূপ সুদক্ষ, সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তা পর্যালোচনা করে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। কখনো একটির পর একটি, কখনো বা যুগপৎভাবে কাজগুলো এমন বিজ্ঞানসম্মতরূপে সম্পন্ন হয়েছে যে, ইসলামের শত্রুরাও কুরআন ও কুরআনি ধর্ম ইসলামের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আজও কোনো প্রশ্নই তুলতে পারে নি।

কুরআন নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎভাবে এর সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রক্রিয়াটি ছিল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় কালের জন্য। প্রয়োগের জন্য কুরআনের তাৎক্ষণিক ব্যাখ্যার যেমন প্রয়োজন ছিল, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিশুদ্ধভাবে এর মূলপাঠ সংরক্ষণের বিষয়টি। কাজেই ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরআন সংরক্ষণের জন্য মৌখিক ও লিখিত এ উভয় পদ্ধতিই গৃহীত হয়।

কুরআন বোঝা এবং তা কাজে পরিণত করার জন্য কুরআনের ব্যাখ্যারও জরুরি প্রয়োজন ছিল। রসুলুল্লাহ (সা:) ও তাঁর সঙ্গিগণ কুরআনের ব্যাখ্যা-ভাষ্যও প্রদান করতেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যা-ভাষ্য যাতে কুরআনের মূল পাঠের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে না যায়, সেজন্য এক্ষেত্রে কেবল মৌখিক পদ্ধতিই ছিল অনুমোদিত।

আরবিতে অবতীর্ণ হলেও কুরআন বিশ্বমানবের উদ্দেশেই প্রেরিত। কিন্তু আরবদেশের বাইরে জনগণ তো আরবি বোঝে না। কাজেই কুরআন নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ বিষয়েও বিধি-বিধান প্রচলিত ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। রসুলুল্লাহর (সা:) প্রত্যক্ষ নির্দেশ না থাকতেও তাঁর দ্বি-ভাষী অনুসারীরা কুরআনের বাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যে এটি অনুবাদের সাহায্যে বুঝে নিতেন তা সবাই স্বীকার করবেন। তাছাড়া, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ দান করে এবং সংশ্লিষ্ট ভাষায় জ্ঞানসম্পন্ন লোকদেরকে দূত হিসেবে নিয়োজিত করার মাধ্যমে রসুলুল্লাহ (সা:) নিজেই কুরআন-অনুবাদের দ্বার উন্মোচন করেন।

পবিত্র কুরআনের দু'টি দিক রয়েছে : একটি এর মূল পাঠ এবং অন্যটি এর অর্থ বা ব্যাখ্যা। প্রাচীন ঐশী গ্রন্থগুলোর মতো যাতে কুরআনের বাণীও লুপ্ত বা বিকৃত হয়ে না যায়, সেজন্য মূল পাঠকে অক্ষত রাখার জন্য মূল পাঠের অবিকল অনুবাদ করে বাইবেলের অনুকরণে 'বাংলা কুরআন' প্রচলনের অনুমোদন ইসলাম প্রাথমিক যুগেও যেমন দেয় নি, তেমনি আজও দিচ্ছে না। শুধু তা-ই নয় কুরআনের কোনো লিখিত অনুবাদের রীতি বা অনুমোদনও ইসলামি

দেশগুলোতে প্রচলিত ছিল না। ফলে, বঙ্গদেশের মতো পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই মুখে মুখে কুরআন অনুবাদ প্রচলিত ছিল।

কুরআনের আহকাম বুঝতে হলে তো আর কুরআনের আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়োজন নেই ; তাই ইরানের বাদশাহ নূহ্ ও তাঁর জনগণ তাবারীর তফসিরের ফার্সি অনুবাদেই সন্তুষ্ট থাকলেন। তুরস্কের আলেমগণ আবার এ তফসিরের মূল আরবিতেও গেলেন না ; তাবারীর ফার্সি অনুবাদকেই তুর্কি ভাষায় ভাষান্তরিত করে তুষ্ট রইলেন।

হিন্দুস্তানের শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী কুরআনের একটি ফার্সি অনুবাদ প্রস্তুত করলেন বলে সমকালীন আলেমদের প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হন। কিন্তু তাঁরই সুযোগ্য তনয় রফিউদ্দীন ও আবদুল কাদির আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে পিতার ভাষ্যকে হিন্দুস্তানিতে রূপ দিলেন।

অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও কুরআনের বাণী প্রায় হাজার বছর ধরে বাচনিক অনুবাদেই প্রচলিত ছিল। তবে মধ্যযুগের কতিপয় মুসলিম কবি দেশাচার লঙ্ঘন করে কুরআনের বিভিন্ন কাহিনীকে লিখিত ভাবে কাব্যরূপ দিচ্ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীকে বাংলার নব জাগরণের যুগ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। গদ্যের প্রচলন, খ্রিস্টান পাদ্রিদের প্রচার, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন, সনাতনী ও প্রগতিশীল হিন্দুধর্মের ঘাত-প্রতিঘাত, ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব বঙ্গদেশে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে।

তথাকথিত এ নবজাগরণ বাংলার মুসলিমদেরও প্রভাবিত করে। শির্ক ও বিদ্আতের প্রাদুর্ভাব বঙ্গদেশে ইসলামের ভিত্তিকে প্রকম্পিত করে তোলে। ফলে অচিরেই কয়েকজন ধর্মনেতা প্রবল সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শুধু মৌখিক প্রচারই সম্পন্ন করলেন, কিন্তু স্বদেশী ভাষায় কুরআন অনুবাদ তো দূরের কথা, এই সংস্কারকগণ মাতৃভাষায় কোনো পুস্তক রচনায়ও মনোনিবেশ করলেন না।

বিদেশী খ্রিস্টান পাদ্রি, স্বদেশী খ্রিস্টান ও নববিধানি ব্রাহ্মরা এ অভাবের সুযোগ গ্রহণ করল। বাংলা ভাষায় ইসলামি পুস্তক অনুবাদ বা রচনা ও কুরআনের তরজমা করে এঁরা মুসলিম জনগণের মধ্যে তা' প্রচার করতে লাগল। তাদের এসব সাহিত্য-কর্মের উদ্দেশ্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছিল স্ব স্ব ধর্মীয় দর্শন, শিক্ষা ও ভাবধারা মুসলিম জনগণের মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ করিয়ে ইসলামি ভাবধারাকে কলুষিত করা।

বাংলাদেশে ইসলামি সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তির অভাব কোনো কালেই ছিল না। কিন্তু তাঁরা শরিয়ত বিরোধী মনে করে আরবি ও ফারসি ভাষায় আবদ্ধ এ-জ্ঞানের দ্বার বাঙালিদের জন্য উন্মুক্ত করতে চাইলেন না। সৌভাগ্যবশত গোলাম আকবর আলি ও আমিরুদ্দীন বশুনিয়ার মতো দু'জন মুসলিম এ-কাজে এগিয়ে এলেন, কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাঁদের উদ্যম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। ফলে পৃথিবীর বহু সংখ্যক ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও সর্বপ্রথম সমগ্র কুরআন অনুবাদের কৃতিত্ব চলে গেল একজন অমুসলিম ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক গিরিশচন্দ্রের হাতে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বঙ্গদেশেও এ অবস্থা খুব দীর্ঘদিন অব্যাহত রইল না। অমুসলিমদের ত্রুটিপূর্ণ ও অনেক ক্ষেত্রে বিদ্বেষমূলক অনুবাদের মোকাবিলায় সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন মওলানা নঈমুদ্দীন। তাঁর এ-দৃষ্টান্তমূলক প্রচেষ্টা অন্যান্য আলেমকে অনুপ্রাণিত করল। ফলে আজ আমরা কুরআনের একত্রিশটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাঠের সৌভাগ্য লাভ করেছি।

কুরআন প্রচারের ইতিহাস

কুরআনের গুরুত্ব

ইসলাম হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যাতে আমরা সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি সকল কিছুরই রূপায়ণ দেখতে পাই। কোনো জীবনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান ও আইন-কানুন অত্যাবশ্যক। পবিত্র কুরআন এ জীবনব্যবস্থা পরিচালনার মৌলিক আইন-কানুন ও বিধি-বিধান ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সাধারণ জীবনব্যবস্থা পরিচালনা ছাড়াও কুরআনের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রতিদিন পাঁচবার নামাজে পবিত্র কুরআনের অংশবিশেষ মূল আরবিতে পাঠ করতে হয়। এজন্য ইসলাম যেখানেই গিয়েছে, আরবিতে গ্রন্থিত এর কোষ-গ্রন্থটি আর এর ভাষাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। ফলে, বিভিন্ন দেশে মানবগোষ্ঠীকে ইসলাম কেবল ধর্মান্তরিতই করে নি বরং সেখানকার ভাষাকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। কুরআনের প্রভাবেই আফ্রিকা মহাদেশের এক তৃতীয়াংশ লোক **আরবি-ভাষীতে** পরিণত হয়েছে। তদুপরি এশিয়া ও আফ্রিকার বহু ভাষা, যথা : ফুলানি, হাউসা, উলফ, সোয়াহিলি, উর্দু, ফার্সি, পশতু, সিন্ধি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি আজও আরবি বর্ণমালায় লেখা হয়। এই সেদিনও তুর্কি, মালয়ি ও ইন্দোনেশীয় ভাষা আরবিতে লেখা হতো[১]। সীমাবদ্ধভাবে হলেও, বাংলাও এদিক থেকে ব্যতিক্রমী নয়। আরবি হরফে বাংলা ভাষার কিছু পুঁথিও আবিষ্কৃত হয়েছে। আরবি বর্ণমালায় বাংলা লিখন ও চর্চার প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ না করলেও প্রায় নয় সহস্রাধিক আরবি, ফারসি শব্দ ধার করে এ ভাষা ব্যাপক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে[২]।

কুরআনের মৌখিক প্রচার

জীবনব্যবস্থার বিধান সংবলিত এই কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য ছিল এর আদেশ-নির্দেশাবলী তাৎক্ষণিকভাবে কাজে পরিণত করা। পবিত্র কুরআনের বিধান কিরূপ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হতো, কেবলা পরিবর্তন এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একদিন রসুলুল্লাহ (সা:) যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করছিলেন, তখন কাবা শরিফের দিকে কেবলা পরিবর্তনের আয়াত[৩] নাজিল হলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই নামাজে থাকা অবস্থায়ই তিনি কেবলা পরিবর্তন করলেন অর্থাৎ কাবার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাকি নামাজ সমাপ্ত করলেন।

৬১০ খ্রি. থেকে ৬৩৩ খ্রি. এই তেইশ বছর ধরে পবিত্র কুরআন ক্রমান্বয়ে নাজিল হয়। কুরআনের প্রতিটি অংশ নাজিল হওয়ার অব্যবহিত পরই অর্থাৎ আয়াতের যে গুরু চাপ তাঁর দেহ-মনের উপর পড়তো তা লঘু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ (সা:) তা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সামনে আবৃত্তি করতেন। অধিকন্তু নাজিলকৃত আয়াতগুলো তিনি

তাঁর অনুগামীদের মুখস্থ করারও নিদেশ দিতেন। পবিত্র কুরআন মুখস্থ করারই রেওয়াজ অদ্যাবধি চলে আসছে। ফলে, আমরা পৃথিবীর প্রতিটি দেশে অসংখ্য হাফিজের সাক্ষাৎ লাভ করি। এঁরা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একই ভাষায়, একই উচ্চারণে একই ঐশীবাণী আবৃত্তি করে থাকেন।

কুরআন নাজিল হওয়ার সময়ে মক্কায় ও মদিনায় লিখন-সামগ্রী ছিল অপ্রতুল, আর চীন দেশের সদ্য আবিষ্কৃত মুদ্রণ-পদ্ধতি ছিল অজানা[৪]। ফলে, মৌখিক প্রচারই প্রাধান্য পায়। রসুলুল্লাহ (সা:) নিজেই কুরআন শিক্ষা ও ইহার প্রচার-পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ দিতেন। এভাবে তাঁর মদিনা অবস্থানের প্রথম দিকে রাবী (আ:) গোত্রের লোকদেরকে সাক্ষাৎ দানকালে রসুলুল্লাহ্ (সা:)-এর সমাপনী ভাষণের একটি কথা ছিল : "যা বললাম তা মনে রেখো, আর যাদের রেখে এসেছ তাদের কাছে প্রচার করো"[৫]। অন্য দর্শনার্থীদের প্রতিও তাঁর উপদেশ ছিল : "নিজেদের মধ্যে ফিরে যাও, আর এগুলো শিক্ষা দাও"[৬]। বিদায় হজ্জে উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল অনুপস্থিতদের জন্য তাঁর বাণী বহন করে নিয়ে যাওয়ার[৭]।

মহানবীর শিক্ষা ও দীক্ষা প্রতিটি মুসলিমকে প্রচারক শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে বিভিন্ন দেশে পবিত্র কুরআনের বাণী প্রচারে অনুপ্রাণিত করে। আরবদের অসাধারণ স্মরণশক্তির সুনাম দুনিয়ার সর্বত্র ; এক এক ব্যক্তি অগণিত তথ্য, কবিতা, কুলজি ইত্যাদি মনে রাখতে পারত। আরবদেশে লেখার প্রচলন ছিল খুবই সীমিত। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র আরব সংস্কৃতি, ইতিহাস, কুলজি ও সাহিত্য মুখে মুখেই প্রচার লাভ করেছিল। দুর্লভ স্মরণশক্তির অধিকারী এই আরবগণ দেশে-বিদেশে যখন যেখানে যেতো, রসুলুল্লাহ্-র শিক্ষা ও অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যবসায় বা পেশাগত বা প্রশাসনিক কাজের ফাঁকে তারা তথায় কুরআনের বাণী তথা ইসলাম প্রচার করত অপরিহার্য কর্তব্যরূপে। এমনি করে তারা এশিয়া-আফ্রিকা মহাদেশে পবিত্র কুরআনের বাণী প্রচারের মহান দায়িত্ব গ্রহণ এবং পালন করেন[৮]।

আমরা খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর কথা বলছি। এশিয়া-আফ্রিকা মহাদেশে সামাজিক, ব্যক্তিক এবং রাজনৈতিক জীবনে যোগাযোগের মাধ্যমই ছিল মূলত মুখনিঃসৃত বাক্য। তাছাড়া এসব দেশের অধিকাংশ ভাষারই কোনো বর্ণমালা ছিল না। ফলে, পবিত্র কুরআন প্রচারে মৌখিক সাহিত্যই (oral literature) ছিল তৎকালীন মাধ্যম[৯]।

ক্রমে কুরআন ও কুরআন শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব স্থানীয় আলেমদের উপর বর্তায়। এঁরা ইসলাম ও ইসলামের মূল পুস্তক কুরআনের বাণী প্রচারে বাচনিক মাধ্যমকেই বেছে নেন। বর্তমান কালেও বিভিন্ন দেশের ইসলামি সমাজে ওয়াজের মাহফিল, মসজিদ, রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে মৌখিক ভাবেই কুরআনের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য প্রচার করা হয়ে থাকে। প্রচারের পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে ইসলামিকরণকে সুদৃঢ় করা তথা প্রতিষ্ঠান গঠন, ইসলাম প্রচারোপযোগী বিদ্বজ্জন তৈরি এবং কুরআনের নীতি ও পথ সম্প্রচারের সহায়ক এশিয়া ও আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত অগণিত কুরআনি বিদ্যালয় বা কুরআনিয়া মাদ্রাসা

আজও বিদ্যমান। অদ্যাবধি এ-জাতীয় বিদ্যালয়গুলোতে মৌখিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এ বিদ্যালয়গুলো বর্তমান কালেও ছাত্রদিগকে মূলত কুরআন পড়া, তাজবিদ অর্থাৎ সুষ্ঠু আবৃত্তি ও মুখস্থ করা শিক্ষা দেয়[১০]।

কুরআন প্রচারে লিখিত মাধ্যম

কুরআন প্রচারের দ্বিতীয় মাধ্যম হলো লেখা। রসুলুল্লাহ (সা:) স্বয়ং লেখার প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন। সর্বাবস্থায় এমন কি ভ্রমণকালেও তিনি তাঁর সাথে দু'একজন কাতিব বা লিপিকর এবং হাতের কাছে কিছু লিখন সামগ্রী রাখতেন[১১]। কারণ কখন যে কুরআন নাজিল হবে তার কোনো নির্ধারিত সময় ছিল না। নাজিল হওয়ার সাথে সাথে কুরআনের আয়াতগুলো মুখস্থ করিয়ে দেয়া যেমন, তেমনি লিখিয়ে দেয়ার অপরিহার্য দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন রসুলুল্লাহ (সা:) স্বয়ং। বিশ্বাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লিপিকরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে, কারণ রসুল (সা:)-এর মুখনিঃসৃত আয়াতের শ্রুত লিপি প্রণয়ন অত্যন্ত সম্মানজনক বলে স্বীকৃতি লাভ করে[১২] এবং লিখন শিক্ষার আগ্রহ বেড়ে যায় সাহাবিদের মধ্যে। এজন্য আরবি লিপি-শিল্পও দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং বহু সংখ্যক লিখন শৈলীর উদ্ভব হয় — যথা প্রাথমিক কুফিক, পূর্ব কুফিক, পশ্চিমী কুফিক, মাগরেবি, মুহাক্কাক, নাস্খি, নাস্তালিক, তালিক, রায়হানি তাওয়াক্কি, তুলুস, সুদানি, আজামি, ফরিদি[১৩] ইত্যাদি। কুরআন নকল এবং প্রচারই এত সব আঞ্চলিক লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। কুরআন নকলের ব্যবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল ইসলামি দেশেই প্রচলিত ছিল। এখন পর্যন্ত অনেক দেশেই কুরআনের হস্তসম্পাদ্য প্রতিলিপি তৈরির রেওয়াজ প্রচলিত আছে এবং অনেক মুসলিম প্রখ্যাত ব্যক্তি বা লিপিকরের হাতে-লেখা কুরআন মজিদ সংগ্রহ করতে পারলে নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

হস্তলিখিত কুরআন সর্বকালেই ছিল দুর্মূল্য, ফলে, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। নিখুঁত ও ত্রুটিহীনভাবে কুরআন নকল করতে একজন লোকের কম করে হলেও ছয়মাস সময় লাগে। তাই, কোনো নকলনবিশই সম্ভবত আজকের দিনে পাঁচ ছয় হাজার টাকার কমে এক জিল্দ কুরআন তৈরি করে দিতে রাজি হবেন না। সম্প্রতি এক গবেষণায়[১৪] জানা গেছে যে, প্রাচীন কালেও এক জিল্দ কুরআনের মূল্য ছিল একটি অশ্বের মূল্যের সমান। সুতরাং নিজে নকল করে নিতে না পারলে কোনো সাধারণ আয়ের লোকের পক্ষে কুরআনের একটি কপি সংগ্রহ করা কখনোও সম্ভবপর হতো না। ফলে, মুদ্রণই ছিল এ সমস্যার একমাত্র সমাধান। কিন্তু নানাবিধ কারণে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যন্ত মুসলিম জগতে পবিত্র কুরআন মুদ্রণ সম্ভব হয় নি।

মৌখিক ও লিখিত এ উভয় পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা এত সুদৃঢ় হয় যে, আজ চৌদ্দশ' বছর পরেও কুরআনের পাঠে একটি বর্ণও এদিক সেদিক হয় নি[১৫]। জাকার্তার একজন ক্বারী, ঢাকার এক হাফিজ, কাযাকিস্তানের একজন ইমাম কিংবা

রাবাতের একজন সাধারণ পাঠক কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত একই ভাষায় মূলত একই উচ্চারণে পাঠ করে। কুরআনের মূল পাঠের যাতে কোনো ব্যতিক্রম না হয়, আল্লাহর বাণী যাতে কুলষিত না হয়, সেজন্য সদাজাগ্রত মুসলিম সমাজ বক্ষে ধারণ করে কুরআনের সংরক্ষণ করে এসেছে বরাবর। আল্লাহ্ নিজেকে শেষ কিতাব কুরআনের হেফাজতকারী বলে ঘোষণা করেছেন[১৬] এবং তিনি নিখুঁত ভাবে এ দায়িত্ব পালন করেছেন শেষ নবীর উম্মতের মাধ্যমে।

কুরআন মুদ্রণ : লিখন পদ্ধতিরই সম্প্রসারিত রূপ

আরবি লিখন পদ্ধতি এমন যে, প্রাথমিক যুগের ব্লক-মুদ্রণ কিংবা পরবর্তীকালের লেটার প্রেস পদ্ধতিতে কুরআন মুদ্রণে ভুল-ভ্রান্তির প্রচুর অবকাশ ছিল।[১৭] কিন্তু সৌভাগ্যবশত ইসলামি দেশগুলোতে আলেমগণের বিরোধিতায় কুরআন-মুদ্রণ তখন প্রচলিত হয় নি। বিভিন্ন দেশে ক্রমান্বয়ে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অমুসলিমদের মধ্যেও এর চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে কুরআনের যে বিপুল সংখ্যক প্রতিলিপির প্রয়োজন হয়ে পড়ল। হস্ত-লিখন পদ্ধতিতে তার চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। আল্লাহ্ই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে লিথো-মুদ্রণ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে হাতে লেখা কুরআনুল করিমকে সরাসরি মুদ্রণপাতে বদলি এবং পাতের সাহায্যে এর মুদ্রণের কাজ খুবই সহজসাধ্য হয়[১৮]। ফলে, ইরানের অন্তর্গত শিরাজ ও তেহরানের মুদ্রাকরগণ অচিরেই এ সুযোগ গ্রহণ করেন। এঁরা কুরআন মুদ্রণের আদিস্থল রাশিয়া সেন্ট পিটার্সবার্গে গিয়ে লিথো-মুদ্রণ পদ্ধতি শিক্ষা করেন। তাঁরা দেশে ফিরে এসে ১৮৩০ সালের দিকে লিথো পদ্ধতিতে কুরআন মুদ্রিত করে প্রকাশ করতে থাকেন।[১৯] ভারত উপমহাদেশ তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির করতলগত। কোম্পানি নিজেদের কাজকর্মের সুবিধার জন্য ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রণের প্রচলন করেন।[২০] এর ফলে যদিও জ্ঞানের দ্বার এদেশেও খুলে যায় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের লেটার-প্রেস মুদ্রণ-পদ্ধতি আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষার অনুকূলে ছিল না, যদিও প্রচুর বইপত্র এসব ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে। লেটার প্রেসে মুদ্রিত কুরআনের কপিতে অগণিত মুদ্রণ-প্রমাদ দেখা যায়। সৌভাগ্যবশত ১৮২৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই তাদের কাজের সুবিধার জন্যই লিথো-মুদ্রণ পদ্ধতির প্রচল করে।[২১] অচিরেই কোলকাতা, বোম্বে এবং লক্ষ্ণৌর মুসলিম মুদ্রাকরগণ লিথো পদ্ধতির মাধ্যমে পবিত্র কুরআন, এবং আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় কুরআন বিষয়ক প্রচুর পুস্তক প্রকাশ করতে থাকেন।

রেকর্ডিং পদ্ধতি : মৌখিক পদ্ধতির সম্প্রসারণ

কুরআনের প্রচার প্রসার এবং সংরক্ষণের মাধ্যম হিসেবেও লিখন পদ্ধতি আজও প্রচলিত। আমাদের মনে হয় এটা চিরকালই থাকবে। অডিও ডিস্ক, কিংবা অডিও ক্যাসেট[২২] যেমন মৌখিক পদ্ধতিকে আরো দৃঢ় করেছে, তেমনি ফটো অফসেট, ফটো-ডুপ্লিকেশন, ফটোকম্পোজিশন,[২৩] কম্পিউটর কম্পোজিশন লিখন পদ্ধতিকেও সহজতর করে দিয়েছে।

কুরআনের ব্যাখ্যা বা তফসিরের প্রয়োজনীতা

কুরআন একটি ব্যবহারিক পুস্তক। মূলত 'কারাআ' ক্রিয়াপদ থেকে ব্যুৎপন্ন কুরআন শব্দের অর্থ : 'পঠন'। আর কুরআন পড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো একে বোঝা[২৪] এবং এর নির্দেশাবলী কাজে পরিণত করা।

কুরআন একটি অনুপম পুস্তক[২৫] অন্য যে কোনো পুস্তক থেকে এটি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। সাধারণ কোনো পুস্তকে যেমন কোনো বিশেষ বিষয়ের যুক্তিতর্ক, তত্ত্ব-তথ্য ও ধ্যান-ধারণা যুক্তিতর্কসহ সাহিত্যিক নিরিখে উপস্থাপিত হয়, কুরআন সেরূপ কোনো গ্রন্থ নয়। ফলে, কোনো নতুন পাঠক যখন দেখতে পায় যে, এ পুস্তকটিতে জীবনের কোনো দিক বা আমাদের কোনো সমস্যা, সমকালীন কোনো চিন্তা যথাযথ উপস্থাপনা সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদ বা ভাগে বিভক্ত হয় নি, তখন সে সহজেই বিমূঢ় হয়। কারণ এ ধরনের অনন্য রীতিতে একটি পুস্তকের উপস্থাপনার সঙ্গে সে পরিচিত নয়। তথাপি, সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় ধর্মীয় বিশ্বাসের উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণে, নীতি নির্ধারণী অনুশাসনে, আইন প্রণয়ন ও ব্যাখ্যায়, অবিশ্বাসীদের প্রতি ভর্ৎসনায়, বা তাদের যুক্তি খণ্ডনে বা সন্দেহ অপনোদনে, ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে শিক্ষোপকরণ সরবরাহে, মন্দ কাজ ও মন্দ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণে, সুন্দর ও সংযত জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধির আশ্বাস প্রদানে কুরআন এক অনন্য সাহিত্য।

একই বিষয়ের বিভিন্নভাবে পুনরাবৃত্তি, সদৃশ যোগাযোগ ছাড়াই এক বিষয়ে অন্য বিষয়ের অনুসরণ, সহজে বোধগম্য কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে মাঝখানে অন্য কোনো বিষয়ের অবতারণা, কোনো ঘোষণা বা নির্দেশ ছাড়াই বক্তা ও বক্তব্যের উপস্থিতি এ পুস্তকের বৈশিষ্ট্য। এ পুস্তকে ঐতিহাসিক ঘটনা আছে, কিন্তু এটি ইতিহাস নয়। দার্শনিক তত্ত্ব, মত ও পথের সন্ধান এতে পাওয়া যাবে, কিন্তু এটি দর্শনেরও কোনো পাঠ্য পুস্তক নয়। মানব ও বিশ্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে সত্য, কিন্তু মানব দেহতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান বা প্রকৃতি বিজ্ঞানের ভাষা এতে নেই। অনুরূপ ভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান এ গ্রন্থের সর্বত্র, কিন্তু এর ভাষা ঐসব বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের ভাষারীতি সম্মত নয়।

ন্যায়-নীতি শিক্ষার অমন একটি গ্রন্থ আজও বিশ্বসাহিত্যে রচিত হয় নি। ভবিষ্যতেও হবে না। আল্লাহ নিজেই "ফাত্ বি-সূরাতিম মিন মিসলিহী ইন্ কুন্তুম্ সাদিকীন[২৬] অর্থাৎ "তোমরা যদি সত্যবাদী হও তা হলে এর অনুরূপ একটি মাত্র সূরা রচনা করে নিয়ে এস দেখি" — বলে মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। অমন একটি গ্রন্থকে বুঝতে হলে এবং ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় এর আদেশ-নির্দেশ কার্যকর করতে হলে এটির নিত্য-পাঠ অপরিহার্য। বর্ণিত হয়, "ইমাম মালিক কোনো সমস্যার সমাধান করতে চাইলে অনবরত কুরআন পড়তেন যতক্ষণ না তিনি সমস্যাটির সমাধান করতে পারতেন।[২৭] কিন্তু এভাবে তো প্রতিটি সাধারণ মানুষের পক্ষে কুরআনকে বোঝা এবং বুঝে কাজ করা সম্ভব নয়। সেজন্য নাজিল হওয়ার সময় থেকেই কুরআন ব্যাখ্যার রীতি চলে এসেছে।

কুরআন প্রচারে মৌখিক ব্যাখ্যা

পবিত্র কুরআনের দু'টি উপাদান আছে। একটি হলো মূল পাঠ (নজম), আর অন্যটি এর অর্থ (মা'না)।[২৮] মূল পাঠে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা-দান কার্য রসুলুল্লাহর জীবৎকাল থেকেই চলে এসেছে। জীবদ্দশায় রসুলুল্লাহ (সা:) নিজেই ছিলেন এর ভাষ্যকার। তখনোও কুরআন নাজিল সমাপ্ত হয় নি।

তদুপরি, নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তার জবাবে সহজ বিধানটি কঠিন হয়ে যেতে পারে, এ আশঙ্কায় সাহাবিগণ অধিকতর ব্যাখার প্রয়োজন অনুভব করলেও অনেক সময়ে তা চেপে যেতেন, ধৈর্য ধরতেন আর আল্লাহর সাহায্য কামনা করতেন। তাঁরা আল্লাহর এই নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন : "সব বিষয়ে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো না, যদি জবাব প্রকাশ করে দেয়া হয়, তবে তোমাদের ক্ষতি হবে"।[২৯] প্রয়োজনে আল্লাহ্ নিজেই রসুলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দিতেন। আবার কখনোও বা ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য প্রশ্নকারী বেশে জিবরিল (আঃ)-কে পাঠাতেন।[৩০]

সাধারণত রসুলুল্লাহ্র কথা, কর্ম এবং অনুমোদন তথা হাদিসকে বলা হয় কুরআনের ব্যাখ্যা। কিন্তু হযরতের জীবনে হাদিস লিখে রাখা নিষিদ্ধ ছিল, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর অনুমতিতে বা আদেশে তাঁর কিছু বাণী বা অনুশাসন লিখে রাখা অথবা লিখিয়ে দেয়া হয়েছিল। নিষেধের কারণ, পাছে হাদিস কুরআনের মূল পাঠের সাথে মিশে গিয়ে তাকে বিকৃত করে ফেলে। রসুলুল্লাহর জীবনকালে এবং পরবর্তীতে কুরআনের মূল পাঠ যাতে বিকৃত না হয় সেদিকে সাহাবিগণ অতন্দ্র প্রহরীর মতো সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন; ফলে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরআনের রসুল প্রদত্ত ব্যাখ্যাও লেখা হতো না। কুরআনের পঠন-পাঠন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সবই চলত মুখে মুখে। সেজন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে অর্থাৎ হিজরির প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত কুরআনের কোনো তফসির নেই বললেই চলে। পরে, ধীরে ধীরে হাদিস সংগ্রহ এবং গ্রন্থনার সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের ভাষ্য রচনাও জ্ঞানের আলাদা একটি শাখায় রূপ পরিগ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, হাদিস সংকলন এবং তফসির রচনা সবই হতো আরবি ভাষায়।

হযরতের তিরোধানের পর তাঁর নিত্য ও নিকটতম সাহাবিগণ হলেন কুরআনের ভাষ্যকার। এঁদের মধ্যে রসুলুল্লাহর চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস ছিলেন শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা যে কত অনুসন্ধানসাপেক্ষ তা বলতে গিয়ে একবার ইব্‌নে আব্বাস বলেছিলেন : "আমি 'ফাতির' শব্দের অর্থ জানতাম না। একবার দু'জন বেদুইন একটি কুয়োর মালিকানা নিয়ে ঝগড়া করতে করতে আমার কাছে এসে যখন বলল 'আনা ফাতারতুহা' অর্থাৎ আমিই এ কুয়োটির সূচনা করেছি, তখনই 'ফাতির' শব্দটির অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল"।[৩১] কুরআন বোঝার ব্যাপারে একজন আরবি ভাষাবিদ ও কুরআন-বিশেষজ্ঞ সাহাবির অবস্থা যদি এমন হয়, তবে অনারবদের অবস্থা কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. **Encyclopaedia Britannica : Macropaedia : Knowledge in depth.** (Chicago : 1974), I, pp. 621-622.

২. M. Abdul Hai, "Bengali" **Encyclopaedia of Islam,** New ed. (Leiden : 1960), I, p. 1167, cols. 1-2.

৩. কুরআন : ২ : ১৪৪.
কুরআনের আয়াতের সংখ্যা লেখার ক্ষেত্রে আল্লামা ইউসুফ আলী প্রদত্ত সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. M. H. Khan, **History of Printing of the Holy Qur'an** (Qur'an Printing) (Dhaka : Islamic Foundation, 1988).

৫. শেখ ওয়ালী উদ্দীন মুহম্মদ ইবন আবদুল্লাহ, **আল মিসকাত আল-মাসাবিহ,** ১ : ১ (আরবি সংস্করণ)

৬. সহিহ আল-বুখারী ৩ : ২৫।

৭. সাহিহ আল-বুখারী ৩ : ৩৭।

৮. আফ্রিকায় কুরআন প্রচার ও কুরআন অনুবাদ সম্বন্ধে
M. H. Khan, "Translations of the Qur'an in the African languages", **Muslim World** (U. S. A) Oct. 1987, দেখুন।

৯. A. Q. Amadi, "The oral tradition and librarianship" **In African Libraries : Western tradition** ... (Metuchen, N. J. : 1981), p. 134.

১০. ইসলামি পদ্ধতিতে শিক্ষা বিষয়ক একটি অতীব মূল্যবান পুস্তক হলো : Ahmad Shalaby, **History of Muslim Education**, (Beirut : 1954), p. 266.

১১. M. Habib, "Islam's writing on the wall ... "**The Unesco Courier** 10 (December 1977), p. 43.

১২. Ibn al-Nadim. **Kitab al Fihrist** ... (Leipzig : 1871-72), Vol. I, p. 119 ; Clarence K. Streit, "Calligraphy of the Moslems", *Int. studio*, 81 (1925), p. 81 ; B. Mortiz, **Arabic Paleography** (leipzig : 1905), p. 381.

১৩. Y. H. Safadi, **Islamic calligraphy** (London : 1978) pp. 40-92 Martin Lings, **The Quranic Art of Calligraphy and Illumination** (London : 1976), p. 242.

১৪. Muhammad Sani Zahradeen, "Islamic Calligraphy in West Africa : the Quran of Northern. Nigeria" **The Journal of General Studies**, 2 : 1 (1981), pp. 7–15.

১৫. এ বিষয়ে যাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেন তাঁরা ইসলামের একজন বিখ্যাত সমালোচক Sir William Muir-এর **The Life of Mahomet** (London : 1878), PP. 551-562 পাঠ করতে পারেন।

১৬. কুরআন : ১৫ : ৯।

১৭. M. H. Khan, **Qur'an Printing** পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৮. M. H. Khan, "History of Printing in Bengali Characters upto 1866" (Bengali printing) (London : Ph. D. Thesis 1976), p. 191 : Douglas C. McMurtric, **The Book** (New York : 1967) pp. 550-552.

১৯. Khan, **Qur'an Printing**

২০. Khan, **Bengali Printing**. p. 120.

২১. Ibid, P. 191.

২২. এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : Labib al-Said, The recited Koran : a history of the first recorded version ; translated and adapted by Bernard Weiss, M. A. Rauf and Moral Berger, (Princeton, N. J. : 1975) ; Zahir M. Ahmed, Our'an and the recording system, Lomita, ca : 1989.

২৩. Khan, **Qur'an printing**

২৪. কুরআন, ৪৩ : ৩।

২৫. S. A. Maududi, "Introduction to the study of the Holy Qur'an in A. Y. Ali. **The Holy Qur'an** (London. c 1975) pp.xxi-xLiii.এরই একটি আরবি অনুবাদও গ্রন্থের শেষে সংযোজিত হয়েছে। মাওলানা মওদুদীর এ রচনাটি তাঁর তাফহিম-আল-কুরআনের উর্দু মুকাদ্দিমার অনুবাদ। দেখুন : আবুল আলা মওদুদী, তাফহিম আল-কুরআন, (লাহোর : ১৯৭৭), পৃ. ৩১-৩৫।

২৬. কুরআন : ২ : ২৩।

২৭. Shykh Mustafa Sabri, **Mas'alat Tarjamah al-Qur'an al-Karim** (Cairo : 1351 AH) pp. 16-17, 75-76 (Arabic text)

২৮. কুরআন ৫ : ১০১।

২৯. সহিহ বুখারি, ২ : ২৭।

৩০. Muhammad Ali, **The Religion of Islam** (Lahore : 1950), p 61. Quotes narration of a Hadith by Abu Hurairah in support of this statement.

৩১. Jalal al-Din al-Suyuti, **al-Itqan fiulum al-Qur'an** (Calcutta : 1856) p. 267.

কুরআন অনুবাদের ইতিহাস

কুরআন অনুবাদের উৎস ও সূচনা

পবিত্র কুরআন, স্বীয় সাক্ষ্য অনুযায়ী আরবিতে নাজিল হওয়ার কারণই হলো যাতে আরববাসিগণ তা বুঝতে পারে।[১] এখানে "বুঝতে পারা" (তা'কেলুন) শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। তা হলে আরবি ভাষাজ্ঞানহীন মানব সমাজ কুরআন বুঝবে কি করে? বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য কি সঙ্গে সঙ্গেই কুরআন অনুবাদের প্রয়োজন ছিল না?

এ বিষয়েও ঐশী ব্যবস্থা ছিল বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। মক্কায় ইসলাম প্রচারে যখন কুরাইশগণ বাধা দিচ্ছিল আর অপপ্রচার করছিল ইসলামের বিরুদ্ধে, ঠিক এ সময়েই সেখানে একজন আজামি (অর্থাৎ ইরানি) বাস করতেন।[২] নিশ্চয়ই ঐ আজামি দ্বিভাষী ছিলেন। ফলে স্বভাবতই তিনি কুরআন শোনা মাত্রই অবচেতন মনে তাঁর নিজের বোঝার জন্যই ফারসিতে অনুবাদ করে নিতেন।

এছাড়াও, রসুলুল্লাহর (সা:) বেশ কিছু অনারব সাহাবি ছিলেন। এঁদের মধ্যে ইরানের সালমান ফারসি[৩] ও আফ্রিকার বিলালের[৪] নাম করা যেতে পারে। এঁরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে দ্বিভাষী। ফলে, এঁরা যখন তাঁদের স্বদেশী লোকদের কাছে ইসলাম প্রচার করতেন তখন নিশ্চয়ই মুখে মুখে কুরআনের বাণী স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ করে নিতেন। এঁদের মধ্যে, আল-সারাখ্সির মতে[৫] (৪৮৩ হি:), সালমান ফারসি কুরআনের সুরা ফাতিহার একটি তরজমা করেছিলেন।

কুরআন আরবি ভাষায় হলেও, এটি বিশ্বের সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে নাজিল হয়। ফলে, জীবনের শেষ পর্যায়ে রসুলুল্লাহ (সা:) আরব আজম নির্বিশেষে সকলের কাছে এর বাণী পৌঁছে দিতে শুরু করলেন। তিনি প্রতিবেশী দেশসমূহের প্রশাসকদের কাছে দূত প্রেরণ করে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাতে লাগলেন। ইব্নে সা'দের মতে, যে দেশে যে দূত প্রেরণ করা হত, সে দূত সে দেশের ভাষায় পারদর্শী হতেন।[৬] বর্ণিত আছে, আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান গভর্নর নেগুস বা নাজ্জাশি-র কাছে লেখা রসুলুল্লাহর (সা:) পত্র আমর বিন উমাইয়া আমহারিক ভাষায় অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন।[৭] দিহয়া আলকাল্বী বায়যান্টাইন সম্রাটের কাছে রসুলুল্লাহ্র (সা:) পত্র হাজির করলে সম্রাট তাঁর ভাষ্যকারকে পত্রটি অনুবাদ করার নির্দেশ দেন।[৮] বলা প্রয়োজন, এসব পত্রে সব সময় পবিত্র কুরআন থেকে কোনো না কোনো উদ্ধৃতি দেয়া থাকত।

বেশ কিছু সংখ্যক হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, মহানবী তাঁর সাহাবিদের বিদেশী ভাষা শিক্ষা করতে উৎসাহিত করতেন। রসুলুল্লাহ্র (সা:) কাতিব বা সেক্রেটারি জায়েদ

বিন সাবিতকে তিনি সিরিয়ান ও হিব্রু ভাষা শিখতে আদেশ দিয়েছিলেন।[৯] অল্প সময়েই জায়েদ এই উভয় ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। কুরআন নাজিলের পঞ্চম বর্ষ অর্থাৎ ৬১৫ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। উৎপীড়িত মুসলিমগণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। কুরাইশ দূতগণ আবিসিনিয়ার গভর্নর Negus এর দরবারে গিয়ে এঁদের বহিষ্কার দাবি করলেন। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী Negus ছিলেন ন্যায় পরায়ণ শাসক। তিনি অপর পক্ষের বক্তব্য শুনতে চাইলেন। মোহাজির মুসলিমদের নেতা জাফর বিন আবু তালিব কুরআন যে আল্লাহ্‌র বাণী তার প্রমাণ স্বরূপ সুরা মরিয়মের প্রথম থেকে ৪০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করলেন।[১০] Negus-এর ভাষা ছিল আমহারিক। তাঁর কাছে উক্ত আয়াতগুলো নিশ্চয়ই আমহারিক ভাষায় অনুবাদ করে বোঝানো হয়েছিল বলে ধরে নেয়া যায়।[১১]

মৌখিক অনুবাদ

উপর্যুক্ত তথ্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, নাজিলের প্রাথমিক সময় থেকেই কুরআনের অনুবাদ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে এসব অনুবাদ ছিল সবই মৌখিক। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কুরআনের তফসির তথা হাদিস যেমন ইসলামের প্রাথমিক যুগে লিখে রাখার অনুমতি ছিল না, তেমনি হুবহু অনুবাদ করা আর তা লিখে নেওয়ারও কোনো নির্দেশ রসুলুল্লাহ্ বা তাঁর সাহাবিগণ দেন নি। ফলে কুরআনের আহকামগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শুধু মুখে মুখেই প্রচলিত হতে থাকে।

ভাষানুবাদের অন্তরায়

এ প্রসঙ্গে বাইবেলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[১২] নাজিল হওয়ার অব্যবহিত পরেই বাইবেল হিব্রু ভাষা থেকে গ্রীক, ল্যাটিন, সিরিয়া, কপটিক প্রভৃতি ভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে গেল এবং নাজিলকৃত মূল বাইবেলটি প্রকৃতপক্ষে হারিয়ে গেল। বর্তমান বাইবেল যে মূল বাইবেল নয় এটা সর্বজনস্বীকৃত। বহু ভাষায় অনুবাদের অনুবাদ করার ফলে বাইবেল আজ মূল থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। New Testament-এর Gospel চতুষ্টয় স্পষ্টত যিশুর প্রচার কাহিনীর বর্ণনা তাঁর অন্তর্ধানের অনেক পরে তাঁর অনুসারীরা করেছেন, এতে God-এর কথার উদ্ধৃতিই কেবল আছে। Old testament-এ-ও God-এর কথা উদ্ধৃতি নির্ভর। মূল লুপ্ত, সুতরাং অনুবাদ আসলকে খাস্তা করে ছেড়েছে। আর এ জন্যই হয়তো ইটালিতে "traduttore, traditore"[১৩] অর্থাৎ "অনুবাদক হলো প্রতারক" — এই প্রবাদ প্রচলিত হয়েছে। মূলত এ জন্যই ইসলামি বিশ্বে কুরআনের অনুবাদ নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত। কুরআন আবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। তথাপি আরবি মূল থেকে অন্য ভাষায় ভাষান্তরিত করে, ল্যাটিন বাইবেল, সিরিয়ান বাইবেল ইত্যাদির মতো 'ফারসি কুরআন' বা 'বাংলা কুরআন' তৈরি করার অনুমতি ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অন্যপক্ষে কুরআনের প্রকাশ ভঙ্গি অভিনব এবং অতি উচ্চাঙ্গের, অনেক ক্ষেত্রে শব্দ অত্যন্ত কম, অর্থ ব্যাপক, অবতরণের প্রেক্ষাপট ব্যতীত অনুবাদ হয় অবোধগম্য, নিরর্থক। সুতরাং উলামাগণ বহুকাল যাবৎ মত প্রকাশ করে আসছেন যে, কুরআনের অনুবাদ অসম্ভব, কেবল তফসিরই সম্ভব।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুবাদের বিরোধিতা

উপর্যুক্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আলেমগণ কুরআন অনুবাদের বিরোধিতা করে আসছিলেন। মধ্য এশিয়ার আলেমগণ এ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যন্ত তাতার ভাষায় কুরআন অনুবাদকে ধর্ম বিরোধী কর্ম বলে ফতোয়া দেন।[১৪] আফ্রিকার হাউসা আলেমগণ মনে করেন যে, অনূদিত হলে কুরআনের বরকত (বারাক) লোপ পাবে।[১৫] ১৯৪৭ সালে ক্যামেরুনের বামুম রাজ্যের সুলতান সাইদ হজ্জ সমাপন করে ফিরে এসে বামুম ভাষায় কুরআন তর্জমায় হাত দেন, কিন্তু আলেমদের বিরোধিতায় এ-কাজ স্থগিত হয়ে যায়।[১৬]

তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের সংস্কার তৎপরতা সুবিদিত। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল তুর্কি ভাষায় কুরআনের তরজমা প্রকাশ। আজ তুর্কের ভাষায় "তুরস্কবাসী কুরআনে বিশ্বাসী কিন্তু এর ভাষা বোঝে না। সর্বাগ্রে তাকে প্রত্যক্ষভাবে এ গ্রন্থকে বুঝতে হবে"। কামাল পাশা ইসলামি কবি মুহম্মদ আকিফকে এ-কাজের যোগ্য মনে করে অনুবাদের দায়িত্ব দেন। প্রথমে আকিফ এ-দায়িত্ব হাতে নেন। কিন্তু এ অনুবাদকর্ম আলেম সমাজের, সংবাদপত্রের ও মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। মিসরের আধুনিকতাবাদীদের ডীন বলে কথিত, শেখ রশিদ রেজা কুরআন থেকে উদ্ধৃতির মাধ্যমে কুরআনের অনুবাদ-কার্যকে ধর্মদ্রোহিতা বলে ঘোষণা করেন। ফলে, মুহম্মদ আকিফ কুরআন অনুবাদ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং তুরস্ক ত্যাগ করে কায়রোতে চলে যান।[১৭]

ইংরেজিতে কুরআন অনুবাদক Marmaduke Pickthal এর নাম অনেকেরই জানা। হায়দরাবাদের নিজামের পৃষ্ঠপোষকতায় পিকথল পবিত্র কুরআনের একটি ইংরেজি অনুবাদ করেন।[১৮] অনুবাদ যখন শেষ পর্যায়ে তখন নিজাম পিকথলকে দু'বছরের ছুটি মঞ্জুর করেন। এই ছুটিকালে পিকথল অনুবাদের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য কায়রো যান। সেখানে তিনি শেখদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। মিশরের তৎকালীন সংবাদপত্রগুলো কুরআন অনুবাদে তাঁর ধৃষ্টতার প্রবল প্রতিবাদ করে। দীর্ঘ বিতর্কের পর ইংরেজিতে অনূদিত কুরআনের অংশবিশেষ পুনরায় আরবিতে অনুবাদ করা হয়। ইংরেজি থেকে পুনরানূদিত আরবি পাঠের সাথে মূল কুরআনের পাঠ মিলানো হলে দেখা যায় যে, পিকথলের অনুবাদ মূলের প্রায় কাছাকাছি। তবু শেখগণ এ অনুবাদ অনুমোদনে অস্বীকৃতি জানান। পরে বিখ্যাত পণ্ডিত ড. মুহম্মদ আহমদ আল গামরাঈ ও শেখুল-আজহার মুস্তাফা আল-মারাগির হস্তক্ষেপের ফলে আল-আজহারের শেখগণ এই শর্তে এ অনুবাদ অনুমোদন করতে স্বীকৃত হন যে, একে বলা হবে "মা' আনি আল-কুরআন"।[১৯] এ জন্যই পিকথল তার অনুবাদকে "Meaning of the Glorious koran" আখ্যা দেন।

কুরআনের অর্থানুবাদের অনুমোদন

কুরআন অনুবাদ করা যাবে কি যাবে না এ-বিষয়ে বিতর্কের অবসান আজও হয় নি। অথচ গবেষণায়[২০] দেখা গেছে যে, অনুবাদের সাহায্যে অমুসলিমদের মধ্যে কুরআনের বাণী প্রচার করে তাদের মন জয় করে ইসলামে দীক্ষিত করা সহজ। অতএব ১৪০১

হিজরি (১৯৮১) সালে হজ্জের সময় 'রাবিতা-আল-আলাম আল-ইসলামির উদ্যোগে মক্কা শরিফে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আলেমদের সম্মেলনে কুরআন তরজমা বিষয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনান্তে আলেমগণ এ-বিষয়ে একমত হন যে, পবিত্র কুরআনের 'মানে'র বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার সহজসাধ্য করে তুলবে এবং সে উদ্দেশ্যে এযাবৎ কুরআনের যত ভাষ্য ও ব্যাখ্যা অনূদিত হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জিত করতে হবে। প্রাচ্যবিদ বা পাদ্রিদের দ্বারা যেসব বিকৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোকে পরিশুদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[২১] কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ঐকমত্য কুরআনের অর্থের অনুবাদ সম্পর্কিত, কুরআন অনুবাদ সম্পর্কিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের যে যে অনুবাদ আমরা দেখতে পাই তা' কুরআনের মা'নি বা অর্থের অনুবাদ। 'ইংলিশ বাইবেল যেমন authorised হয়েছে তদ্রূপ 'ইংলিশ কুরআন' অদ্যাবধি অনুমোদিত হয় নি।

মুসলিমদের কৃত অনুবাদ

উপর্যুক্ত আলোচনার ধারা অনুসরণ করে আমরা সর্বপ্রথম ইসলামি দেশে মুসলিমগণ কর্তৃক যে যে ভাষায় কুরআন অনূদিত হয়েছে তার একটি সমীক্ষা তুলে ধরতে চেষ্টা করব। স্মরণ করা প্রয়োজন যে, আমরা বলেছি, প্রায় সব ভাষায়ই মুখে মুখে কুরআনের অনুবাদ প্রচলিত আছে। এখন আমরা গ্রন্থিত বা পুস্তকাকারে রচিত অনুবাদের বিষয়ে আলোচনা করব।

ইসলামি ভাষাগুলোর মধ্যে "ফারসি ভাষায়ই সর্বপ্রথম কুরআন অনূদিত হয় বলে জানা যায়। ইরানের সামানী বাদশাহ আবু সালিহ্ মনসুর বিন নূহ (৯৪৬—৯৭৬ খ্রি:) বাগদাদ থেকে চল্লিশ বালামে সমাপ্ত মুহম্মদ ইবনে জারির আল-তাবারি প্রণীত আরবিতে লেখা কুরআনের বিখ্যাত তফসির গ্রন্থ "জামিউল বায়ান ফি তাফসির আল-কুরআন" সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিনি আরবি ভাষা জানতেন না বলে তা পড়তে ও বুঝতে অক্ষম হন। তিনি কতিপয় আলেমকে ডেকে গ্রন্থটি অনুবাদ করা বৈধ কিনা জানতে চান। তাঁরা এটি ফারসিতে অনুবাদের পক্ষে ফতোয়া দেন। ফলে এটি অনূদিত হয়।[২২] অনুবাদের বেলায় ফারসি গদ্য সাহিত্যের নিয়ম-নীতি প্রত্যাখ্যান করে মূল কুরআনের আয়াতের প্রতিটি আরবি শব্দের নিচে ফারসি প্রতিশব্দ লেখা হয়। গ্রন্থপঞ্জিকার স্টোরি (storey) এ অনুবাদের চারটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সন্ধান দিয়েছেন। এসব পাণ্ডুলিপির মধ্যে রামপুরের পাণ্ডুলিপি ৬৫০ হিজরি সালের (১২০৩-৪ খ্রি.) বলে তা সর্ব প্রাচীন।[২৩] অন্যান্যগুলি কালানুক্রমিকভাবে আযারবাইজান (৬০৭-২২ হি:.), খোরাসান (৭ম অথবা ৮ম হি: শ:) এবং জৌনপুর (৮৮৩ হি:)

তাবারি-র ফারসি অনুবাদই ছিল তুর্কি অনুবাদের ভিত্তি। এ অনুবাদটি, তোগানের (Toghan) মতে,[২৪] ফারসি অনুবাদের সমকালীন আর ইনানের (Inan) মতে ও কুপরুলুর মতে,[২৫] এটি ৫ম হিজরিতে (১১শ শতাব্দী) অনূদিত হয়। ফারসিতে ও তুর্কিতে অনূদিত কুরআনের তফসিরের সংখ্যা স্টোরি ও পিয়ারসনের হিসাবানুযায়ী ৪৮ ও ৭০[২৬]

ভারত উপমহাদেশে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দেস দেহলবী (১৭০৩ — ১৭৬২) সর্বপ্রথম ফারসি ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন বলে সর্বজন স্বীকৃত। ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁর অনুবাদের সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয়। তাঁরই এক শিষ্য, খাজা মুহম্মদ আমিন, ১৭৪৩-৪৪ সালে অনুবাদটির কয়েকটি কপি তৈরি করে প্রচার করলে তাঁর সমকালীন লোকদের কাছে এটি সমাদৃত হয়।

অনুবাদক শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ তার ভূমিকায় জানান যে, তাঁর অনুবাদের পূর্বে বেশ কয়টি অনুবাদ প্রচলিত ছিল। এদের মধ্যে কয়েকটি ছিল অনভিপ্রেতভাবে বিস্তারিত ; আর সংক্ষিপ্তগুলি ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। তাই তিনি নতুন একটি অনুবাদের উদ্যোগ নেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, এ অনুবাদগুলি যে কোন্ ভাষায় ছিল তা তিনি ব্যক্ত করে যান নি।[২৭] শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র পরে তাঁরই সুযোগ্য তনয় শাহ্ রফিউদ্দীন (১৭৪৯—১৮১৭) ১৭৭৬ সালে এবং শাহ্ আবদুল কাদির (১৭৫৩—১৮২৭) ১৭৮০ সালে হিন্দুস্তানী ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন।

অমুসলিমদের প্রচেষ্টা : পাশ্চাত্য ভাষা

কুরআন অনুবাদ নিয়ে যখন ইসলামি জগতে বিতর্ক চলছিল, তখন ইসলামের প্রচার ও প্রসার ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হয়। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে ধর্মান্তরিত করার পর ইসলাম তখন স্পেনে। ইসলামের রাজনৈতিক ক্ষমতা তখন প্রবল। প্রচলিত রীতিতে ইসলামের বিজয়কে ঠেকাতে না পেরে খ্রিস্টানগণ তাঁদের পবিত্র ভূমি প্যালেস্টাইন উদ্ধারের অজুহাতে খ্রিস্টান চার্চের প্ররোচণায় একাদশ, দ্বাদশ ও এয়োদশ শতাব্দীতে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের অগ্রগতিকে প্রতিহত করতে চান। কিন্তু যুদ্ধে ইসলামকে প্রতিহত করতে সম্ভব হলো না বলে, ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণ করে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করাই একমাত্র উপায় বলে বিবেচিত হয়। আরবি ভাষাজ্ঞানহীন খ্রিস্টান পাদ্রিদের ইসলাম অধ্যয়ন সহজ সাধ্য ছিল না। ফলে, এরা অনুবাদের মাধ্যমে ইসলামকে জানার প্রয়াস পায়।[২৮]

খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে ক্লানি-র (Cluny) মঠাধ্যক্ষ পিটার দি ভেনারেবল (Peter the Venerable) ছিলেন এ উদ্যোগের পুরোধা।[২৯] তিনি নিজে আরবি জানতেন না বলে কেটনের রবার্ট (Robert of Ketton) নামে একজন ইংরেজ, ডালমাটিয়ার হারমান (Herman of Dalmatia) এবং মুহম্মদ নামে একজন আরবকে কুরআন এবং বিভিন্ন ইসলামি পুস্তক অনুবাদে নিযুক্ত করেন। ১১৪৩ খ্রিস্টাব্দে কেটনের রবার্ট ল্যাটিন ভাষায় কুরআনের একটি অনুবাদ গ্রন্থ তৈরি করেন। দীর্ঘ চারশ' বছর পর থিওডোর বিবলিয়ান্ডার (Theodor Bibliander) ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে এটি বোসলে (Basel) মুদ্রিত করেন।[৩০]

পিটারের উদ্যোগে তৈরি অনুবাদকে সন্তোষজনক মনে না করায় সেগোভিয়ার জন ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কুরআনের আর একটি ল্যাটিন অনুবাদ করেন।[৩১] ল্যাটিন ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ হলো ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অকটোরে মারাচ্ছির (Auctore Marracci) অনুবাদ।[৩২] মূল আরবিসহ প্রকাশিত এই অনুবাদে কুরআন আল্লাহর বাণী

নয় বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ল্যাটিন অনুবাদের অনুসরণে ইতালীয়[৩৩] (১৫৪৭), জার্মান[৩৪] (১৬১৬), ফরাসি[৩৫] (১৬৪৭) এবং ইংরেজি[৩৬] (১৬৪৯) ভাষায়ও কুরআন অনূদিত হয়। এ অনুবাদগুলো ইসলাম ও কুরআনের বিরোধিতা করার মালমসলা সংগ্রহের কাজে ব্যবহারের জন্য কিংবা জর্জ সেলের ভাষায় "কুরআনকে দুনিয়া থেকে উৎখাতের জন্য" ব্যবহৃত হত।[৩৭]

প্রাচ্য ভাষা

ক্রুসেডের পর পরই মধ্যযুগ থেকে শুরু করে এশিয়া ও আফ্রিকাকে ব্যাপকভাবে ইউরোপের খ্রিস্টান মণ্ডলীভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন মিশনারি সংস্থা তাদের পাদ্রিদের প্রেরণ করেন। ইসলাম বিরোধী প্রচারণা করতে হলে কুরআনের জ্ঞান থাকা আবশ্যক এ ধারণার বশবর্তী হয়ে এ সব মিশনারি এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন ভাষায় কুরআন অনুবাদে অগ্রসর হয়। এভাবে মাকাস্সার[৩৮] (১৮৫৬), ইউরোবা[৩৯] (১৯০৬), আরমেনিয়ান[৪০] (১৯০৪), জাপানি[৪১] (১৯২০) , সোয়াহেলি[৪২] (১৯২৩), আমহারিক[৪৩] (১৫২৬) প্রভৃতি ভাষায় অমুসলিমদের দ্বারা সর্বপ্রথম কুরআন অনূদিত হয়।

খ্রিস্টান পাদ্রিদের পরেই, রাবিতা কর্তৃক অমুসলিম নামে আখ্যায়িত কাদিয়ানি বা আহমদিয়া সম্প্রদায়ের রাব্ওয়া দল এবং লাহোর দল পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন অনুবাদে হাত দেয়। নবুয়তের দাবিদার গোলাম আহমদের অনুসারীরা কুরআন অনুবাদের মাধ্যমে তাদের মত ও পথকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সুতরাং তাঁদের অনুবাদও ক্রটিমুক্ত নয়।

খ্রিস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ইসলাম বিরোধী প্রচারের মোকাবিলার জন্য বর্তমানকালের প্রায় সব দেশেই কুরআন অনুবাদ শরিয়ত সম্মত না হলেও প্রচলিত হয়ে গেছে। এ অনুবাদ হয়তো অনেক সময় আরবি 'নজম' এরই অনুবাদ, আবার কখনোও হয়তো 'মানা'-র অনুবাদ। এ পর্যন্ত বিশ্বের ৬৫টি ভাষায় কুরআন অনূদিত হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি।[৪৪]

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. কুরআন, ৪৩ : ৩।

২. কুরআন, ১৬ : ১০৩।

৩. **Shorter Encyclopaedia of Islam** (Leiden: 1960). pp. 500-501

৪. Ibid. pp. 62-63.

৫. S. A. Al-Sarakhshi, **Kitabal-Massut** (Arabic text) (Beirut : 1979). I : p. 37 : Al-Zarqani. **Manahil al-'Irfan** (Arabic text). II. pp. 51-52.

৬. S. A. F. A. H. Al-Asqatani. **Al-Isaba Fi Tamyiz Al-Sahaba** (Cairo : 1910). p. 561 Muhammad Ahmed Al-Sonbati Tarjamah **Al-Ma'ani al Qur'aniya.** (Qatar : n. d). pp. 86-87.

৭. Al-Bukhari. Al-Sahih. (Bulag : 1296 : A. H). III : 215.

৮. Ibn Hajr, Fath Al-Bare, (Cairo : 1438 A. H.) VI, p. 81.

৯. Ibn Sa'ad, **Al-Tabaqat Al-Kubra** (Beirut : 1960), I, 258. (Arabic text).

১০. M. A. Al-Sunbati, **Tarjama Al-Ma' ani Al-Qur'aniya** (Qatar : n.d.), pp. 86-87 ; M. H. Haykal, **The life of Muhammad** (Lagos : 1982) pp. 97-100 পুস্তকে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দেখতে পারেন।

১১. এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ নেই। হাদিস এ-বিষয়ে নীরব। আবিসিনিয়ার সঙ্গে আরবদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল অনেক কাল আগে থেকেই। এতে হয়তো একথাও অনুমান করা যেতে পারে যে, নেগুস আরবি জানতেন।

১২. বাইবেল অনুবাদের ইতিহাসের জন্য **Encyclopaedia of Religion and Ethics**. (Edinburgh : 1964), Vol. 11, pp. 584-86

১৩. J. T. Shipley, **Dictionary of World, Literature** (New York : 1943), p. 591.

১৪. S.A.Z Zenkovsky, **Pan-Turkism and Islam in Russia** (Cambridge, Mass : 1960), p. 10.

১৫. J. S. Trimingham, **Islam in West Africa**, (Oxford : 1976), p. 82.

১৬. Ibid.

১৭. Niyazi, Berkes "**The development of secularism in Turkey**" (Montreal : 1964), p. 488-489.

১৮. M. M. Pickthall, **Meaning of the Glorious koran.** London : Knopf, 1930.

১৯. M. M. Pickthall, "Arabs and non-Arabs and the question of translating the Quran", **Islamic Culture**, 5(1931), PP. 422-433.

২০. A. R. Mohammed, "The spread of Islam in Ibaraland, 1900-1960." Unpublished Seminar paper, Bayero University Kano, 23 March 1982, P. 32. "International Islamic Seminar",

২১. **Muslim World League Journal,** 9:1 (November 1981), P. 8.

২২. Habib Yaghamai, Tarjuma-i-tafsir Tabari. (Tehran : 1961). Vol. 1, PP. 5-6. A. J. Arberry, **Classical Persian Literature** (London : 1958). P. 40-41 ; Gilbert Lazard, **La langue des plus anciens movements de la prose** Persian (Paris : 1983), PP. 4-45.

২৩. C. A. Storey, **Persian literature : a bio-bibliographic survery** (London : reprint 1970), Vol I, Part I : Quranic literature ; History.

২৪. Z. V Toghan, **Zentranslasiatische Turkische Literaturen**, (Leiden : 1963) Vol. I, P. 230 ; Londra Vب Tahran daki Islami yazmalardan Bazilarina dair, (Istanblul : 1959-60), I'' . P. 65.

২৫. A. Inan, Kur'an-i Kerim' in Jurkce tercumereleri ... (Ankara : 1961), P. 8 ; M. F. Kopruler, Turk. edebiyati tarehi, (Istanbul : 1926), P. 129

২৬. J. D. Pearson, "Translation of the kur'an", E I, Newed, V, P. 430.

২৭. Shah Waliullah Dehlavi, Dibache Fath al-Rahman fi tarjamat al-Quran" **in Quran Majed ma 'tarjamatain wa al-tafser li Abdullah bin Abbas** (Mirat : Hashemi Press, 1292 A. H.), P. I.

২৮. M. H. Khan, "English translations of the Holy Qur'an : a bio-bibliographic study", **Islamic Quarterly**, 30:2 (1986). P. 82.

২৯. James Kritzek, **Peter the Venerable and Islam**_(Princeton, N. J. : 1964) ;

৩০. Norman Daniel, **Islam and the west**, (Ediubergh : 1960), PP. 66-71. Kritzek(1964), PP. VII-IX, পৃষ্ঠায় বিবলিয়ান্ডার অনুবাদটির মুদ্রণের সময় যেসব অসুবিধায় পড়েন তা' বিবৃত হয়েছে। রবার্টের অনুবাদ সম্বন্ধে উপর্যুক্ত পুস্তকের ৯৭-১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অনুবাদটি সম্বন্ধে সমালোচনার জন্য Islamic Quarterly, II (1955), PP. 309-12 দেখুন।

৩১. R. W. Southern. **Western Views of Islam in the middle ages**, (Cambridge, Mass : 1967). P. 87.

৩২. অতীব দীর্ঘাকৃতির আখ্যায় এটি ২ বালামে ১৬৯৮ খ্রিঃ প্রকাশিত এবং ১৭২১ খ্রি. পুনর্মুদ্রিত হয়।

৩৩. Andrea Arrivabene, (Pseud) **L'Alcorano di Macometto** ... (Venegia : 1547).

৩৪. S. Schweigger, **Alcoranas Mahometicus** ... (Nurnberg : 1616).

৩৫. Andre Du Pyer,_**L'Alcoran de Mohomet** ... (Paris : 1647).

৩৬. Alexander Ross, **The Alcoran of Mahomet** (London : 164()

৩৭. George Sale, **The Koran, commonly called Alcoran of Mohammed** ... (London : 1734), P. IV.

৩৮. B. F. Matthes **Proeve eener Makassaarsche vertaling des korans.** (Amsterdam : 1856).

৩৯. M. S. Cole, **Al-Kurani. Tia Yipada siede Yoruba** (Lagos : 1906)

৪০. Abraham Amirchanjanz [Quran] (Varna : 1904)

৪১. Ken-ichi Sakamote. Quran n.p. 1920.

৪২. Godfrey Dale, **Tafsiri Ya kurani Ki Kiaras lugha Kwa Ya kiswahili**_(London ; 1923)

৪৩. Aleka Taje, Exzerpte aus dem koran ...(Berlin : 1906)

৪৪. এ অনুবাদগুলোর প্রতিটি সংস্করণ ও মুদ্রণের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এগুলো বর্তমান নিবন্ধকারের অপ্রকাশিত "Historical bibliography of the Holy Quran" নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় কুরআন প্রচার

বিশ্বব্যাপী কুরআন প্রচার ও অনুবাদের উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষায় কুরআন প্রচার[১] ও আনুবাদ[২] সম্বন্ধে আলোচনার একটি প্রয়াস এখন নেয়া যেতে পারে। যদিও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলাদেশ মুসলমানদের করতলগত হয়, বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব ঘটে আরো অনেক আগে। আধুনিক গবেষণার ফলে অনুমিত হয় যে খলিফা হারুনুর-রশীদ[৩] (৭৮৬-৮০৯)-এর সময়ে বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে ইসলাম প্রসার লাভ করে। ফলে মুসলমানদের রাজ্যাধিকারের সময়ে বাংলার মাটিতে ইসলাম ছিল মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত।

মৌখিক অনুবাদ

আমরা দেখেছি ইসলাম ও কুরআনের বাণী প্রথমত মৌখিকভাবে ও পরে লিখিত আকারে প্রচারিত হত। কাজেই এই বঙ্গভূমিতেও যে মৌখিকভাবে কুরআন অনূদিত এবং প্রচারিত হয়ে আসছিল, তা প্রমাণ করতে খুব বেশি গবেষণার প্রয়োজন নেই। পরিবারের কর্তার মৃত্যু হলে উত্তরাধিকার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কার কি প্রাপ্য, কোন কোন মহিলার সঙ্গে বিবাহ সিদ্ধ, তালাক ও পুনর্বিবাহের রীতি কি, জাকাত, হজ্জ, রোজা, নামাজ এসব কিছুর বিধান তো কুরআনেই আছে। তবে বঙ্গদেশে যদি আরবি কিংবা ফারসি ভাষাভিজ্ঞ আলেমগণ এদেশের ভাষায় এসব বিবৃত না করতেন তবে লোকজন তা' জানলো কি করে? আর এসব কিছু বাংলা ভাষায় জানানোই হলো কুরআনের অনুবাদ।

তাছাড়া মানব জন্মের কাহিনী, ঈসা, মুসা, ইউসুফ, আইয়ুব বা শো'আইব এবং আরো সব নবীব কুরআনি উপাখ্যান সমূহ এদেশের স্বভাব কবিগণ গানের মাধ্যমে যুগে যুগে প্রচার করে এসেছেন। এগুলোও পরোক্ষভাবে অনুবাদের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কুরআন অনুবাদে ইরান, কাজাকাস্তান, পূর্ব এবং পশ্চিম আফ্রিকা কিংবা তুরস্কে যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সেই একই পদ্ধতি বাংলার মাটিতেও প্রচলিত ছিল এ-কথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে।

বাংলায় ইসলাম প্রচার নবম শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে। একটি স্বাধীন ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার বয়স মাত্র অন্যূন এক হাজার বছর।[৪] এটা যদি সত্য হয়, তবে ইসলাম প্রচারের শুরুতে, আমরা বর্তমানে যে ভাষায় কথা বলি তা' সবে মাত্র গড়ে উঠতে শুরু করেছে। তাছাড়া অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলায় লিখিত গদ্যরীতির ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না। কাজেই, আমরা ফারসি বা তুর্কি ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও পবিত্র কুরআনের একটি লিখিত তফসির আশা করতে পারি না।

বাংলাকাব্যে কুরআনের বাণী

সৌভাগ্যের কথা, মুসলিমগণ অচিরেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতে মনোনিবেশ করলেন। আর আরবি ও ফারসি ভাষাভিজ্ঞ এই মুসলমানগণ বাংলা ভাষায় যে কুরআনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করেন তার প্রমাণ আমাদের হাতে আসতে শুরু করেছে। আমরা যদি শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯—১৪১০ খ্রি.) কাব্যকে কুরআনের পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তবে দেখতে পাব যে তাঁর 'ইছুফ জলিখা'-কাব্য সুরা ইউসুফের মা'নির অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তুলনা করার উদ্দেশ্যে আমরা সুরা ইউসুফের ৩১ আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদ এবং সগীরের সংশ্লিষ্ট কাব্যাংশ এখানে তুলে ধরছি। কুরআন বলে :

... তারপর যখন সেই স্ত্রীলোকেরা ইউসুফকে দেখল, তখন ইউসুফের রূপ যৌবনের প্রতি এরূপ আসক্তি জাগল যে তারা অন্যমনস্কতাবশত ফল কাটিতে গিয়ে নিজেদের হাত কেটে বসল এবং বলতে লাগল : আল্লাহ্‌র ফেরেশতা।

শাহ মুহম্মদ সগীরের অনুবাদ[৫] হলো :

"দেখিলেন্ত পরতেখ কিবা এ স্বপন
এক দৃষ্টে নেহালন্ত পাসরি আপন।।
হাতেত তুরঞ্জ ফল কাতি খরসান।
হস্ত সমে ফল কাটে মনে নাহি জ্ঞান।।
কেহো ফল কাটিতে অঙ্গুলি কাটি নিল।
কিবা কর কিবা ফল এক ন জানিল।।

স্তিরি সবে বোলে এহি মনুষ্য মূরতি।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালি জিনিয়া রূপ খ্যাতি।।

বাংলার মুসলমানগণ এসব খণ্ডিত অনুবাদে, কিংবা ভাবানুবাদের কিংবা মসজিদে বা ওয়াযের মাহফিলে আলেমদের মৌখিক তফসিরে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগলো, পৃথিবীর প্রতিটি দেশে মুসলমানেরা যদি নিজ ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ব্যাখ্যা পাঠ করতে পারেন তবে আমাদের দেশে এর ব্যতিক্রম কেন? এ আন্দোলনেরই মুখপাত্র কবি সৈয়দ সুলতান লেখেন[৬]

রূমি সবে রূম ভাসে কোরানের কতা।
লোক সবে লিখি লই করেন্ত বেবস্থা।।
তুরকি স্থানে তুরকি ভাসে য়াপোনার।
কোরানের কতা সব লিক্ষি লইয়া সার।।
সামি সবে সামি ভাসে কোরানের মর্ম্ম।
সুনিয়া করিতে য়াছে মোলছমানি কর্ম্ম।।
এম্রানি এম্রানি ভাসে কোরানের অর্থ।
সুনিয়া ইছলাম দিন হইল সামর্থ।।
এরাকি এরাক ভাসে ইমা ইছলাম।
মোছলমানি কর্ম্ম সবে করে য়নুপাম।।

পাঠান সকলে পোস্ত ভাসে য়াপোনার।
কোরানের কতা সুনি বুজিল য়াচার॥
কত দেসে কত ভাসে কোরানের কতা।
দিন মোহাম্মদি বুজি দেয়ন্ত বেবস্তা॥

বাংলায় লিখিত অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা

সৈয়দ সুলতানের এ রচনাটির মধ্যে মূল বাক্যটি হলো "কোরানের কতা সব লিক্ষি লইলা সার"। এতে বোঝা যায় যে, শুধু মুখে মুখে কুরআনের সার প্রচার কেন, একটি লিখিত ভাষ্যেরও আমাদের প্রয়োজন। এতে আরো বোঝা যায় যে, অন্যান্য দেশের মতো এ দেশেও কুরআনের মৌখিক অনুবাদ প্রচলিত ছিল।

পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদের আকাঙ্ক্ষা বাঙালি মানসে দিন দিন বাড়তেই থাকে। আমরা এ আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ দেখতে পাই সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিমের[৭] (১৬২০-১৬৯০) 'নূরনামা' কাব্যে। তৎকালে আরবির সঙ্গে সঙ্গে ফারসি তফসিরের প্রচলনও হয়েছে বাংলাদেশে। তাই কবির খেদ হলো বাঙালির কাছে এ দু'ভাষায় কোনো তফাৎ নেই। কবি বলেন :

আরবি ফারসী ভাষে নাহিক ফরাগ
দেশী ভাষা বুঝিতে ললাটে নাই ভাগ॥

একদিকে যেমন দেশী ভাষায় কুরআনুল-করিমের বাণী শোনার ভাগ্য আমাদের নেই, অন্যদিকে এ পবিত্র গ্রন্থ মূল আরবিতে পড়লেই বা কী লাভ আমাদের। কারণ, আমরা এর মর্ম বুঝতে পারিনা বলে এর আদেশ-নিষেধও পালন করতে অপারগ। কবির ভাষায় :

যদি বা শাস্ত্রের নীতি না করে পালন
কোরান পড়িলে তার কোন প্রয়োজন।

কুরআন অনুবাদে উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষার অবস্থা

উপমহাদেশে শুধু বাংলারই এ অবস্থা ছিল না, অন্যান্য ভাষারও একই অবস্থা ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। উপমহাদেশের আলেমগণ আরবি ও ফারসি উভয় ভাষাই জানতেন। তাছাড়া পাঠান ও মুঘল আমলে রাষ্ট্র পরিচালনা ও সংস্কৃতির ভাষাও ছিল ফারসি। কাজেই শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভীর মতো বিখ্যাত আলেমও ভারত উপমহাদেশের সাধারণ ভাষা, তথা তাঁর নিজের মাতৃভাষা উর্দুকে বাদ দিয়ে ফারসি ভাষায় তফসির রচনা করেন।

সৌভাগ্যবশত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহর সুযোগ্য পুত্র শাহ্ রফিউদ্দীন (১৭৭৬ খ্রি:) ও শাহ্ আবদুল কাদির (১৭৯০ খ্রি:) উর্দুতে কুরআন অনুবাদ করে এ অভাব পূরণ করেন। প্রথমোক্ত অনুবাদটি ১৮৪০ এবং দ্বিতীয় অনুবাদটি ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়[৮]। এর মধ্যে শাহ্ আবদুল কাদিরের তরজমা ও তফসিরখানি হুগলির মুনশী আবদুল্লাহর প্রেসে মুদ্রিত হওয়ায় বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বাংলায় লিখিত অনুবাদের পটভূমি

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় এবং বাংলা বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য মুসলমানদের জন্য শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশাই বয়ে আনে নি, ধর্মীয় বিপর্যয়ও ডেকে এনেছিল। মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মক্তব মাদ্রাসাগুলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিপর্যস্ত এবং প্রায় বিলুপ্ত হয়ে তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত হলো পাশ্চাত্য রীতির স্কুল-কলেজ। ইংরেজি শিক্ষা হারাম বলে আলেমগণের ফতোয়ার কারণেই হোক কিংবা ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের মধ্যে স্বধর্মের প্রতি অবজ্ঞা লক্ষ্য করেই হোক মুসলিম জনগণ স্কুল-কলেজের শিক্ষা পরিহার করেন। এদিকে অফিস-আদালতে ফারসির পরিবর্তে ইরেজি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে তারা সরকারি চাকরি থেকেও বঞ্চিত হলেন।

মুসলমানদের এহেন দুর্দিনে খ্রিস্টান মিশনারিদের তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। মিশনারিগণ ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে বেপরোয়া প্রচার শুরু করেন। এঁদের মধ্যে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের নেতা প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদ উইলিয়াম কেরী[৯]-ই ছিলেন বিখ্যাত। তাঁর রোজনামচায় দেখা যায়, ধর্ম প্রচারকালে কেরী যখন মুসলিমদের জিজ্ঞাসা করতেন "তোমরা কুরআনে কি লেখা আছে জান? মুসলিমগণ উত্তর দিত আমরা জানিনা, কারণ এটা আরবিতে লেখা, কাজেই কেউ এটা বোঝে না"। কেরী পুনরায় প্রশ্ন করতেন "তাহলে তোমরা এটাকে মান কি করে? তোমরা মুসলিমই বা হলে কি করে?"[১০]

মিশনারিদের এ অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ইসলামকে রক্ষা আর ইসলামি সমাজ থেকে শিরক্ ও বিদ্'আত দূর করার জন্য কতিপয় আলেম সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন।[১১] এঁরা হলেন, হাজী শরিয়তুল্লাহ (১৭৬৪-১৮৪০), মাওলানা ইমামুদ্দীন (১৭৮৮-১৮৫৯), মাওলানা সুফি নূর মুহম্মদ (আনু. ১৭৯০-১৮৬১) এবং মাওলানা কেরামত আলী (১৮০০-১৮৭৩)। ইসলামের আদি শিক্ষা, দৃঢ়তা এবং বৈশিষ্ট্যকে ফিরিয়ে আনাই ছিল এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

দুঃখের বিষয়, সংস্কার আন্দোলনের উদ্যোক্তা আরবি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এ সব আলেম, কুরআনের অনুবাদ তো দূরের কথা, বাংলা ভাষায় কোনো ইসলামি পুস্তক রচনা করেছেন বলেও আমাদের জানা নেই। ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মক্তব ও মাদ্রাসার বিপর্যয়ে এবং ইংরেজি স্কুল কলেজের শিক্ষায় অংশগ্রহণ না করায় তখনকার মুসলিম সমাজ আরবি-ফারসি কিংবা ইংরেজি বাংলা কোনো ভাষায়ই শিক্ষার সুযোগ পেল না। সেজন্য, এককালে এদেশের সবচেয়ে অধিক শিক্ষিত ও জ্ঞানীগুণী একটি জাতি ক্রমে শিক্ষার আলো থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। তাই, জনমত তৈরি থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের পক্ষে কুরআন অনুবাদের মতো একটি দুঃসাহসিক কাজে হাত দেয়া সম্ভবপর হলো না। অন্যদিকে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের সুযোগে ফারসি ও উর্দু ভাষায় কুরআনুল করিমের বিভিন্ন তফসির ও তরজমা প্রকাশিত হওয়া শুরু হলো। কিন্তু এগুলো

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এ উভয় ধরনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত সাধারণ মুসলমানদের নাগালের বাইরেই রয়ে গেল। সেজন্য এসব তফসির শুধু দিল্লি কিংবা লক্ষ্মৌতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মওলানা বা মৌলভীদের একচেটিয়া অধিকারে চলে গেল।

বাংলার এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি ভালো দিকও ছিল। কাজের সুবিধার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগে বাংলা মুদ্রণের প্রচলন হলো ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে। কোম্পানির লোকদেরই উদ্যোগে বাংলা ব্যাকরণ ও পরে বাংলা অভিধানের আবির্ভাব ঘটল। বাংলায় আইন-কানুনের তরজমার মাধ্যমে বাংলা গদ্যের প্রচলন শুরু হলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে বাংলা ভাষায় পুস্তাকাবলীও প্রকাশিত হতে লাগল[১২]।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত[১৩] হলো। কলেজের বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক পাদ্রি উইলিয়াম কেরী ছাত্রদের জন্য বাংলা পুস্তক রচনা করে, কিংবা করিয়ে, আর নিজে বাইবেল অনুবাদ করে বাংলা গদ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। অপরদিকে হিন্দুস্তানী ভাষার অধ্যাপক জন গিলক্রাইস্ট তাঁর হিন্দুস্তানি প্রেসের মাধ্যমে প্রচুর আরবি, উর্দু ও ফারসি পুস্তক ছাপতে লাগলেন[১৪]। এর মধ্যে ১৮০২ ও ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে মির্জা কাজিম আলী জওয়ান কর্তৃক উর্দু ভাষায় অনূদিত পবিত্র কুরআনের মুদ্রণ ও প্রকাশ ইতিহাসের এক নবদিগন্ত খুলে দিল। ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে এটিই হলো পবিত্র কুরআনের প্রথম মুদ্রণ[১৫]।

১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতার মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়ে থাকলেও ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কোনো বাঙালি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন নি। আর বাঙালি মুসলমাদের মধ্যে অগ্রণী মুনশী হেদায়েতুল্লাহ ও মুনশী সৈয়দ আবদুল্লাহ এ-কাজে এগিয়ে আসলেন ১৮২০ সালের দিকে। হুগলির অধিবাসী এই আবদুল্লাহ ছিলেন কুরআন মুদ্রণের জন্য বিখ্যাত। ১৮২৯ সালে ইনিই সর্বপ্রথম শাহ আবদুল কাদির প্রণীত উর্দু অনুবাদ ও তফসির মূদিহু'ল কুরআন কোলকাতা থেকে প্রকাশ করেন[১৬]।

আলোচ্য যুগটি ছিল বাংলা ভাষার জন্য একটি ক্রান্তিকাল। তখন সবেমাত্র বাংলা গদ্যরীতির সূচনা হয়েছে। অত্যধিক আরবি-ফারসি শব্দে বন্দী বাংলা ভাষাকে মুক্ত করে উইলিয়াম ফরস্টার ও উইলিয়াম কেরী পুনরায় একে সংস্কৃতের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছেন[১৭]। সে যুগে শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান বাংলা ও সংস্কৃতের চেয়ে ফারসিই বেশি জানতেন। ফলে, ফারসির পরিবর্তে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে যখন ইংরেজি প্রচলনের সূচনা হয়, তখন বিভিন্ন পত্রিকার হিন্দু সম্পাদকগণই এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে ফারসির ব্যবহারকেই অব্যাহত রাখার সুপারিশ করেন। মুসলমানগণ নব প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজগুলোতে অধ্যয়ন পরিহার করায় অতি সংস্কৃতায়িত বাংলা ভাষা শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত হন। ফলে তাঁরা তখনও পর্যন্ত তথাকথিত "দোভাষী মুসলমানী বাংলার" মধ্যেই আবদ্ধ।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. মুহম্মদ মুজীবর রহমান, বাংলা ভাষায় কুরআন-চর্চা (ঢাকা : ১৯৮৬) এ-বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক। প্রধানত পরোক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হওয়ায় পুস্তকটিতে অসংখ্য তথ্যগত ভুলভ্রান্তি রয়েছে। যাচাই না করে এ গ্রন্থটির কোনো তথ্য উদ্ধৃত করা খুবই ঝুকিপূর্ণ কাজ হবে।

২. M.H.Khan, "History of Bengali translations of the Holy Quran" **Muslim World** (U.S.A), 62:2 (1982), pp. 129-136. (এ আলোচনাটি দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত)। এতে একটি মুদ্রণ ভুলে Brahmer শব্দ স্থলে Brahmin হয়েছে। পৃ. ১৩২।

৩. মুহম্মদ এনামুল হক, **পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম** (ঢাকা : ১৯৪৮), পৃ. ৯-১২।

৪. S.K. Chatterjee, **Origin and Development of Bengali Language**, (London 1970), p. 1.

৫. উদ্ধৃতি : মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, **ইউসুফ জোলেখা** (ঢাকা, ১৯৮৪), পৃ. ১২৫।

৬. উদ্ধৃত পাঠটি আলী আহমদ সম্পাদিত **ওফাতে রসুল, মরহুম** সৈয়দ **সুলতান বিরচিত**, (রচয়িতা, নোয়াখালি : ১৩৫৬ বাং) পৃ. ৭ হইতে নেয়া হয়েছে।।

৭. কবি আবদুল হাকিমের উদ্ধৃতিগুলো আলী আহমদ সম্পাদিত, "নূরনামা" কাব্য থেকে উদ্ধৃত। **বাংলা উন্নয়ন-বোর্ড পত্রিকা**, ১ : ১ (১৩৭৬ বাং), পৃ. ১০৬।

৮. এর একটি কপি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

৯. বিস্তারিত অবগতির জন্য J.C. Marshman, **Life and time of Carey,** Marshman and Ward, (London : 1856) দ্রষ্টব্য।

১০. London Baptist Missionary Society, 'Carey's Manuscript Journal".

১১. হক (১৯৪৮), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৯।

১২. Khan (1976) **Bengali Printing. OP. Cit**, p. 191.

১৩. David Kopf, **British Orientalism and Bengal Renaissance** (Berkeley : 1969).

১৪. **Ibid**, For biographical information of Gilchrist see **The Dictionary of National Biography**, (Oxford : 1966), Vol 7, pp 121-123.

১৫. Khan, **Qur'an Printing. OP, Cit**, p. 11.

১৬. Ibid., p. 11.

১৭. M.A. Qayum, **A Critical study of the Early Bengali grammars : Halhed to Haughton**, (Dhaka : 1982), pp. 240-244.

কুরআন বঙ্গানুবাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা

সর্বপ্রথম লিখিত অনুবাদ

বঙ্গদেশ, বাংলা ভাষা এবং বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের যখন এহেন অবস্থা, তখন কলকাতার মুদ্রাকরগণও বাংলায় ইসলামি পুস্তক প্রকাশে সাহসী না হয়ে আরবি, ফারসি ও উর্দু মুদ্রণেই ব্যাপৃত থাকেন। তথাপি বাংলায় কুরআনের একটি বঙ্গানুবাদের আকাঙ্ক্ষা তখনও বাঙালি মুসলমানদের মনে প্রবল। অবশেষে এ আকাঙ্ক্ষা পূরণে এগিয়ে এলেন কলকাতার মির্জাপুরের পাটোয়ার বাগানের অধিবাসী আকবর আলি। তিনি প্রকাশ করলেন দোভাষী পুঁথির ভাষায় রচিত পবিত্র কুরআনের 'আম' নামক পারা ও সুরা ফাতিহার একটি অনুবাদ।

অনুবাদটি সম্বন্ধে আরাফাত সম্পাদক আবদুর রহমান[১] স্বনামধন্য অধ্যাপক আলী আহমদ[২] ও ড: মুজীবুর রহমান[৩] অনেক আলোচনা করেছেন। কিন্তু, এ পুস্তকটির মূল, অনুবাদক, মুদ্রাকর কিংবা প্রকাশক সম্বন্ধে কোনো সঠিক তথ্য উদঘাটিত হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং মারাত্মক ভুল তথ্য সরবরাহের ফলে বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। কাজেই এ বিষয়ে আমরা গোড়া থেকে শুরু করে স্বীয় গবেষণার ফলাফল ব্যক্ত করব।

আকবর আলি-র "তরজমা আমছেপারা" নামক পুস্তকটির একটি কপির সংগ্রাহক আবদুল্লাহ খাঁ খুলনা জেলার বহিরদিয়া গ্রামের অধিবাসী। তিনি অধ্যাপক আলী আহমদ এর তত্ত্বাবধানে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ড-এর দুষ্প্রাপ্য পুঁথি-পুস্তক সংগ্রাহকের কাজ করতেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এ পুস্তকটি আবিষ্কার করেন।

আরাফাত সম্পাদক আবদুর রহমান ছিলেন অধ্যাপক আলী আহমদ-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি এ পুস্তকটি আলী আহমদ-এর কাছে দেখতে পেয়ে একটি চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার হিসেবে তাঁরই পত্রিকায় পুস্তকটির একটি পরিচিতি লিখে দেন[৪]। পরে তিনি মুহম্মদ মুসুরউদ্দীন ও নিজস্ব ভূমিকা সহ ১৯৭১ সালে পুস্তকটির একটি পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করেন। অতীব দুষ্প্রাপ্য এ পুস্তকটির সংগ্রাহক আবদুল্লাহ বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ডকে দান করেন। গ্রন্থটি বর্তমানে বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত আছে। দুর্ভাগ্যবশত পুস্তকটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় নি। এতে রয়েছে আখ্যাপত্র ও প্রথম ৬৪ পৃষ্ঠা। খণ্ডিত এ পুস্তকটিতে সুরা ফাতিহা থেকে সুরা ফজর-এর ৯ আয়াত পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে। পুস্তকটির আখ্যা পৃষ্ঠা নিম্নরূপ :

॥ শ্রীশ্রী হাক নাম॥/॥ এই কেতাবের নাম ॥/॥ তরজমা আমছেপারা ॥/॥ আধিন শ্রী গোলাম আকবর আলি ॥/॥ সাকিন মেৰ্জাপুর পাটওা ॥/॥ রের বাগান লোকের খাহেস ॥/॥ দেখিয়া বহুত কোসেসে সহি ॥/॥ করিয়া হাজি ছৈএদ আবদুল্লা ॥/ মরহুম ছাহেবের আহাম্মদি ॥/॥ ছাপাখানায় শ্রীযুত মৌলবি॥/ আছগর হোছেন ছাহেরের ॥/ দ্বারায় ছাপাইলাম ॥/ [মোহর-এর ব্লক] আকবোর/আলি/ ॥ এই কেতাব কেহ আমার বিনে ॥/॥ হুকুমে ছাপিবে নাই ॥/॥ সন ১২৭৫ সাল॥।

অনুবাদক সম্বন্ধীয় তথ্য সম্পর্কে উক্ত আখ্যা পৃষ্ঠাই দলিল। এতে তাঁর নাম দু'ভাবে লেখা রয়েছে। পুস্তকের আখ্যার সঙ্গে তাঁর নাম লেখা হয়েছে "গোলাম আকবর আলি"। আখ্যা পৃষ্ঠার মাঝখানে অনুবাদকের যে মোহর আছে তাতে আছে "আকবোর আলী"। সেকালের মুসলিমগণ বিনয় প্রকাশের জন্য নামের পূর্বে "আল-আবদ", খাকছাড়, ফকির, গোলাম ইত্যাদি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করতেন। সম্ভবত আকবর আলি তাঁর নামের পূর্বে "গোলাম" কথাটি সে উদ্দেশেই ব্যবহার করেছেন। কাজেই আমরা পুস্তকে মুদ্রিত সীল মোহরে প্রদত্ত নাম আকবর আলিই অনুবাদকের প্রকৃত নাম মনে করি।

আকবর আলি ছিলেন কলকাতার মির্জাপুরের পাটোয়ার বাগান মহল্লার অধিবাসী। লোকের আগ্রহ দেখে তিনি বহু কষ্টে এ তরজমার কাজ শেষ করেন। তিনি নিজেই পুস্তকটি প্রকাশ করেন। পুস্তকটি মরহুম সৈয়দ আবদুল্লাহ-র আহমদী প্রেসে ছাপা হয়। অনুবাদক নিজেই ছিলেন গ্রন্থস্বত্বেরও অধিকারী। কাজেই তাঁর অনুমতি ছাড়া তিনি এটি কাউকে ছাপতে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞা কেউ অমান্য করেছেন বলে মনে হয় না ; তিনি নিজেও এটি দ্বিতীয়বার ছেপেছিলেন এরূপ কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

তরজমা আমছেপারা পুস্তকটি "হাজি ছৈএদ আবদুল্লা মরহুম ছাহেবের আহাম্মদী ছাপা খানায়" মুদ্রিত হয়, আখ্যা পৃষ্ঠার এ বক্তব্যটি দেখে ড: মুজীবুর রহমান বলেন : "এর প্রকাশক ছিলেন বিদ্যোৎসাহী সাহিত্য রসিক আলহাজ্ব সাইয়েদ আবদুল্লাহ (১৮৪০-১৯২০)"[৫]। একই পুস্তকে উক্ত "সাহিত্য রসিক" সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ড: মুজীবুর রহমান বলেন, "এই হাজী আবদুল্লাহ (১৮৪০-১৯২০) বিহার থেকে এসে তাঁতী বাগানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। ... ১৯২০ সালে তিনি স্বীয় ভাগ্নে হাজী আলতাফের নামে একটা প্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। 'মোহাম্মদী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তিনি প্রথমে বাংলায় কুরআন তরজমার জন্য মওলানা আকরম খাঁ ও আব্বাছ আলীকে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। ছাপানোর যাবতীয় ব্যয়ভার তিনিই বহন করেন"।[৬]

১৮৬৮ সালে আকবর আলি যখন আহমদী প্রেস থেকে তার পুস্তকটি মুদ্রিত করেন তখন উক্ত প্রেসের মালিক সৈয়দ আবদুল্লাহ তখন "মরহুম" অর্থাৎ মৃত। তাহলে এই মৃত ব্যক্তিটি কিভাবে পুস্তকটির "প্রকাশক" হতে পারেন তা' ড: মুজীবুর-ই জানেন। পুনরায়, ১৮৬৮ সালে যে ব্যক্তি মৃত তিনি আকরম খাঁ ও আব্বাছ আলীকে ১৯০৩ সালে 'মোহাম্মদী' এবং ১৯০৫ সালে কুরআন তরজমা প্রকাশে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন?

উক্ত বিষয়টিতে মুজীবুর রহমান মারাত্মক ভুল করেছেন। আকবর আলি-র "তরজমা আমছেপারা"-র মুদ্রাকর আহমদী প্রেসের মালিক ও ১৮৬৮ সালে মৃত সৈয়দ

আবদুল্লাহ আর আকরম খাঁ ও আব্বাছ আলি-র পৃষ্ঠপোষক "হাজি আবদুল্লাহ" এক ব্যক্তি নন।

আমরা আব্বাছ আলি ও আকরম খাঁ-র কুরআন তরজমা আলোচনা কালে তাঁদের পৃষ্ঠপোষক হাজি আবদুল্লাহ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছি। আব্বাছ আলি প্রণীত ও প্রকাশিত পুস্তকগুলি এবং Bengal Library Catalogue-এর সংলেখগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় হাজি আবদুল্লাহ-র প্রেসটি কলকাতার ১ সংখ্যক হুক লেন থেকে মুদ্রণের কাজ করছে। পরে এ প্রেসটির নাম হয় আলতাফী প্রেস এবং এটি হুক লেন থেকে ৩৩ বেনে পুকুর লেনে স্থানান্তরিত হয়। আলতাফী প্রেস ৩৩ বেনেপুকুর লেন থেকেই ১৯০৯ সালে আব্বাছ আলি-র অনূদিত কুরাআন শরীফ-এর সর্বশেষ খণ্ড মুদ্রিত হয়। কাজেই হাজি আবদুল্লাহ "১৯২০ সালে স্বীয় ভাগ্নে হাজী আলতাফ এর নামে একটি প্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন"—এ তথ্যও ভুল।

"তরজমা আমছেপারা"—র মুদ্রাকর আহমদী প্রেসের প্রতিষ্ঠা সৈয়দ আবদুল্লাহ[৭] ছিলেন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্সী সৈয়দ বাহাদুর আলীর পুত্র। সৈয়দ বাহাদুর আলী দিল্লির সন্নিকট তেহমনী নামক স্থান থেকে এসে কলকাতায় চাকুরি নিলে হুগলির শ্রীরামপুরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরই সুযোগ্য তনয় সৈয়দ আবদুল্লাহ প্রথমে হুগলিতে ও পরে কলকাতায় আহমদী প্রেস নামে একটি মুদ্রা যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২০ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত এই প্রেস অসংখ্য আরবি-ফারসি ও উর্দু পুস্তক মুদ্রিত করে।

সৈয়দ আবদুল্লাহ ছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১)[৮] -এর শিষ্য। সৈয়দ আহমদ শহীদ ১৮২২-২৩ সালে হজ্ব সমাপন কালে সাত শতাধিক শিষ্য সঙ্গে নিয়ে যান। সে সময় জেহাদের বাণী প্রচারের জন্য তিনি তার অনুসারীদের আরবি ফারসি বাদ দিয়ে হিন্দুস্তানী ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকা রচনা, প্রকাশ ও প্রচার করতে নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের অংশ হিসেবে হুগলির সৈয়দ আবদুল্লাহ ও বর্ধমানের বেলায়েত আলীকে এ জাতীয় পুস্তকাদি মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

কুরআনের উর্দু অনুবাদক শাহ আবদুল কাদির ছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ-এর ওস্তাদ। সৈয়দ আহমদ শহীদ সৈয়দ আবদুল্লাহকে শাহ আবদুল কাদির-এর মুদহি কুরআন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ছাপতে নির্দেশ দেন। পাণ্ডুলিপি আকারে প্রচারিত এ অনুবাদের একটি কপি সৈয়দ আহমদ শহীদের সঙ্গী হজ্ব যাত্রী সৈয়দ আলীর সঙ্গে ছিল। সৈয়দ আবদুল্লাহও এ হজ্বে শরিক ছিলেন। হজের সময় মক্কা থাকাকালে তিনি নিজ হাতে একটি কপি তৈরি করে কলকাতায় নিয়ে আসেন। উক্ত কপিটি অবলম্বন করেই ১৮২৯ সালে 'মুদহি কুরআন' পুস্তকটি তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। পুস্তকটি বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়। আমরা ১৮২৯ সালের ১ম সংস্করণ ছাড়াও বেশ কয়েকটি সংস্করণ দেখেছি। সম্ভবত এরই একটি কপি সংগ্রহ করে আকবর আলি শাহ আবদুল কাদিরের উর্দু অনুবাদ থেকে আমপারা অংশ বাংলা কাব্যে অনুবাদ করেন। পাঠকদের তুলনার সুবিধার জন্য আমরা শাহ আবদুল কাদিরের উর্দুর সঙ্গে আকবর আলির বঙ্গানুবাদ নিম্নে পেশ করছি :

সুরা ফাতিহা

আরবি	:	বিসমিল্লাহির রাহমান আর-রাহিম
আবদুল কাদির উর্দু তরজমা	:	শুরু আল্লাহ কি নামসে যু বড়া মেহেরবান নেয়ামত দেনে ওয়ালা
আকবর আলি বাংলা তরজমা	:	শুরু করি এ কেতাব নামেতে আল্লার। বড়া মেহেরবান সেই উপরে সবার।
আরবি	:	আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল 'আলামীন
আবদুল কাদির উর্দু তরজমা	:	সব তারিফ আল্লাহ কুহি জু সাহাব সারে জাহান কা
আকবর আলি বাংলা তরজমা	:	সকলি তারিফ আছে ওয়াস্তে আল্লার পালোনে ওয়ালা সেই সকল সংসার

উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে আকবর আলির গ্রন্থটি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এতে প্রদত্ত শানে নজুল, ফায়েদা ও অনুবাদ সবই আবদুল কাদিরের উর্দু ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অপরদিকে, শাহ আবদুল কাদির এর উর্দু অনুবাদের সঙ্গে মূল আরবি পাঠের তুলনা করলে দেখা যায় যে তার উর্দু অনুবাদের কম বেশি সব শব্দই আরবি এবং ফারসি। আকবর আলি যখন এটিকে বঙ্গানুবাদ করেন তখন বাংলা ভাষায়ও আরবি-ফারসি শব্দের আধিক্য ছিল। তা ছাড়া তখন কুরআনের শব্দ সম্ভারের কোনো পরিভাষাও তৈরি ছিল না। সেজন্য, এ অনুবাদের দুই দশক পরে নইমুদ্দিন যখন অনুবাদ শুরু করেন তখন তিনি "আরবি ভাষায় যে সকল শব্দ বঙ্গভাষায় ভাষান্তর অসাধ্য" তাহা আরবিতেই বহাল রাখেন। কুরআন অনুবাদে এ পদ্ধতি এখনও চলে আসছে। তাই, আকবর আলির অনুবাদের ১২০ বছর পরেও মাওলানা মুহিউদ্দিন সুরা ফাতিহার অনুবাদে ষোল শতাংশ আরবি শব্দ রেখে দিয়েছেন।

আমিরুদ্দীন বশুনিয়া

কুরআনের শেষ খণ্ড আমপারার আদি বাংলা অনুবাদক হিসেবে আর একজন দাবিদার হলেন আমিরুদ্দীন বশুনিয়া[৯]। বর্তমানে বশুনিয়া অনূদিত আমপারার কোনো কপিরই সন্ধান নেই। ফলে এ সম্বন্ধে যত আলোচনাই হয়েছে, তা হয়েছে পরোক্ষ তথ্যভিত্তিক। মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মাধ্যমে কাকিনার শেখ ফজলল করিমের বর্ণনা[১০], 'বাসনা' ও 'রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় হামেদ আলীর তথ্য[১১] আর অধ্যাপক আলী আহমদের যুক্তির উপর নির্ভর করে ডক্টর মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান বলেন :

> তাঁর বইটির প্রকাশকালের সঠিক সন তারিখ জানা না গেলেও মুদ্রণ রীতির উপকরণের প্রাচীনত্ব ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে একে প্রাচীন বলেই মনে করা হয়। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বইখানি পাথরের উপর কাঠের অক্ষরে ছাপা হয়েছিল। ... [ফলে], আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আমীরুদ্দীন বসুনীয়াকৃত আমপারার কাব্যানুবাদের প্রকাশকাল ছিল ১৮০৮/৯ খ্রী:। কারণ হামেদ আলী সাহেব তাঁর ... প্রবন্ধ লেখেন ১৯০৯ সালে এবং সে সময়ে তিনি মন্তব্য করেন যে, একশত বৎসর পূর্বে ... আমীরুদ্দীন বসুনিয়া আমপারার এই গদ্যানুবাদ [ভুল] রচনা করেন।

এ গ্রন্থটি সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করেছেন। এর সর্বপ্রথম আলোচক হলেন হামেদ আলী। তাঁর প্রবন্ধটি ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়। পরে সংগ্রাহক কাকিনার মুনশী শেখ ফজলল করিম কর্তৃক প্রণীত ঐ গ্রন্থের একটি বিস্তারিত বিবরণ স্বনামধন্য মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' নামে ১৯১১ সালে (১৩১৮ বাং) 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-য় প্রকাশ করেন। পরে, এই বিবরণটিই হুবহু সাহিত্যবিশারদের 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'—গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক ১৯১৩ (১৩২০ বাং) সালে প্রকাশিত হয়। বাংলা একাডেমী ১৯৬২ সালে আবদুর রহমান অনূদিত আমপারা প্রকাশ করেন। এর ভূমিকায়ও বশুনিয়া অনূদিত আমপারাটির একখণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারের ৫০২ সংখ্যায় রক্ষিত আছে বলে উল্লেখ করা হয়।

পুস্তকটি যেহেতু সাহিত্যবিশারদের তালিকা-গ্রন্থে স্থান লাভ করে, সেজন্য সকল পণ্ডিতের মনেই ধারণা জন্মে যে, এর একটি কপি সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহেও ছিল। 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'-এর প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। সম্ভবত এ কারণেই বাংলা একাডেমীর আমপারার ভূমিকা লেখক প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান মনে করেছিলেন যে, তালিকাভুক্ত ৫০২ সংখ্যক পুঁথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-এর সংগ্রহভুক্ত। পরে সম্ভবত বাংলা একাডেমীর সূত্র ধরে মতিউর রহমান বসুনিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-এর কথিত কপিটির তালিকা সংখ্যা ভুলবশত ৫২০ বলে উল্লেখ করেন। এই তিনটি লেখার উপর ভিত্তি করে ডক্টর মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান মনে করেন, "বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদেশে এই কাব্যানুবাদের তিন তিনটে কপি মৌজুদ ছিল"। ফলে তিনি শেখ ফজলল করিম ও সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহ পরীক্ষার পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারের "উভয় নম্বরে একাধিকবার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও গ্রন্থটির কোনো হদিস[১৩] পান নি। 'হদিস' না পাওয়ারই কথা। কারণ, প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যবিশারদের তথ্যানুযায়ী গ্রন্থটির একটি মাত্র কপি কাকিনার শেখ ফজলল করিমের কাছেই ছিল ; আর কারোও কাছে নয়।

প্রকৃত বিষয় এই যে, সাহিত্যবিশারদের মতোই কাকিনার (রংপুর) মুনশী শেখ ফজলল করিমও "পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে ব্যাপৃত" ছিলেন। তিনি "ইমাম-সাগর, গোসানী-মঙ্গল, আমছেপারার অনুবাদ ও হংস-বিলাস পাঁচালী—এই চারিখানি পুঁথি" সংগ্রহ করেন। এ চারখানি পুঁথির মধ্যে প্রথমখানি অর্থাৎ 'ইমাম-সাগর' ছিল কলমি, বাকি তিনটি মুদ্রিত।

সাহিত্যবিশারদ ও শেখ ফজলল করিমের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। সাহিত্য ও পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পত্রালাপ হত। সাহিত্যবিশারদের নিকট লিখিত পত্রে ফজলল করিম উক্ত চারখানি পুঁথি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিরবণ লিখে পাঠান। সাহিত্য-বিশারদ 'পত্রাবলী' থেকে উক্ত "চারিখানি পুঁথির বিবরণ ... সংকলিত করিয়া" প্রথমে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩১৮ : পৃ. ২৯-৩৫) 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'—এ প্রকাশ করেন। পরে উক্ত পুঁথিগুলোকে তিনি তাঁর প্রণীত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ"—এর ১ম খণ্ডের ২য় ভাগের ৫০০ হইতে ৫০৩ সংখ্যায় তালিকাভুক্ত করেন। আমাদের আলোচ্য "আমছেপারার অনুবাদ" উক্ত তালিকার ৫০২ সংখ্যক পুস্তক।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের "বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ"-এর বৈশিষ্ট্য হলো: পুস্তকে সংকলিত তালিকায় অন্যের সংগৃহীত ও বর্ণিত পুস্তক উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে স্থানকরণ। অন্যের বিবরণের ক্ষেত্রে সাহিত্যবিশারদ সংযোজিত শব্দাদি বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ করা আছে। তালিকার ৫০২ সংখ্যায় "আমছেপারার অনুবাদ"-টি সম্বন্ধে শেখ ফজলল করিমের বর্ণনা হলো :[১৪]

> সম্প্রতি আমি একখানি অতি প্রাচীন পাথরে ছাপা আরবি ও হস্তাক্ষরের মত বাঙ্গালা ছাপা "আমছেপারার" কবিতার অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থখানি ডিমাই ১২ পেজি সাইজের ৬৮ পৃষ্ঠা। গ্রন্থ সম্পূর্ণ। কিন্তু অগ্র পশ্চাতে কোথাও গ্রন্থকারের নাম-ধাম, সন-তারিখ নাই। গ্রন্থখানি অতি মূল্যবান। আমি জানিনা, এ গ্রন্থ কোন অদ্ভুত প্রেসে মুদ্রিত। একই প্রেসে,—বাঙ্গালা ও আরবি অক্ষরে এই প্রকার গ্রন্থ ছাপা হওয়া, প্রাচীন কালের পক্ষে বিচিত্র। প্রত্যেক "আয়েতের" পৃথক অনুবাদ আছে। গ্রন্থকার যে রংপুরবাসী কোন মহাজন, তাহা সুনিশ্চয়। কারণ, গ্রন্থে এতৎ প্রদেশ প্রচলিত অনেক শব্দ আছে। আমি শীঘ্রই এ গ্রন্থখানি "ইসলাম প্রচারকে" অবিকল প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি।...গ্রন্থের ছাপা বেশ পড়া যায়। আমার বিশ্বাস, এ দেশে বাঙ্গালা টাইপ প্রচলনের পূর্বে এ গ্রন্থখানি ছাপা হইয়াছিল।

প্রথমত গ্রন্থটির অনুবাদক সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। শেখ ফজলল করিম অনুবাদকের নাম ধাম সম্বন্ধে কোনো তথ্য সরবরাহ করে যান নি। তবে "গ্রন্থকার যে রংপুরবাসী কোন মহাজন" সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সুনিশ্চিত। কারণ, এতে "এতৎ প্রদেশ প্রচলিত অনেক শব্দ আছে"। কিন্তু, ১৯০৯ সালে হামেদ আলী তাঁর প্রবন্ধে আমপারাটির অনুবাদক হিসেবে আমিরুদ্দীন বশুনিয়ার নাম উল্লেখ করেন। হামেদ আলীর প্রবন্ধটি বাংলা ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাসের 'বাসনা' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। আমপারাটি শেখ ফজলল করিমের সংগ্রহে ছিল—আবার ফজলল করিমই ছিলেন 'বাসনা' পত্রিকার সম্পাদক। এই যুক্তিতে অধ্যাপক আলী আহমদ বক্তব্যটিকে নিখুঁত বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু, বিষয়টির আরো একটি দিক আছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, গ্রন্থটি সম্বন্ধে শেখ ফজলল করিম প্রণীত বিবরণই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ১৩১৮ (বাং) সালে প্রকাশ করেন। এতে 'ইমাম-সাগর'-এর পুঁথিটির বিবরণও প্রকাশিত হয়। মূল বিবরণে শেখ ফজলল করিম পুঁথিটির নকলনবিশ 'রাজে মহম্মদ' সম্বন্ধে কোনো তথ্য সরবরাহ করতে পারেন নি। পরে, অন্য এক পত্রের মাধ্যমে তিনি সাহিত্যবিশারদকে এ-বিষয়ে অবহিত করেন। সাহিত্যবিশারদই এ তথ্য 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণে' উল্লেখ করেন। 'আমছেপারা' সম্বন্ধেও ইতিমধ্যে কোনো নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে থাকলে ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদকে তা জানাতেন—আর তা তাঁর 'পুথির বিবরণ'-এর পাদটীকায় স্থান লাভ করত। অতএব, আমিরুদ্দীন বশুনিয়াই যে এ-অনুবাদটির প্রণেতা এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কোনো রায় দেয়া যায় না।[১৫]

এবার গ্রন্থটির অনুবাদ কাল সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। এ-বিষয়ে হামেদ আলী-র ১৯০৯ সনের লেখায় "একশত বৎসর পূর্বে ... বশুনিয়া এই আমপারার পদ্যানুবাদ রচনা করেন"[১৬] বলে আমরা জানতে পারি। হামেদ আলী হতে উদ্ধৃত এ বাক্যের প্রধান শব্দ হলো "রচনা"। রচনা করা, মুদ্রিত করা আর প্রকাশ করা একার্থবোধক নয়। বর্তমান নিবন্ধেই আমরা দেখেছি যে, ১৭৮০ সালে রচিত শাহ আবদুল কাদিরের উর্দু অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮২৯ সালে। এ যুক্তির উপর ভিত্তি করে আমপারাটি যে ১৮০৮ কিংবা ১৮০৯ সালে অনূদিত হয়েছিল তা আমরা হয়তো গ্রহণ করতে পারি।

ডক্টর মুজীবুর রহমানের মতে "বইখানি পাথরের উপর কাঠের অক্ষরে ছাপা হয়েছিল'।[১৭] এ-তথ্যটি ভুল। "পাথরের উপর কাঠের অক্ষরে" ছাপার কোনো রীতি কোথাও ছিল বা আছে বলে আমাদের জানা নেই। সম্ভবত মুদ্রণরীতির সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় লেখক এ মন্তব্য করেছেন। আর যদি এটি "কাঠের অক্ষরে ছাপা হয়ে" থাকে তবে এটি হবে "উড্‌কাট-প্রিন্টিং' বা 'উডেন ব্লক প্রিন্টিং'[১৮]। কাঠের অক্ষরে মুদ্রণের সঙ্গে পাথরের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, কাঠের অক্ষরগুলো পাথরে বসানো যায়না বলে এগুলো কাঠের উপরেই আঠা দিয়ে এঁটে তবে মুদ্রণ কাজ সমাধা করা হয়ে থাকে।

ব্লক মুদ্রণ পাথরেও হতে পারে। এ পদ্ধতিতে পাথরের ব্লকে অক্ষর কেটে মুদ্রিতব্য পাঠটি তৈরি করতে হয়। এভাবে অক্ষর কাটা পাথরটির উপর কাগজে রেখে তাতে চাপ দিয়ে মুদ্রণ কাজ সমাধা করতে হয়। কাজেই হয় এ মুদ্রণ হবে কাঠের ব্লক কিংবা পাথরের ব্লকে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই "পাথরের উপর কাঠের অক্ষরে" নয়।

আমাদেরই নিকট প্রতিবেশী চীন দেশে সপ্তম শতাব্দীতে এ প্রক্রিয়ায় মুদ্রণ রীতি আবিষ্কৃত হয়। এ প্রক্রিয়ায় চীনে মুদ্রিত কিছু পুস্তক নেপাল পর্যন্ত পৌঁছে[১৯]। ভারত উপমহাদেশে এ প্রক্রিয়ায় চাদরের উপর 'নামাবলী'ও মুদ্রিত হতো। কিন্তু পুস্তক তৈরির কাজে এ মুদ্রণ রীতি এ উপমহাদেশে কখনোই প্রচলিত হয় নি[২০]।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৭৭৭ সালে সর্বপ্রথম "এদেশে বাংলা টাইপ" প্রচলিত হয়। কাজেই 'এদেশে বাঙ্গালা টাইপ প্রচলনের পূর্বে' এটি মুদ্রিত হতে পারে না। তবে এ মুদ্রণ

যদি সত্যই "পাথরে ছাপা আরবি ও হস্তাক্ষরের মতো বাঙ্গালা ছাপা" হয়ে থাকে, তবে এ মুদ্রণের পদ্ধতি হবে লিথো মুদ্রণ।

১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে সর্বপ্রথম লিথোমুদ্রণ আবিষ্কৃত হয়।[২১] ১৮২৩ সালের ২৯শে মার্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নমেন্ট ড: জেমস রাইন্ডের তত্ত্বাবধানে কলকাতায় সর্বপ্রথম লিথোগ্রাফিক প্রেস স্থাপন করেন।[২২] ১৮২৩ সাল হতে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সক্রিয় এই প্রেস সরকার কর্তৃক প্রকাশিত "ভেকসিনেশনের বিবরণ যাহাকে কৌপাক কহা যায় — নামক ১৭ পৃষ্ঠার একমাত্র বাংলা পুস্তিকা মুদ্রিত করে।[২৩] তাছাড়া এ প্রেস কখনও বেসরকারি পুস্তক-পুস্তিকা মুদ্রণে হাত দেয় নি। ফলে বশুনিয়াকৃত অনুবাদটি এ প্রেসে ছাপা হতে পারে না।

কলকাতায় অত আগে কোনো লিথো প্রেসই প্রতিষ্ঠিত হয় নি। উক্ত সরকারি লিথো প্রিন্টিং প্রেসের পরে, ১৮৩২ সালে এশিয়াটিক লিথোগ্রাফিক কোম্পানির প্রেস নামে একটি লিথো প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইন্ডিয়া গেজেট প্রেস লিথু মুদ্রণ চালু করে।[২৪] কাজেই যদি লিথো প্রেসে মুদ্রিত হয়েই থাকে তবে এটি কোনো অবস্থায়ই ১৮০৮ ও ১৮০৯ সালে হতে পারে না। ঐ সময়ে কলকাতায় সর্বমোট ৯টি প্রেস ছিল, এদের কোনোটিরই লিথো প্রিন্টিং ছিল না। শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী প্রেসেও তখন পর্যন্ত লিথো মুদ্রণ আমদানি করে নি।[২৫] অতএব, সবচেয়ে আগে হয়ে থাকলেও এ পুস্তকটি ১৮৩২ সালের পূর্বে মুদ্রিত হতে পারে না। কিন্তু ১৮২৩ থেকে ১৮৬৬ সালের মধ্যে মাত্র দুটি বাংলা পুস্তক লিথো প্রেসে মুদ্রিত হয়। একটির কথা আগেই বলা হয়েছে। অন্যটি হলো বেনারসের মুফাদ্-ই-হিন্দ প্রেসে মুদ্রিত কালীদাস মৈত্র প্রণীত 'গুপ্তলীলা'[২৬]। ফলে, বশুনিয়া প্রকাশিত পুস্তকটি ১৮৬৬ সালের পরে ছাড়া আগে মুদ্রিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা-ই নেই।

পবিত্র কুরআনের ঊনত্রিশ ও ত্রিশ সংখ্যক পারায় ছোট ছোট সুরাগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। এদের মধ্যে আমপারা নামে অভিহিত ত্রিশ সংখ্যক পারার সুরাগুলোই সবচেয়ে ছোট। প্রাত্যহিক নামাজে এগুলোই পঠিত হয় সর্বাধিক। এজন্যই ইসলামি দেশসমূহে মুসলিম আলেমগণ কুরআন অনুবাদ করতে গিয়ে আমপারাকেই প্রাধান্য দেন। পারাগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় প্রাধান্য পায় ঊনত্রিশ সংখ্যক পারা। উর্দু ভাষায় অসংখ্য অনুবাদ ও তফসিরের মধ্যে আমপারার সংখ্যাই বেশি। অনুরূপভাবে ইন্দোনেশীয়, মালয়েশীয়, সোয়াহিলি, হাউসা, তুর্কী প্রভৃতি অনেক ভাষায়ই এ রীতি প্রচলিত আছে। সম্ভবত এ জন্যই বাংলার আলেম আকবর আলি ও আমিরুদ্দীন বশুনিয়া উভয়েই আমপারা অনুবাদে হাত দেন। কে জানে, পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে সমগ্র কুরআন তরজমার ইচ্ছাও তাঁদের ছিল কিনা!

অমুসলিম অনুবাদক

গোলাম আকবর আলি ও আমিরুদ্দীন বশুনিয়ার উদ্যোগের পরে কুরআন অনুবাদে এগিয়ে আসেন দু'জন অমুসলমান। এঁদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হলেন রাজেন্দ্র নাথ মিত্র।

তিনি গিরিশচন্দ্র সেনের তিন বছরে আগে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কুরআনের প্রথম পারার অনুবাদ করেন। ষোল পৃষ্ঠার এই অনুবাদ পুস্তকটি কলকাতার আয়ুর্বেদ প্রেস থেকে ছাপিয়ে অনুবাদক নিজেই প্রকাশ করেন। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের[২৭] তথ্যানুযায়ী অতীব ত্রুটিপূর্ণ এ অনুবাদটির ৫০০ কপি মুদ্রিত হয়। সম্ভবত প্রথম অংশ মুদ্রণের পরে অনুবাদক আর এ কাজে অগ্রসর হন নি।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. আবদুর রহমান, "আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজমা" **সাপ্তাহিক আরাফাত**, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, পৃ: ৩৭।

২. আলী আহমদ, "বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদের বঙ্গানুবাদ" **সাপ্তাহিক আরাফাত**, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, পৃ: ৫৭।

৩. মুজীবুর রহমান, **বাংলো ভাষায় কুরআন চর্চা**, পৃ. ২৪–২৯।

৪. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত।

৫. মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪।

৬. উক্ত, পৃ: ১৪৯।

৭. শাহ আবদুল কাদির অনূদিত কুরআন শরীফ "মুদহি কুরআন" (কলকাতা : ১৮২৯)–এর Colophon-এ "খতমুত তাবা" অংশে সৈয়দ আবদুল্লাহ তাঁর পূর্ব পুরুষদের বিবরণ লিখছেন।

৮. Mohiuddin Ahmad, **Sayyid Ahmad Shahid** (Lucknow : 1975), pp. 79-109 ; pp. 312-13 ; Chaudhury Ghulam Rasul Mehr, Sayyid Ahmad Shahid [Urdu text] (Lahore : 1952), Vol I, p. 200.

৯. এ বিষয়ে প্রকাশিত (হামেদ আলী "উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাপ্তাহিক "**বাসনা**", ২(১৩১৬ বাং) প্রবন্ধে বানানটি 'বশুনিয়া'। 'বসুনীয়া' বা 'বসুনিয়া' নয়—তাই বর্তমান প্রবন্ধে বানানটি 'বশুনিয়া'-ই লেখা হয়েছে। অবশ্য উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে শুদ্ধ করা হয় নি। কোনো ঐতিহাসিক স্থান ও ব্যক্তির নামের বানান পরিবর্তন করা রীতি বিরুদ্ধ। কারণ পরবর্তী গবেষকদের তথ্য সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয়।

১০. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, **বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ** ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা (কলকাতা : ১৩২০ বাং), পৃ. ৪৫–৪৬।

১১. হামেদ আলী "উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাহিত্য" **বাসনা**, ২ : (বৈশাখ ১৩১৬), পৃ. ৫। রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩য় ভাগ (১৩১৫ বাং), পৃ. ১১৯–২০।

১২. আলী আহমদ, **বাংলো মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী** (ঢাকা : ১৯৮৫), পৃ. ১১৯–২২০।

১৩. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭–১৮ ; পৃ. ২১।

১৪. সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

মুজীবুর রহমান তাঁর পুস্তকের ২০শ পৃষ্ঠায় এই উদ্ধৃতিটির ভাষা এমনভাবে পরিবর্তন করেছেন যে এতে শেখ ফজলল করিম যা বলতে চেয়েছিলেন তার বিপরীত বোঝা যাচ্ছে। ফজলল করিমের লেখা হলো "এই প্রকার গ্রন্থ ছাপা হওয়া প্রাচীনকালের পক্ষে বিচিত্র"। আর মুজিবুর রহমান তাঁর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন "এই কালের পক্ষে বিচিত্র"। এ পরিবর্তনটি যদি ইচ্ছাকৃত হয়ে থাকে তবে তা মারাত্মক অপরাধেরই সামিল।

১৫. দুভার্গ্যবশত শেখ ফজলল করিমের লিখিত পুথি-বিষয়ক পত্রগুলো সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহে বর্তমানে নেই।

১৬. হামেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

১৭. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

১৮. McMurtrie, **The Book**, pp. 84-122

১৯. B.H. Hodgson, "Notices of the languages, literature, and religions of Bauddh of Nepal and Bhot" **Asiatic Researches**, XXI (1828), p. 421.

২০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, **পাদ্রি মানো এল্-দা-আস্ সম্পসাম্ রচিত বাঙ্গলা ব্যাকরণ** (কলকাতা : ১৯৩১), পৃ. ২

২১. Khan, **Bengali Printintg**, p. 191.

২২. **Ibid**.

২৩. **Ibid**. p. 527

২৪. **The Calcutta annual directoty ... for ... 1833.**

২৫. Khan, **Bengali printing.**

২৬. **Ibid**. p. 626.

২৭. **Bengal Library Catalogue** (Calcutta : 1879), 2nd Qtr. No. 128. pp. 14-15.

গিরিশচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুবাদ

বাংলা ভাষায় কুরআনের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয় আজ থেকে শতাধিক বছর আগে ১৮৮৫ সালে[১]। অনুবাদক হলেন ব্রাহ্মধর্মের নববিধান মণ্ডলীর ধর্মপ্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন। অনুবাদটির প্রথম সংস্করণ খণ্ডাকারে প্রায় চার বছরে সম্পন্ন হয়। প্রথম খণ্ডটি 'সহর সেরপুর'-এর চারু যন্ত্রে শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত হয়। মুদ্রণকাল বাংলা ১২৮৮ সাল। মুদ্রণের পরে এটি ইংরেজিতে ১৮৮১ সালের ১২ই ডিসেম্বর রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্স অফিসে জমা দেয়া হয়। অনুবাদ গ্রন্থের আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

> কোরান শরিফ/প্রথম খণ্ড/মূল কোরাণ শরিফ হইতে অনুবাদিত/"তফসির হোসেনী" ও শাহ্ আবদুল কাদেরের/ "তফসির" অবলম্বন করিয়া টীকা লিখিত। "পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য"।/ সহর সেরপুর/চারুযন্ত্রে শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত।/১২৮৮/প্রতি খণ্ডের মূল্য ।‧/ অগ্রিম ১২ খণ্ডের মূল্য ২॥ টাকা।

সম্ভবত শেরপুরস্থ মুদ্রাযন্ত্রটি ছিল ছোটখাট বিষয় মুদ্রণোপযোগী। আর ময়মনসিংহ থেকে শেরপুরে যাতায়াতও তৎকালে সহজ ছিল না। সেজন্য, অনুবাদক শীঘ্রই তাঁর মুদ্রণ কাজটি শেরপুরের চারুযন্ত্রের কাছ থেকে তুলে নিয়ে কলকাতার শ্রীরাম সর্ব্বস্ব ভট্টাচার্যের বিধান যন্ত্রে অর্পণ করেন। দ্বিতীয় খণ্ডের কোনো আখ্যাপত্র নেই। পুস্তকের মলাটের উপরেই গ্রন্থবিবরণী দেখতে পাওয়া যায়। এ খণ্ডটিও বাংলা ১২৮৮ সালে "কলিকাতা [র] বিধান যন্ত্রে শ্রী রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত" হয়। এটি ১৮৮২ সালের ২১শে জানুয়ারি রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্সের দফতরে জমা দেয়া হয়। এমনও হতে পারে যে, দ্বিতীয় খণ্ডটিও ১৮৮১ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল।

মুদ্রণের সুবিধার জন্য এবং 'গ্রাহকদিগের গ্রহণে সহজ' হবে বলে প্রতিমাসে এক একখণ্ড হিসেবে এক বছরে অনুবাদটি শেষ করার পরিকল্পনা ছিল গিরিশ সেনের। এ প্রক্রিয়ায় যথা সময়ে কাজ শেষ করার লক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র একদিকে অনুবাদ করতে থাকেন, অন্যদিকে এ অনুবাদ প্রেসে ছাপা হতে থাকে। এটা চলতো পর্যায়ক্রমে। কিন্তু ১৮৮১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে অনুবাদটির এক তৃতীয়াংশ মাত্র প্রকাশ করা সম্ভব হয়। বারো খণ্ডে মুদ্রিত এ অংশে সুরা ফাতিহা থেকে সুরা তাওবার শেষ পর্যন্ত স্থান লাভ করে। এর (প্রথম ভাগের) সর্বশেষ (দ্বাদশ)[২] খণ্ড ১৮৮৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্সে জমা দেয়া হয়। খণ্ডাকারে প্রকাশিত এ

অংশটি যাতে প্রথম বালাম হিসেবে একত্র বাঁধাই করা যায়, সেজন্য দ্বাদশ খণ্ডের আখ্যাপত্রে "প্রথম ভাগ" কথাটি মুদ্রিত হয়।

অনুবাদের প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৮ (২৩ সেন্টিমিটার অকটে ভো), পরবর্তী প্রতি খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৩২, কিন্তু দ্বাদশ খণ্ডটি ৩৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। ফলে প্রথম ভাগের সর্বমোট পৃষ্ঠাসংখ্যা হয় ৩৮৪।

গ্রন্থটি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হলেও এতে ক্রমিক পৃষ্ঠাঙ্ক দেয়া হয়। সেজন্য মধ্যের খণ্ডগুলোর মলাটের আখ্যাপত্র ফেলে দিয়ে বাঁধাই করে নিলে এটি যে খণ্ডাকারে মুদ্রিত হয়েছিল, তা বোঝাই যাবে না। তবে শেরপুরে মুদ্রিত প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রটিকে প্রথম ভাগের আখ্যাপত্র হিসেবে ব্যবহার করলে এটি শেরপুরে ১৮৮১ সালে মুদ্রিত হয়েছিল বলে বোঝা যাবে। আবার দ্বাদশ খণ্ডের সঙ্গে প্রকাশিত আখ্যাপত্রটিকে মূল আখ্যাপত্র হিসেবে ব্যবহার করলে গ্রন্থটির প্রথম ভাগের সম্পূর্ণ অংশই ১৮৮৩ সালে কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হবে। কাজেই, বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জিকার একে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করলে অভিযোগ করার কিছুই নেই। সৌভাগ্যবশত, ব্রিটিশ লাইব্রেরি কোনো কিছু ফেলে না দিয়ে, যেভাবে খণ্ডে খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ঠিক সেভাবেই বাঁধাই করে সংরক্ষণ করেছে বলে বর্তমান গ্রন্থকারের পক্ষে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হয়েছে।

প্রথম ভাগের দ্বাদশ খণ্ডের বিজ্ঞপ্তিতে অনুবাদক জানান যে, দ্বিতীয় ভাগের প্রথম খণ্ড থেকে আরো বিশুদ্ধভাবে নতুন মুদ্রাক্ষরে অনুবাদটি প্রকাশিত হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্বিতীয় ভাগের প্রথম খণ্ড থেকেই "দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম খণ্ড", "দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড"— ইত্যাদি খণ্ডে চিহ্নিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালের মে মাসে। সুরা ইউনুস থেকে সুরা আল–নমল পর্যন্ত অনূদিত ও মুদ্রিত দ্বিতীয় ভাগের পৃষ্ঠাঙ্ক ছিল ৩৮৫ থেকে ৭৬০ (প্রথম ভাগের শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ছিল ৩৮৪)।

সম্ভবত অনুবাদকের ইচ্ছা ছিল দ্বিতীয় ভাগে ১৯ পারা পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু তা করতে হলে সুরা আল–নমলের অংশবিশেষ বাকি থেকে যায়। কাজেই তৃতীয় ভাগের প্রথম খণ্ড ২০ পারা থেকে শুরু হলেও সুরা কাসাস হয় এর প্রারম্ভ।

তৃতীয় ভাগের অংশগুলোও দ্বিতীয় ভাগের মতোই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর তৃতীয় খণ্ড থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত এক একবারে প্রতি দু'খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় ভাগের অনুবাদটির শেষ দু'খণ্ড (একাদশ ও দ্বাদশ) একত্রে ১৮৮৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হয় ; আর এটি রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্স অফিসে জমা দেয়া হয় ৩০শে জুলাই ১৮৮৫ সালে[৩]। সুরা কাসাস থেকে সুরা নাস পর্যন্ত ৮৭টি সুরা সমেত এই তৃতীয় ভাগটি ৭৬১ থেকে ১২০১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। সর্বশেষে সংযোজন হিসেবে আরও দু'পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞপ্তিও এ–গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উপর্যুক্ত তথ্য ও আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, গিরিশচন্দ্র সেনের বঙ্গানুবাদটি কৃত, মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালের শেষাংশ থেকে ১৮৮৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই পৌনে চার বছরের মধ্যে[৪]।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনুবাদটির প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডটি শেরপুরের চারুযন্ত্র থেকে এবং প্রথম ভাগের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে তৃতীয় ভাগের দ্বাদশ খণ্ড পর্যন্ত কলকাতার রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্যের বিধানযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক গিরিশ সেন বিভিন্ন সময়ে কলকাতার বাইরে চলে যেতেন। এজন্য তাঁর অনুপস্থিতিকালে প্রুপ সংশোধনে ত্রুটি হতে থাকে। অতএব তাঁর অনুবাদে বেশ ভুলভ্রান্তি থেকে যায়। ফলে তাঁর মুদ্রিত পুস্তকের "যে যে পত্রে গুরুতর ভুল হইয়াছে বা হইবে" সে সকল পত্র 'পুনর্মুদ্রাঙ্কিত করে গ্রাহকদের কাছে বিনামূল্যে পাঠানোর সিদ্ধান্ত তিনি নেন, যাতে গ্রাহক ও ক্রেতাগণ পুস্তক বাঁধানোর সময়ে অশুদ্ধ অংশের পরিবর্তে সংশোধিত পত্রগুলো সংযুক্ত করে নিতে পারেন[৫]। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুবাদক তাঁর গ্রন্থের প্রথম ভাগের দ্বাদশ খণ্ডে জানান, "যে যে পত্রে গুরুতর ভুল হইয়াছে, তাহা সংশোধনান্তর পুনর্মুদ্রিত করিয়া পাঠানো যাইতেছে, অশুদ্ধ পত্রগুলি পরিত্যাগপূর্বক তাহার স্থলে সংশোধিত পত্র সংলগ্ন করিয়া লইতে হইবে"।

অনুবাদের প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলেই ব্রাহ্ম-ভাই গিরিশ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিনামূল্যে তাঁর মুদ্রিত অনুবাদের কপি প্রেরণ করে তাঁদের এ মহতী কাজের সাহায্যার্থে গ্রাহক হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। অগ্রিম চাঁদা পাঠালে পরিকল্পিত ১২ খণ্ডের মূল্য নির্ধারিত হয় দু'টাকা আট আনা। অনুবাদক তাঁর তৃতীয় খণ্ড থেকেই গ্রাহকদের নাম প্রকাশ করতে থাকেন। আমরা প্রথম ভাগের তৃতীয় হতে শেষ পর্যন্ত চাঁদা দাতাদের সংখ্যা গণনা করেছি। এতে দেখা যায় যে, সর্বমোট ৫৫৫ জন লোক এ অনুবাদের গ্রাহক হয়েছিলেন।

অনুবাদকের তথ্যানুযায়ী প্রতিখণ্ডের এক হাজার কপি করে ছাপা হতো। মুদ্রা যন্ত্রের সাধারণ নিয়মানুযায়ী এক হাজার ছাপার মানে হলো সাড়ে বারশ'। তা'হলে দেখা যায় যে, এ গ্রন্থের প্রায় অর্ধেক চাঁদা দাতাদের কাছে পাঠানো হতো। আবার সব চাঁদাদাতা যে সব খণ্ড পেতেন তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। কারণ ষষ্ঠ খণ্ডে অনুবাদকের বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে, সকল গ্রাহক তাঁদের প্রতিশ্রুতি মূল্য পাঠাচ্ছেন না। তাই গিরিশচন্দ্র লেখেন, "অগ্রিম মূল্য না পাওয়াতে অর্থাভাববশত: কার্যের বড় বিশৃঙ্খলা হইতেছে। গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্বক সত্বর অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এজন্য পুন:পুন: সানুনয় প্রার্থনা করা যাইতেছে"। মূল্য পরিশোধ না করলে অনুবাদক দু' এক খণ্ড প্রেরণের পরেই পুস্তক পাঠানো বন্ধ করে দিতেন বলে অনুমতি হয়।

গ্রন্থ প্রকাশ সমাপ্ত হলে অনুবাদক জানান যে, এ পুস্তক মুদ্রণে সর্বমোট ২৫০০ টাকা খরচ হয়েছে এবং সমস্ত টাকাই গ্রাহকগণের কাছ থেকে পাওয়া গেছে[৬]। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গ্রাহকগণ প্রতি বারো খণ্ড আড়াই টাকা হিসেবে ৩৬ খণ্ডের জন্য সর্বমোট সাড়ে সাত টাকা চাঁদা দেন। অতএব ধরা যায়, সাকুল্যে ৩৫০ জন গ্রাহক আগাম মূল্য পরিশোধ করে এটি কিনেছিলেন। তাছাড়া নিশ্চয়ই বিভিন্ন বইয়ের দোকানেও এটি বিক্রি হতো।

আমরা ১৮৮১–১৮৮৫ সালের কথা বলছি। তখনকার দিনে ২৮ থেকে ৩২ পৃষ্ঠার একখণ্ড পুস্তকের মূল্য চার আনা, বর্তমান (১৯৯৫) মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে তা' ৯০ টাকার সমান। কাজেই আজকের দিনে ৩২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা যেমন ৯০ টাকায় কেউ কিনবেন না, তখনকার দিনেও চার আনায় এ অনুবাদ কেউ কিনতে পারতো বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না।

বারো খণ্ডের আগাম চাঁদা ছিল আড়াই টাকা। সেকালে আড়াই টাকা তিন টাকা ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের মাসিক বেতন। কাজেই নিম্ন মধ্যবিত্ত কোনো লোকের পক্ষে এ টাকা দিয়ে গ্রাহক হওয়াও সম্ভব ছিল না। তদুপরি, তৎকালে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। আমরা বিশেষ করে মুসলমান গ্রাহকদের নামের তালিকা একটি একটি করে পরীক্ষা করেছি। ঐ তালিকাভুক্ত মুসলমান গ্রাহকবৃন্দ হলেন দেলদুয়ারের জমিদার করিমুন্নেছা খানম, লাকসামের ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী, ঘোড়াশালের মিঞা ফজলুর রহমান, হয়বতনগর জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান আলীমদাদ খান, ঢাকার সৈয়দ হাসান আলী প্রমুখ জমিদার শ্রেণীর লোক। বাকি গ্রাহকগণও বিত্তশালী ব্যক্তি হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এসব বিত্তশালী ব্যক্তি ছাড়া আরো কিছু গ্রাহকের নাম মিলতে পারে—যাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক, প্রকৃতপক্ষে যাঁদের জন্য এ পুস্তক অনূদিত ও মুদ্রিত হয়। তদুপরি, খ্রিস্টান পাদ্রিরাও সম্ভবত কিছু সংখ্যক পুস্তক কিনে থাকবেন। এ দু'শ্রেণীর লোকেরা হয়তো বা শ'দেড়েক কপি কিনে বা সংগ্রহ করে থাকবেন।

তৎকালে শিক্ষিত অথচ নিম্নবিত্ত লোকদের মধ্যে গ্রন্থের চাহিদা ছিল খুবই কম। তা'ছাড়া সাধারণ গ্রন্থপ্রেমিক লোক সেযুগে তো বটেই, বর্তমান কালেও খুবই দুর্লভ। তবে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা একালের মতো সে যুগেও ছিল। সেজন্য তৎকালের গ্রন্থ বিক্রয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন গ্রন্থকার বলেন : "যে গ্রন্থকার আপনি ব্যয় করিয়া একবার একখানি পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন, তিনি প্রায় আর এরূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিতীয় বার মানস করেন না, কেননা প্রথমবারে যে কয়েকখানি পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক অংশও বিক্রয় হয় নাই"[৭]।

কিন্তু কুরআন মুসলিমদের নিত্যপাঠ্য। ধর্মীয় প্রেরণায় তাঁদের এ অনুবাদ কেনার কথা। কিন্তু নিম্নের আলোচনা হতে বোঝা যাবে, যে-ভাষায় এ অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল তা আরবি ভাষা থেকে কোনো অংশেই কম দুর্বোধ্য ছিল না। তদুপরি এ অনুবাদে মুসলিমদের নিত্যপাঠ্য মূল আরবি পাঠ পরিত্যক্ত হয়। ফলে, এটি সাধারণ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। অতএব, আগাম গ্রাহকবৃন্দ ও অন্যান্য ক্রেতার কাছে শেষ মুদ্রণ কাল পর্যন্ত পুস্তকটির পাঁচশ' কপির বেশি যে বিক্রয় হয় নি তা' নিশ্চিত ভাবেই অনুমান করা যায়। তা' না হলে অনুবাদক মূল্য কমিয়ে সাড়ে সাত টাকার পুস্তক চার টাকায় বিক্রয় করতেন না[৮]।

যে পাঁচশ' কপির কথা আমরা বলছি তা' মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাহকদের কাছে চলে যায়। কিন্তু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করে যে অংশগুলো অনুবাদক গ্রাহকদেরকে পাঠিয়েছিলেন, সেগুলো যে গ্রাহকগণ সবাই পেয়েছিলেন তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তা'ছাড়া যাঁরা নগদ মূল্যে বইয়ের দোকান থেকে কিনেছিলেন, তাঁদের নাম ধামও অনুবাদকের কাছে ছিল না। কিন্তু যখন বাকি পাঁচ বা সাত শ' কপি তিন খণ্ডে বাঁধাই করে বিক্রয় শুরু হয়, তাতে ভুল অংশগুলো বাদ দিয়ে সংশোধিত অংশগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কাজেই, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হওয়ার কালে যে যে কপি সরাসরি ক্রেতাদের হাতে চলে যায়, সেগুলোর পাঠ সমগ্র পুস্তক মুদ্রিত হওয়ার পরে বাঁধাই করে প্রকাশ করা তিনটি ভাগের পাঠ থেকে ভিন্ন। এজন্য, গ্রন্থবিদ্যার দৃষ্টিতে, এ দুটি আলাদা সংস্করণ। ফলে আমরা ক্রমান্বয়ে খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রিত অংশ ও গ্রাহকগণ কর্তৃক বাঁধাইকৃত ভাষ্যকে প্রথম সংস্করণ এবং অনুবাদক ও প্রকাশক কর্তৃক পরে সমগ্র অনুবাদ বিক্রয়ের জন্য তিন ভাগে বাঁধাইকৃত ভাষ্যকে দ্বিতীয় সংস্করণ হিসেবে অভিহিত করব। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তিন ভাগে বাঁধাইকৃত এ সংস্করণটি ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয়[৯]।

উক্ত সংস্করণটি প্রকাশিত হওয়ার তিন বছর পরে অনুবাদক ১৮৮৯ সালে পুনরায় একটি সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশে মনোনিবেশ করেন। কলকাতার দেবযন্ত্রে এটি মুদ্রিত করতে তিন বছর সময় লাগে। অবশেষে ১৮৯২ সালে একটি বিস্তৃত 'বিজ্ঞাপন' সহ এ সংস্করণটি প্রকাশিত হয়[১০]।

পুনরায় ১৯০৬ সালে অনুবাদক আরেকটি সংস্করণে হাত দেন। তৃতীয় সংস্করণ নামে অভিহিত এ সংস্করণটি কলকাতার কে.পি. নাথের মঙ্গলগঞ্জ প্রেস[১১] থেকে ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে ১৮৯২ সালের সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ।

ইতিমধ্যে অনেক মুসলমান এবং অমুসলমান কুরআন অনুবাদে হাত দেন। মুসলমাদের অনুবাদ গ্রন্থে কুরআনের মূল আরবি পাঠ সংযুক্ত থাকায় তাঁদের অনুবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ প্রায় ইতিহাসের পর্যায়ভুক্তই হয়ে যায়। কিন্তু, ব্রাহ্মসমাজ, তাদের দৃষ্টি ভঙ্গিতে অনূদিত গিরিশচন্দ্রের অনুবাদটি পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন অনুভব করে। ফলে, ১৯৩৬ সনে "চতুর্থ সংস্করণ" নামে অভিহিত এ পুনর্মুদ্রণটি[১২] নববিধান পাবলিকেশন কমিটির উদ্যোগে সীতানাথ চ্যাটার্জী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ সংস্করণের দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল পরে ১৯৭৭ সালে গিরিশচন্দ্রের অনুবাদটি ঢাকার 'ঝিনুক পুস্তিকা'র পক্ষে রুহুল আমিন নিজামী কর্তৃক নিউজপ্রিন্ট সংস্করণরূপে প্রকাশিত হয়[১৩]।

ঝিনুক পুস্তিকার এ উদ্যোগের পরে কলকাতার হরফ প্রকাশনীর আবদুল আজীজ আল-আমান গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ পাঠে "মুগ্ধ" হয়ে ১৯৭৯ সালে সংশোধিত আকারে তৃতীয় সংস্করণ-এর একটি পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করেন[১৪]। "সরকার প্রদত্ত স্বল্প মূল্যের কাগজে মুদ্রিত" এ সংস্করণের অতিরিক্ত আকর্ষণগুলো হলো : গিরিশচন্দ্র সেনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থ পরিচিতি, কুরআন বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি, "আল-কোরআনের আহ্বান"

নামক উদ্ধৃতি এবং "সুরা ও আয়াত অনুসারে নির্ঘন্ট"। অতিরিক্ত আকর্ষণগুলোর মধ্যে অন্যান্য বিষয় মোটামুটি ভাবে উৎরে গেলেও গ্রন্থপঞ্জিটি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়।

গিরিশচন্দ্রের অনুবাদের প্রথম প্রকাশ ঘটে আজ থেকে এক শতাব্দীর অধিককাল পূর্বে। আর এটিই ছিল বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। এ দীর্ঘ একশ' বছরে মোট ছয়টি মুদ্রণে এ অনুবাদের সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কুরআনের মূল ভাষার কিংবা এর অর্থের কিংবা উভয়েরই অনুবাদ হতে পারে। তবে প্রথমোক্ত অনুবাদ নিয়েই বাক-বিতণ্ডা এবং এ ধরনের অনুবাদকেই নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে। গিরিশচন্দ্রের অনুবাদে কুরআনের উভয় দিকই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এতে আছে মোটামুটি একটি আক্ষরিক অনুবাদ, যাকে বলা যায় "নজম'—এর অনুবাদ। সংক্ষিপ্ত টীকা-টিপ্পনীর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যাও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে, একে কুরআনের 'মা'য়ানা'-রও অনুবাদরূপে ধরা যায়।

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কুরআনের অনুবাদক গিরিশচন্দ্র সেন সম্বন্ধে[১৫] অনেক আলোচনা হয়েছে। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে বেশ কয়েকজন লিখেছেন। তাছাড়া তাঁকে জানার জন্য তাঁর আত্মজীবনীও রয়েছে[১৬]। তাঁর কুরআন অনুবাদ সম্বন্ধেও বেশ কয়েকজন লিখেছেন এবং প্রায় সবাই তাঁর অনুবাদের প্রশংসা করেছেন। অনুবাদ যখন খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন অনেকেই প্রশংসা করে বা বিরূপ সমালোচনা করে তাঁর কাছে পত্র লেখেন। যে যে পত্রে তাঁর অনুবাদের প্রশংসা করা হয়েছে সম্ভবত শুধু সে সকল পত্রই অনুবাদক তাঁর অনুবাদের শেষে জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সমালোচনামুখর পত্রগুলো হয়তো সযত্নে এড়িয়ে গেছেন, কারণ, তা না হলে তাঁর অনুবাদের প্রচার ও প্রসারের বিঘ্ন ঘটতে পারত।

অনুবাদটির প্রকাশনা শুরু হতে থাকলে আহমাদুল্লাহ, আবুল-আ'লা ও 'আবদুল আজীজ' নামক ব্যক্তিবর্গ এটি একটি "বিশ্বস্ত ও আনুপূর্বিক প্রকৃত অনুবাদ, উৎকৃষ্ট, বিস্ময়কর" অনুবাদ বলে প্রশংসা করে পত্র লেখেন। 'আলিমুদ্দিন আহমদের মতে, গিরিশচন্দ্রের অনুবাদটি "শাহ আবদুল কাদেরের অনুবাদের এবং তফসীর হোসেনীর অনুরূপ"। আবুল মোজফ্ফর আবদুল্লাহ "কোরান শরীফের অবিকল অনুবাদ, অন্য কোন ভাষাতেই এরূপ হয় না" বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। মৌলভী আফতাবুদ্দীন এটিকে "উৎকৃষ্ট, প্রাঞ্জল ... একটি উপাদেয় পদার্থ" বলে লেখেন। উদ্ধৃতিগুলো গিরিশচন্দ্র সেনের কাছে লেখা প্রশংসাপত্রের মন্তব্য[১৭]।

গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত "বিশ্বস্ত, উৎকৃষ্ট, বিস্ময়কর" কিংবা "অন্য কোন ভাষাতেই এরূপ হয় নাই, ও প্রাঞ্জল ... একটি উপাদেয় পদার্থ" প্রভৃতি মন্তব্য বা বিশ্লেষণ প্রয়োগ সৎ এবং পক্ষপাতহীনভাবে করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। পরবর্তীকালে, মওলানা আকরম খাঁ-র মতো ব্যক্তিও এ অনুবাদকে "জগতের অষ্টম আশ্চর্য"[১৮] বলে প্রশংসা করেন। কুরআনেরই একজন বঙ্গানুবাদক আকরম খাঁ কেন অতটা অতিশয়োক্তি করলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়।

গিরিশচন্দ্রের অনুবাদের পরে, গত একশ বছরে কুরআনের বহু অনুবাদ ও তফসির প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা না করেই গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হরফ প্রকাশনীর মালিক আবদুল আজীজ আল-আমান সম্প্রতি, "এ ধরনের তফসীর ইতিপূর্বে পাঠ" করেন নি বলে অযৌক্তিক অতিশয়োক্তি করেছেন এবং এর আরো একটি পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করে সাধারণ পাঠকদের বিভ্রান্ত করেছেন।

সুষ্ঠু অনুবাদ করতে হলে সাধারণত অনুবাদককে সংশ্লিষ্ট দু'টি ভাষায় সমানভাবে দক্ষ হতে হয়[১৯] : যদি মূল ভাষার শব্দ, বাগধারা সূক্ষ্মতা ও রচনাশৈলী সম্বন্ধে অনুবাদকের সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকে, তবে অনুবাদ ভ্রান্তিপূর্ণ হতে বাধ্য। অনুরূপভাবে, যে ভাষায় অনূদিত হচ্ছে সে ভাষার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। মূল ভাষায় কোনো শব্দের একাধিক অর্থ থাকলে প্রসঙ্গানুযায়ী সে শব্দের অনুবাদ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অনুবাদে যেন মূলের ন্যূনতম অর্থও ব্যাহত না হয়। এগুলো হলো যে কোনো অনুবাদেরই সাধারণ রীতি।

কুরআন অনুবাদের বিশুদ্ধতার এবং বিশ্বস্ততার সর্বপ্রধান শর্ত হলো অনুবাদকের বিশ্বাস। যে অনুবাদক ইসলাম ও কুরআনে বিশ্বাস করতে পারেন নি তাঁর অনুবাদ কখনো বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত হতে পারে না। ইসলামে বিশ্বাস, ধর্মবিজ্ঞান ও রসুলুল্লাহর হাদিস জানা না থাকলে কোনো অনুবাদকই কুরআন অনুবাদে সফলতা লাভ করতে পারে না। যাঁরা আবৃত্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত নন, তাঁরা পাঠকালে কোথায় কখন থামতে হবে তাও জানবেন না। উচ্চারণে সামান্য পরিবর্তন কিংবা নিয়ম বিরুদ্ধ বিরাম বা বিরতিতে কুরআনের আয়াতের অর্থেরও অহেতুক পরিবর্তন ঘটতে পারে।

গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫–১৯১০) প্রথমে ছিলেন হিন্দু। পরে কেশবচন্দ্র সেনের প্রেরণায় তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। গিরিশচন্দ্রের পিতামহ রামমোহন রায় ফারসি ভাষা জানতেন বলে মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের উচ্চ পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরই অনুসরণে তাঁর তিন পুত্র শুধু ফারসিই শেখেন নি, ফারসি লিপিতেও দক্ষতা অর্জন করে গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ, পান্দনামা প্রভৃতি বহু পুস্তক নকল করেছিলেন বলে কথিত আছে।

মুসলিম অধ্যুষিত ঢাকার পাঁচদোনা গ্রামের এহেন ফারসি-ভাষাজ্ঞানী পরিবারে গিরিশচন্দ্রের জন্ম। ফলে তাঁর পক্ষে ফারসি ও উর্দু শেখা সহজ হয়। বাল্যকালে তিনি পাঁচদোনার পার্শ্ববর্তী পল্লী শানখলা গ্রামের ফারসি পণ্ডিত কৃষ্ণরায়ের কাছে ফারসি শেখেন এবং কয়েকটি ফারসি পুস্তক অধ্যয়ন করেন। পরে গিরিশচন্দ্র তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে ময়মনসিংহে অবস্থানকালে সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কাজী মৌলভী আবদুল করিমের নিকট তাঁর ফারসি শিক্ষা অব্যাহত রাখেন।

ইতিমধ্যে ময়মনসিংহে একটি সংস্কৃত পাঠশালার প্রতিষ্ঠা হয়। গিরিশচন্দ্র এ পাঠশালায় ভর্তি হন। এখানে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠ শেষ করে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত কুমার-সম্ভব, রঘুবংশ, রামায়ণ, অভিজ্ঞান

শকুন্তলা ইত্যাদি পুস্তকের চর্চা করেন। পরবর্তীকালে এ সংস্কৃত শিক্ষা তাঁর সাহিত্য রচনাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম প্রচারের জন্য ময়মনসিংহে আগমন করলে এ শহরে ব্রাহ্মধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার শুরু হয়। এ সময়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণকারী হিন্দুদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। শুধু ধর্মগ্রহণ করেই গিরিশচন্দ্র ক্ষান্ত হন নি, প্রচারকের ব্রতগ্রহণ করে তিনি ব্রাহ্মধর্মের ব্যাপক প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলায় কুরআন অনুবাদ এবং অন্যান্য ইসলামি গ্রন্থ প্রণয়নও তাঁর এ প্রচার কাজের অংশবিশেষ।

ব্রাহ্ম ধর্মাধিকরণ কেশবচন্দ্র যখন সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনের জন্য বিভিন্ন ধর্মের মূলতত্ত্ব আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হন, তখন চারটি প্রধান ধর্ম—হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যয়নের জন্য চারজন ধর্ম প্রচারককে নির্বাচিত করেন[২০]। আগে থেকেই ফারসি এবং উর্দু ভাষায় গিরিশচন্দ্রের দক্ষতা ছিল। তাই ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের মূল ভাষা আরবি শিক্ষা করে বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি অনুবাদ করার ভার গিরিশচন্দ্রের উপর অর্পিত হয়।

আচার্যের এ আদেশ পালন করার জন্য গিরিশচন্দ্র আরবি ভাষা শিখতে লক্ষ্ণৌ নগরে চলে যান। সেখানে বিখ্যাত আলেম এহসান আলীর কাছে তিনি প্রায় এক বছর কাল আরবি ব্যাকরণ শেখেন। তারপর কলকাতায় একজন আলেমের কাছে আরো কিছুদিন আরবি ভাষা শিখে তিনি ঢাকা চলে আসেন। নলগোলার মৌলভী আলিমুদ্দীনের কাছে তিনি আরবের ইতিহাস ও আরবি সাহিত্য সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করেন।

আরবি ভাষা শেখার পর পরই তিনি কুরআনের বাংলা তরজমা শুরু করেন। সর্বপ্রথম তিনি ১৮৮০ সালে কুরআনের একটি ক্ষুদ্র সংকলন প্রকাশ করেন[২১]। পরে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদে হাত দিয়ে ১৮৮১ সালের শেষের দিকে কুরআনের প্রথম খণ্ড অনুবাদ করতে সক্ষম হন।

কুরআনুল করিমের অনুবাদ যে অত্যন্ত কঠিন তা প্রতিটি অনুবাদকই স্বীকার করেছেন। কুরআন অনুবাদে হাত দেয়ার পূর্বে অনুবাদককে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রস্তুতি নিতে হয়। গিরিশচন্দ্র সেন আরবি শিখতে প্রবৃত্ত হন ১৮৭৬ সালে আর অনুবাদে হাত দেন ১৮৮১ সালে। আরবি শেখা শুরু করা থেকে অনুবাদ শুরু করার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র চার বছর। আবার অনুবাদ শুরু করা থেকে শেষ করা ও তৎসঙ্গে মুদ্রণ পর্যন্ত তাঁর সময় লাগে চার বছরেরও কম।

বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও অনুবাদকদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা সুদীর্ঘকাল যাবৎ আরবি শিক্ষা এবং মূল কুরআন ও তফসিরাদি পাঠ করার পরেই তরজমায় হাত দিয়েছেন। বিখ্যাত হাউসা আলেম শেখ আবু বকর গুমী দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবৎ কুরআনের পঠন-পাঠন এবং হাউসা ভাষায় মৌখিকভাবে কুরআনের তরজমা ও ব্যাখ্যা দান করার পরে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে ঐ ভাষায় কুরআনের একটি লিখিত তরজমায় হাত দেন। অত:পর দীর্ঘ ৯ বছর পরে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে

তিনি ঐ তরজমা শেষ করতে সক্ষম হন[২২]। অনুরূপভাবে, আল্লামা ইউসুফ আলী চল্লিশ বছর, মুহম্মদ পিকথল্ প্রায় বিশ বছর এবং আর্থার জন আরবেরী বাইশ বছর চেষ্টার পরে ইংরেজিতে কুরআন তরজমা সম্পন্ন করেন[২৩]। এতদ্দেশে বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় মুদহি'ল কুরআনের প্রণেতা ত্রিশ বৎসরের অধ্যবসায়ের ফলে তাঁর তরজমা শেষ করতে সক্ষম হন। এ-কাজে তিনি জীবনের চল্লিশটি বছর মসজিদে এতেকাফে অতিবাহিত করেন[২৪]।

গিরিশচন্দ্র কুরআন অনুবাদের জটিলতা বিষয়ে মোটেই অবহিত ছিলেন না। তাই স্বল্প প্রস্তুতি নিয়েই তিনি এ-কাজে অগ্রসর হন। অনুবাদের প্রারম্ভে তাঁর ধারণা ছিল : প্রতিমাসে এক খণ্ড হিসেবে মোট বারো খণ্ডে তিনি অনুবাদটি শেষ করতে পারবেন। কিন্তু ৬ষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদকালে তিনি বুঝতে পারলেন যে, অনুবাদটি উনিশ কিংবা বিশ খণ্ডের কমে শেষ হবে না। অথচ দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশকালে তাঁর অনুবাদের পরিমাণ ছিল মাত্র এক তৃতীয়াংশ। তবু, দ্বাদশ খণ্ডেরই বিজ্ঞপ্তিতে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, অপর বারো খণ্ডে তাঁর তরজমা শেষ হবে। কিন্তু এ অনুমানও ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো। পরিশেষে, তিনি সর্বমোট ৩৬ খণ্ডে অনুবাদটি শেষ করতে সক্ষম হন[২৫]। তথাপি, অনুবাদের সম্পূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করতে তাঁর মাত্র পৌনে চার বছর সময় লাগে। অত অল্প সময়ের মধ্যে অনুবাদ কার্য সম্পাদনের ঘটনাটি কুরআনি সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। এ দিক দিয়ে গিরিশচন্দ্র সেন কৃতিত্বের অধিকারী

গিরিশচন্দ্রের অন্য সুবিধা ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আরবি শেখার আগেই তিনি ফারসি ও উর্দু ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এবং বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিরাজগঞ্জে তিনি উর্দুতে বক্তৃতা করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, তিনি উর্দু ভাষায় সবচেয়ে বেশি ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাই কুরআন অনুবাদে গিরিশচন্দ্র শাহ আবদুল কাদের ও শাহ রফিউদ্দীনের উর্দু তরজমারই আশ্রয় নেন। তদুপরি তাঁর ফারসি-জ্ঞান ছিল তৎকালে প্রকাশিত ফারসি অনুবাদ ও তফসির ব্যবহারের অনুকূল। তৎকালে প্রকাশিত ফারসি অনুবাদ এবং তফসির থেকেও সম্ভবত তিনি সাহায্য নিয়েছিলেন। মূল আরবি মোটামুটি জানা থাকায় এ অনুবাদ করা তাঁর পক্ষে আরো সহজ হয়েছিল।

প্রয়োজনীয় পরিভাষার অভাবে বাংলা ভাষায় একত্ববাদের মর্মবাণী পৌছানো ছিল তৎকালে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সেজন্য উইলিয়াম কেরী যখন বাইবেল অনুবাদের কসরত করছিলেন, তখন তিনি এক বিরাট বাধার সম্মুখীন হন। ১৭৯৯ সালে ইংল্যান্ডের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটিকে এক পত্রে তিনি এসব অসুবিধার কথা বিস্তারিতভাবে লেখেন[২৬]। এ-জাতীয় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্রও।

তাঁর আরো একটি অসুবিধা ছিল। খ্রিস্টমতে একত্ববাদের পাশাপাশি ত্রিত্ববাদও প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু ইসলাম ও কুরআনে এমন ধারণার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ, ইলাহ প্রভৃতি আরবি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নেই ; ফলে, আল্লাহ শব্দকে গিরিশচন্দ্র

কখনো ঈশ্বর, কখনো পরমেশ্বর বলে অনুবাদ করেছেন। এভাবে, আল্লাহ্-র প্রতিশব্দের বহু বচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ইত্যাদিতে ইসলামে পরোক্ষভাবে শিরক অর্থাৎ অংশীদারিত্বের ধারণা প্রবর্তিত হয় ; অথচ শির্ক-এর বিরোধীতা করে তাওহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামের আগমন।

উর্দু, ফারসি ও আরবি ভাষা জানা থাকলেও ময়মনসিংহের সংস্কৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষাই সম্ভবত গিরিশচন্দ্রের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে তিনি তাঁর ভাষাকে অতিসংস্কৃতায়িত করে ফেলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর একটি অনূদিত বাক্যের উল্লেখ করা যায় : "তোমরা মর্কট হইয়া যাও[২৭]। 'মর্কট' যে বানর, অভিধান না দেখলে সেকালে যেমন একালেও তেমনি কোনো সাধারণ মুসলিমের বোধগম্য নয়। অনুবাদ চলাকালে যশোরের মৌলভী আফতাবউদদীন গিরিশচন্দ্রকে দু'একটি বিষয়ে পরামর্শ দেন। তিনি গিরিশচন্দ্রকে "অপিচ যাহারা নির্ধন তাহারা উপযুক্তরূপে ভোগ করিবে"—এই অনুবাদের পরিবর্তে "যে গরিব সে তন্মধ্য হইতে বিবেচনা মত লইবে" লিখতে পরামর্শ দেন[২৮]। আহমদুল্লাহ প্রমুখ লেখেন, "যদি পুস্তকের ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল করিতে পারেন তবে স্বল্পশিক্ষিত লোক, বিশেষত মুসলমানগণের উপকারে আসিবে"[২৯]। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এসব পরামর্শ গ্রহণ করেন নি।

শত-বর্ষাধিক কাল পূর্বে গিরিশচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর অনুবাদের কোনো নিরপেক্ষ অথচ বিশ্বস্ত মূল্যায়ন হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কুরআনের প্রথম অনুবাদ হিসেবে এর সাহিত্যিক ও পুরাতাত্ত্বিক মূল্য যতই থাকুক না কেন, এর ব্যবহারিক মূল্য কতটুকু তা' যাচাই করার অবকাশ এখনো আছে। একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের পরিবর্তে বিগত শতবর্ষ ধরে প্রায় প্রত্যেক আলোচকই গিরিশচন্দ্রের এ অনুবাদটিকে বাংলায় প্রথম অনুবাদ বলে সপ্রশংস দৃষ্টিতেই দেখে এসেছেন। এঁদের মধ্যে মাত্র তিনটি ব্যতিক্রম আমাদের নজরে এসেছে। এ-বিষয়ে সর্বপ্রথম সমালোচক হলেন গিরিশচন্দ্রের অনুবাদের একজন গ্রাহক ও পাঠক ঘোড়াশালের মিঞা ফজলুর রহমান। সম্ভবত তিনি গিরিশ সেনের অনুবাদটি ভালোভাবেই পাঠ করে থাকবেন। পরে, মৌলভী নইমূদ্দীন খণ্ডে খণ্ডে তাঁর অনুবাদ প্রকাশ করতে শুরু করলে মিঞা সাহেব এটির গ্রাহক হয়ে প্রথম দুই খণ্ড পাওয়ার পর 'আখবারে এসলামীয়া'-তে একটি 'সমালোচনা'[৩০] প্রকাশ করেন। সমালোচনায় তিনি গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মতামত ব্যক্ত করেন:

> "প্রায় ৪/৫ বৎসর হইল ... গিরিশচন্দ্র সেনের অনুবাদিত একখানা বাঙ্গালা কোরান আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু সেই খানা নিতান্তই ... অসম্পন্ন, অস্পষ্ট ও অবিশুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে একজন অনভিজ্ঞ বিধর্মী দ্বারা কোন ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ হইলে তাহা যেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা, উক্ত অনুবাদটিও ঠিক সেই রূপই হইয়াছে। গিরিশ বাবু তাঁহার গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "আমি এই অনুবাদটি লেখার পূর্ব্বে সমগ্র কোরাণখানি অথবা কোরাণের কোন একটি সুরার

আদ্যন্ত একবারও পাঠ করি নাই। যখন যে অংশের অনুবাদ করিয়াছি তাহাই পাঠ করিয়া অনুবাদের কার্য্য চালাইয়াছি"। পাঠকগণ এইক্ষণ উক্ত অনুবাদটি যে কিরূপ হইয়াছে তাহা আপনারাই একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বহুদিন পর্য্যন্ত আরব্য ভাষার বিশেষ রূপ অনুশীলন করিয়া মৌলভী ও মৌলানা প্রভৃতি উচ্চতর উপাধি লাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা প্রত্যহ নিয়মিত রূপে নিয়মিত নিষ্ঠা ও একান্ত মনোযোগের সহিত কোরাণ পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহাদেরও কোরাণের কোন কোন স্থলের অর্থ ও তাৎপর্য্য [ব্যাখ্যা] করিতে মাথা ঘুরিয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গিরিশ বাবুর আরব্য ভাষায় অদৃশ্য ব্যুৎপত্তি বা অধিকার না থাকা সত্ত্বেও অথচ পূর্ব্বে একবার মাত্র সমগ্র কোরাণখানি আদ্যন্ত পাঠ না করিয়াও হঠাৎ তাহার অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছেন!!! হয়ত গিরিশ বাবুর এই কার্য্যকে কেহ কেহ বড় বাহাদুরীর কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে গিরিশ বাবুর কিছু মাত্র বাহাদুরী হয় নাই। বরং অনুবাদ করার পূর্ব্বে সমগ্র কোরাণখানি ভালরূপ বুঝিয়া সুঝিয়া পাঠ না করায় তাঁহার অনুবাদের অনেক স্থলেই রহিম স্থলে রাম হইয়াছে, এমনকি ঢেকি লেখিতে ক ভুল হইয়াছে। কোন ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করিতে হইলে অনুবাদকের সেই ধর্ম্মে সম্পূর্ণ জ্ঞান, বিশ্বাস ও অধিকার থাকা আবশ্যক। এবং অনুবাদকালে বিশেষরূপ সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার এরূপ বিশুদ্ধ অনুবাদ করা কর্তব্য যে তাহাতে মূল সম্বন্ধে কিছু মাত্র ভুল ভ্রান্তি না ঘটে। যাঁহার এরূপ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার ও শক্তি নাই তাঁহার তেমন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা নিতান্তই অজ্ঞান ও ধৃষ্টতা। এরূপ কার্য্য দ্বারা যে কেবল তাঁহারই ধৃষ্টতা প্রকাশ পায় ইহাই নহে, তৎসঙ্গে সেই ধর্মগ্রন্থের অবমাননা করা হয়। কিন্তু নিতান্তই দুঃখের বিষয় এই যে গিরিশ বাবু একজন খ্যাতনামা ধর্ম প্রচারক হইয়াও সেইরূপ একটি গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। কিছুমাত্র অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করেন নাই। ফলত: গিরিশবাবু কোরাণের অনুবাদ করিতে যাইয়া স্থানে স্থানে বড়ই অনধিকার চর্চার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি সাধারণত একজন সরল প্রকৃতির ব্রাহ্ম মিশনারী বলিয়া পরিচিত হইলেই এই কার্য্যটী যেন তাঁহার সরলতার বিপরীত হইয়াছে। ফলত মুসলমান ধর্মের সর্বপেক্ষা জটিল ও দুরূহ ধর্মগ্রন্থ কোরাণের অনুবাদ করা কোন মতেই কর্তব্য ছিল না।

যাহা হউক আমরা একথা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে উক্ত গিরিশ বাবুর অনুবাদিত কোরাণ প্রকাশিত হওয়ার সময় হিন্দু মুসলমান অনেকেই মুসলমান ধর্ম্মের সারমর্ম জানিবার জন্য একান্ত আগ্রহের সহিত অগ্রিম মূল্য দান করিয়া তাহার গ্রাহক হইয়াছিলেন। কিন্তু গ্রহ বৈগুণ্যে সে যাত্রা তাঁহাদের সেই অভীষ্ট সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় নাই। যেহেতু গিরিশ বাবুর উক্ত অনুরোধে অনেক ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে ; সুতরাং তদ্বারা কোরাণের সমুদয় স্থলের মর্ম্মোদঘাটিত হয় নাই"।

বিখ্যাত ওয়ায়েজ, কলিকাতা মাদ্রাসার নামকরা ছাত্র, বঙ্গীয় জমিয়া উলামার সভাপতি মওলানা মুহম্মদ রুহুল আমিনও ছিলেন পবিত্র কুরআনের একজন অনুবাদক। তিনি কুরআনের আমপারা অংশের অনুবাদ ও তফসির সর্বপ্রথম দু'খণ্ডে ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে প্রকাশ করেন। পরে তিনি আলেফ-লাম-মিম (১৯২৫), সাইয়াকুল (১৯২৭) ও তিলকার-রসুল (১৯৩০)—এ তিনটি পারারও অনুবাদ করেন। তাঁর আমপারার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। তিনি তাঁর আমপারা অংশের প্রতিটি সুরায় গিরিশচন্দ্রের ভুল-ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। আমপারার ভূমিকায় মাওলানা রুহুল আমিন[৩১], "তদীয় অনুবাদে তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্ম বিশ্বাসের অনেকটা আভাস দিয়াছেন—যাহা অনেক স্থলে ইসলামের মতবিরুদ্ধে হইয়াছে ... আমি বাধ্য হইয়া তাঁহার ভুল ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছি। কারণ, পবিত্র কোরআন শরিফের মানে মৎলব ভুল বুঝিলে মুসলমানের ইমান যাইবার আশঙ্কা"। তিনি একস্থলে গিরিশচন্দ্রের আরবি "ইয়াতিম"-এর বাংলা প্রতিশব্দ "নিরাশ্রয়" ব্যবহারকে ভুল বলেছেন। তদুপরি, গিরিশচন্দ্র সুরা হোমাজার টীকায় "নরক" সম্বন্ধে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেন "এই ছুরাতে নরক যে বাহিরে নয় অন্তরে, ইহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।" ফলে, মওলানা আমিন বলেন, "গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন, উক্ত মতাবলম্বীগণ বাহ্য বেহেশত্-দোজখের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা আত্মিক বেহেশ্‌ত দোজখের মত ধারণ করেন। কোর-আন শরিফ জ্বলন্ত ভাষায় উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। এই ছুরাতেই বাহ্য দোজখের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তিনি এরূপ ভ্রমাত্মক টীকা লিখিয়া স্বীয় ব্রাহ্মমত সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, ইহাতে তিনি কোরআন শরিফের মর্ম্ম পরিবর্তন করিয়াছেন। এইরূপ তিনি অনেক স্থলে ভ্রমাত্মক টীকা লিখিয়াছেন"[৩২]।

গিরিশচন্দ্রের সবচেয়ে তীব্র সমালোচনা হলো হাদিস-অনুবাদ প্রসঙ্গে হুগলীর বড়ম্বা মাদ্রাসার শিক্ষক এস্রাইল করমজী-র "মেস্কাতের বঙ্গানুবাদে গিরিশবাবুর ভ্রম" শীর্ষক প্রবন্ধ[৩৩]।

কুরআনের মতো এটিও খণ্ডে খণ্ডে ১৮৯২ হতে শুরু করে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত হয়। পরে সমগ্র অনুবাদটি দুই বালামে প্রকাশ লাভ করে[৩৪]। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে এরই একটি খণ্ড মোহাম্মদ করমজী-র হাতে আসে এবং তিনি এর একটি দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। এই সমালোচনার প্রারম্ভিক বাক্যটি ছিল বিখ্যাত উর্দু প্রবাদ "মোম সমঝেজিছে, উঅহ্ পাথথর নিক্‌লা" অর্থাৎ যাকে মোম (সদৃশ কোমল) মনে করলাম তা' পাথর (-এর ন্যায় কঠিন) রূপে বেরিয়ে এলো।

করমজীর সমালোচনাটি মূলত গিরিশচন্দ্র অনূদিত হাদিস-সম্পর্কিত হলেও বিষয়বস্তু ছিল জিব্রাইল (আ:) ও শয়তান ; পবিত্র কুরআন ও হাদিস উভয়েই আলোচিত। ইতিপূর্বে গিরিশচন্দ্র কুরআনের অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনী রচনা করেছেন। তথাপি, উক্ত বিষয় দু'টি সম্বন্ধে মেশকাতের অনুবাদে তিনি ইসলাম, কুরআন ও হাদিসের মূলনীতি ও ধ্যান-

ধারণার পরিপন্থী মন্তব্য করায় করমজী একটি সুদীর্ঘ সমালোচনার অবতারণা করেন। উপসংহারে গিরিশচন্দ্রের কুরআনি জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে উপহাসের সুরে করমজী বলেন[৩৫] :

> অনুবাদক কোরান হাদিসে কিরূপ অনন্ত জ্ঞান, গভীর অনুসন্ধিৎসা লাভ করিয়া কোরান হাদিস হইতেই জিব্রাইল (আ:) ও শয়তানের আকার-বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে উড়াইয়া দিতেছেন, আবার কোরন হইতেই আপন উক্তির প্রতিপোষকতা প্রমাণিত করিতেছেন। ...
>
> এদিকে যে, কোরান শরীফে জিব্রাইল ও শয়তানের অস্তিত্ব বিষয়ক স্পষ্ট রাশি রাশি আয়াত ভূরি ভূরি অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান আছে সেদিকে মুহূর্তেও তাঁহার কটাক্ষপাত হয় নাই।

সমালোচক করমজী তাঁর আলোচনার উপসংহারে গিরিশচন্দ্রের "অুনবাদিত এসলাম শাস্ত্র সংক্রান্ত পুস্তকাদি ... পাঠ করা"-র সময়ে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য সমধর্মী লোকদেরকে পরামর্শ দেন[৩৬]।

মৌলবী আফতাবউদ্দীন, মৌলবী আহমদুল্লাহ, মিঞা ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ রুহুল আমিন ও মোহাম্মদ এস্রাইল করজমী প্রমুখের পরামর্শ, অনুরোধ ও সমালোচনা থেকে বোঝা যায় যে অনুবাদটির ভাষা যেমন ছিল তৎকালীন মুসলমানদের অনুপযোগী, তেমনি এর ভাবধারাও ছিল ইসলামী নীতির পরিপন্থী। ফলে, সম্ভবত তৎকালীন কোনো আলেমই এ অনুবাদকে মুসলমানদের পাঠোপযোগী হিসেবে অনুমোদন দান করেন নি।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এ পর্যন্ত কুরআনের যতো অনুবাদ হয়েছে সেগুলোকে অনুবাদকের উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণী হলো, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ও ইসলাম ধর্মে নিবেদিত প্রাণ মুসলমানদের অনুবাদ। যার উদ্দেশ্য হলো ইসলামকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা ও মুসলমানদের ঈমানকে দৃঢ়তর করা। এই শ্রেণীর অনুবাদের উদাহরণ : ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদক সংঘ কর্তৃক সম্পাদিত কিংবা মওলবী নইমূদ্দীন প্রমুখের রচিত বঙ্গানুবাদ, আল্লামা ইউসুফ আলী-র ইংরেজি অনুবাদ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুবাদ হলো এক প্রকার নিরপেক্ষ অুনবাদ ; এ ক্ষেত্রে অনুবাদক বুদ্ধিজীবী গবেষক। জ্ঞান বিতরণোদ্দেশ তাঁরা অুনবাদ করে থাকেন। তাঁরা একথা চিন্তা করেন না, তাঁদের অনুবাদ মুসলমানদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া জাগাবে বা খ্রিস্টানগণ তাকে কিভাবে গ্রহণ করবে। তাঁদের উদ্দেশ্য বস্তুনিষ্ঠ অনুবাদ। এ-জাতীয় অনুবাদের উদাহরণ হলো আর্থার আরবেরীর ইংরেজি অনুবাদ।

তৃতীয় শ্রেণীর অনুবাদ হয় বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে—উদ্দেশ্য স্বধর্মের প্রতিরক্ষা বনাম ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার। এ জাতীয় অনুবাদের দৃষ্টান্ত হলো : মারাচ্চি-র ল্যাটিন কিংবা জর্জ সেল-এর ইংরেজি অনুবাদ। তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র সিংহ কিংবা

উইলিয়াম গোল্ডসেক–এর বঙ্গানুবাদ এ পর্যায়ভুক্ত। বর্তমানে আলোচ্য গিরিশচন্দ্রের অনুবাদও প্রায় এ পর্যায়েই পড়ে ; উদ্দেশ্য : ব্রহ্মবাদের পোষকতায় ধর্ম সমন্বয়।

তৃতীয় শ্রেণীর অনুবাদগুলো শুধু উদ্দেশ্যমূলকই নয়, বরং বিদ্বেষমূলকও বটে। খ্রিস্টান পাদ্রি কর্তৃক হিন্দুদের ধর্মান্তরীকরণ রোধ করা ছিল ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনের একটি কারণ[৩৭]। এ ধর্ম বঙ্গদেশের হিন্দুধর্ম ও সমাজে এক বিরাট বিবর্তনের সূচনা করে। আবার এদিকে ঐ সময়ে মুসলমানেরাও ছিলেন বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এ বিষয় আগেই আলোচিত হয়েছে। তৎকালে হিন্দুদের মতো কিছু সংখ্যক মুসলমানও খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বন করে। এই সুযোগে ব্রাহ্মগণও মুসলমানদের মন জয় করতে চেষ্টা চালাতে থাকে। এতে কিছুটা সাফল্যও লাভ করেন তাঁরা। ঢাকার যুবক জালালুদ্দীনের ব্রাহ্ম মতবাদ গ্রহণ হলো এর একটি উদাহরণ। এক মুসলমানের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের এ ঘটনা সম্ভবত নববিধান সমাজের প্রধান কেশবচন্দ্র সেনকে হিন্দু ব্যতীত মুসলিমদের মধ্যেও ব্রাহ্ম বিধানের বাণী পৌঁছে দিতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি এক বক্তৃতা/প্রার্থনায় পরম ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করে বলেন[৩৮]।

> মা, আমরাও কাহাকে তোমার সিংহাসন স্পর্শ করিতে দিব না। ... আমরা তোমার গৃহ মুসলমান সিপাই দ্বারা রক্ষা করিব। তুমি অদ্বিতীয়, নিরাকার ব্রহ্ম, কোন সৃষ্ট জীব তোমার তুল্য হইবে, তোমার এই অপমান কখনও আমরা সহ্য করিব না। এ বিষয়ে আমরা মুসলমান ...।

"ব্রহ্মের সিংহাসন" রক্ষা করতে হলে "মুসলমান সিপাই" নিয়োগ করা প্রয়োজন। এ জন্য মুসলমানদের মন জয় করতে হবে—তবেই না কার্য সিদ্ধ হবে। সেজন্য মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে হবে। অন্যদিকে মুসলমানেরা তাদের ধর্মগ্রন্থ অমুসলমানদের কাছে বিক্রয় পর্যন্ত করেন না। ফলে, অনুবাদ ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই কেশব সেন ধর্ম-প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেনকে এ অনুবাদের কাজে নিযুক্ত করেন।

গিরিশচন্দ্র সেন যদিও ইসলামি সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় লালিত পালিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন, তথাপি তিনি মুসলমানদের ঘৃণা করতেন। হিন্দু থাকাকালে মুসলমানদের ছায়া মাড়ালেও তিনি যেন অপবিত্র হলেন, মনে করতেন। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পরেও তাঁর এ মনোভাব পরিবর্তিত হয় নি। তিনি লেখেন :[৩৯]

> আমি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদানের পরও বহুকাল পর্যন্ত মোসলমানদের প্রস্তুত পাউরুটি ভক্ষণ করি নাই ...।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির "বহুকাল পর্যন্ত" উক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ। গিরিশচন্দ্র ১৮৭৪ সালে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করলেও ১৮৮০ সালে বঙ্গচন্দ্র রায়ের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে মণ্ডলীভুক্ত হন। অতএব, দেখা যাচ্ছে কুরআন অনুবাদ কালেও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষভাব তাঁর মনে জাগ্রত বা প্রচ্ছন্ন ছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে স্বীয় শিক্ষাজীবন সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য রেখে গেছেন। তিনি বহু হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করেন। তাঁর হিন্দু শিক্ষকদের কথা বলতে গিয়ে তিনি

প্রতিটি শিক্ষকের নাম ও তথ্য সরবরাহ্ করেছেন। অথচ, মুসলমানদের ক্ষেত্রে তিনজন ছাড়া অন্যদের "একজন মোনশী" বা "একজন মৌলভী" বলে ছেড়ে দিয়েছেন। ইহা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাঁর তাচ্ছিল্য বৈ কিছু নয়। এহেন মনোভাব নিয়ে কোনো ব্যক্তি কুরআনের একটি বিশ্বস্ত অনুবাদ করতে পারেন না। তাছাড়া অনুবাদে হাত দেয়ার পূর্বে তিনি আদ্যোপান্ত পবিত্র কুরআন পড়ে প্রকৃতপক্ষে বুঝে নিয়েছিলেন, তাও নয়। কারণ তাঁর নিজের বিবৃতি হলো[৪০] :

> আমি কুরআনের অনুবাদ পূর্বে সমাপ্ত করিয়া পরে তাহা মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এরূপ নহে, বরং পূর্বে কুরআনের দুই এক সুরার কিয়দংশ ব্যতীত পাঠও করি নাই, তাহার একটি শব্দের অর্থও কোন মৌলবীর নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া লই নাই।
>
> ... ১৮৮১ সালের শেষভাগে আমি ময়মনসিংহে যাইয়া স্থিতি করি, সেখানে কোরান শরীফ কিয়দ্দূর অনুবাদ করিয়া প্রতি মাসে খণ্ডশ: প্রকাশ করিবার জন্য সমুদ্যত হই।

ব্রাহ্মধর্মের প্রচার নীতি, কুরআনি বিজ্ঞানে অপরিপক্কতা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষই গিরিশচন্দ্রকে একটি পক্ষপাতদুষ্ট অনুবাদে অনুপ্রাণিত করেছে।[৪১]

গিরিশচন্দ্র সেনের অনুবাদের অতগুলো সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার দরুন অনেকের ধারণা যে এটি মুসলমান সমাজে দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ড: মুজীবুর রহমানের মতে "গিরিশ বাবুর কুরআন-তর্জমার মুদ্রণ ও প্রচার কার্য্যে গিরিশ বাবুর যে অর্থ ব্যয় করেছিলেন তা সমস্তই তিনি মুসলিম গ্রাহকদের কাছ থেকে পেয়ে যান। একথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন"[৪২]।—এই উক্তিটি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, গিরিশচন্দ্র উক্ত পুস্তক মুদ্রণে ২৫০০ টাকা ব্যয় করেন। এই ব্যয়ের সম্পূর্ণ টাকা তিনি গ্রাহকদের কাছ থেকে পেয়ে যান, এ-কথাও সত্য। আমরা এ গ্রাহকদের আর্থিক অবস্থান সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। এখন আমরা এদের ধর্মীয় অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করব।

আগেই বলা হয়েছে, গিরিশচন্দ্র তাঁর অনুবাদের প্রথম ভাগের তৃতীয় খণ্ড থেকে গ্রাহকদের নাম প্রকাশ করতে থাকেন। আমরা প্রতিটি খণ্ডে প্রকাশিত গ্রাহকদের নামগুলো পরীক্ষা করে তাতে উল্লেখিত মুসলমান ও অমুসলমানদের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করেছি। ৩১ জন লোক উক্ত তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত নামের তালিকায় স্থান লাভ করেন ; এঁদের মধ্যে মুসলমান ছিলেন মাত্র পাঁচজন[৪৩]। চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত ৪৩ জন গ্রাহকের নামের তালিকায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১১। পঞ্চম খণ্ডে গ্রাহকদের কোনো তালিকা নেই ; কিন্তু ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৬৯ জন গ্রাহকের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এঁদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা হলো ১৮ ! কিন্তু মুসলমান গ্রাহকদের সংখ্যা শীঘ্রই কমে যায়। তাই ৭ম খণ্ডে ৩১ জনের মধ্যে ৯

জন, একাদশ খণ্ডে ৭৩ জনের মধ্যে ১১ জন, দ্বাদশ খণ্ডে ২১ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জন মুসলমানকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়।

এবার দ্বিতীয় ভাগের কথা ধরা যাক। এর প্রথম খণ্ডে ৭৩ জন গ্রাহকের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ৭, তৃতীয় খণ্ডে ১৬ জনের মধ্যে ৩, পঞ্চম খণ্ডে ২০ জনের মধ্যে ছিলেন মাত্র ১০ জন মুসলমান।

উক্ত হিসেব সত্য হলে দেখা যায়, সর্বমোট ৫৫৫ জনের মধ্যে মাত্র ১০৫ জন, অর্থাৎ শতকরা বিশজন মাত্র মুসলমান এ অনুবাদের গ্রাহক হয়েছিলেন, ফলে গিরিশচন্দ্র "প্রকারান্তরে মুসলমানের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ব্রাহ্মধর্মের ব্যাপক প্রচারে সচেষ্ট হয়েছিলেন"[৪৪]—এ উক্তিটি সত্য নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, গিরিশচন্দ্রের এ অনুবাদটি মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ তো করেই নি বরং একটি বিশ্বস্ত গ্রন্থ হিসেবেও স্বীকৃতি পায় নি।

এদিকে উনবিংশ শতাব্দীও শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কুরআনের একটি আনুপূর্বিক বিশ্বস্ত ও বোধগম্য বঙ্গানুবাদের অভাব রয়েই গেল। ফলে, মসজিদের এবং ওয়াজ মহফিলের মৌখিক বাংলা তরজমা, কবিয়ালদের রাত জাগা বর্ণনা আর জৌনপুরী মওলানাদের উর্দু বক্তৃতাই হয়ে থাকল বাঙালি মুসলমানদের কুরআনি জ্ঞান আহরণের উপায়। বাঙালি মুসলমানগণ উর্দু ভাষাও কিছুটা জানতেন বলা চলে। তা না হলে গিরিশচন্দ্র সেনের মতো বাঙালি, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিরাজগঞ্জে উর্দুতে বক্তৃতা দিতেন না।

গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ যত দুর্বোধ্য ও অনির্ভরযোগ্যই হোক না কেন, বাংলা সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি তাঁর একটি অনবদ্য অবদান। তদুপরি, এটি দ্বিধাগ্রস্ত মুসলমান আলেমদের মধ্যে এক প্রকার আত্মবিশ্বাসের অনুপ্রেরণা যোগায়। তাঁরা বুঝতে পারেন যে, গিরিশচন্দ্রের মতো একজন অমুসলমান যদি সমগ্র কুরআন তরজমা করতে পারেন, তবে তাঁরা কেন এ কাজে অনগ্রসর থাকবেন বা সাফল্য লাভ করতে পারবেন না। ফলে, গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ প্রকাশের দু'বছরের মধ্যেই কুরআন অনুবাদে আমরা মুসলমান আলেম নইমূদ্দীনকে এগিয়ে আসতে দেখি। তাঁর অনুবাদের প্রথম অংশটি ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয়[৪৫]। অনুবাদ সমাপ্তির পূর্বেই ১৯০৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু এতে মুসলিম উদ্যোগ ব্যাহত হলো না। মওলানা আব্বাছ আলি[৪৬] (১৯০৫), খানবাহাদুর তসলিমুদ্দিন আহমদ[৪৭] (১৯০৭) ও খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম (১৯১৪) প্রমুখ আলেম কুরআন তরজমার উদ্যোগ নিয়ে নইমূদ্দীনের প্রবর্তিত ধারাটিকে অব্যাহত রাখেন। আর অব্যাহত এ উদ্যোগে ক্রমে ক্রমে গতি সঞ্চারিত হতে থাকে। ফলে আজ বাংলা ভাষায় আমরা অন্যূন ত্রিশটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাঠ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে গিরিশচন্দ্র সেন[৪৮] কুরআনের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। অনুরূপভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় অমুসলমানেরাই প্রথম

কুরআন অনুবাদ করেছেন। অন্যান্য অমুসলমানের অনুবাদের মতো গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ ইসলামি ধ্যান-ধারণা এ ভাষাগত দিক থেকে যতোই অগ্রহণযোগ্য হোক না কেন, তিনি ছিলেন এ-বিষয়ে পথিকৃত এবং প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মুসলমানদের পথপ্রদর্শক। তাই, আজ শতবর্ষ পরেও আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. মুজীবুর রহমান তাঁর গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠার আলোচনায় এটির প্রকাশনার তারিখ নির্ধারণ করেছেন ১৮৮৬ সালে। ইহা ঠিক নয়। অনুবাদটির ৩য় ভাগের একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড ১৮৮৫ সালের ৩০শে জুলাই রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্সে দাখিল করা হয়। এটিই ছিল সর্বশেষ মুদ্রণ। **Bengal Library Catalogue**, 1885, 3rd Supplement No. 4704-5, pp. 44-45.
আরো দেখুন : আহমদ, **বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী**, পৃ. ৩৮৩। বর্তমান গ্রন্থকার প্রথম খণ্ড থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি খণ্ড খুঁটিনাটি ভাবে পরীক্ষা করেছেন। শেষ খণ্ডটি ১৯৮৫ সালেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ সেটটি লন্ডনস্থ ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে (প্রাক্তন ব্রিটিশ মিউজিয়াম) সংরক্ষিত আছে।

২. আহমদ (১৯৮৫), **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৩৮৪

৩. ঐ। পৃ. ৩৮৬

৪. ঐ। পৃ. ৩৮৬

৫. ৭ম খণ্ডের অনুবাদকের বিজ্ঞপ্তি।

৬. তৃতীয় ভাগের শেষ খণ্ডের অর্থাৎ গ্রন্থ সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তি।

৭. অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলদয়মন্তী নাটক। (কলিকাতা : সম্বৎ ১৯১৬/১৮৫৯ খ্রি:) "ভূমিকা", পৃ. ৩

৮. গিরিশচন্দ্র সেন, **হাদিস**, পূর্ববিভাগ (কলিকাতা : ১৯০৬), পৃ. ৭৭৯

৯. এ তথ্যটি পাওয়া যাচ্ছে অনুবাদের ৪র্থ সংস্করণের (১৯৩৬) গ্রন্থস্বত্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত প্রকাশকের বিবৃতি থেকে। কিন্তু এখানেই ১৮৮১-১৮৮৬ পর্যন্ত সময়ব্যাপী মুদ্রণের যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তাতে পাঠকদের বিভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সম্ভবত অনুবাদক ১৮৮৫ সালের জুলাই মাসে অনুবাদের শেষ খণ্ড মুদ্রণের পরে ভুল অংশগুলো পুনর্মুদ্রণ করেন। সবগুলো পুনর্মুদ্রিত পৃষ্ঠা সংযোজন ও বাঁধাই করে গ্রন্থটি তিন বালামে বিক্রির জন্য যখন তৈরি, তখন ১৮৮৬ সাল শুরু হয়ে গেছে। যদিও গ্রন্থবিদ্যার দৃষ্টিতে তিন খণ্ডে বাঁধাইকৃত পুস্তকটি একটি নতুন সংস্করণ, তবুও এটি খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রিত অংশগুলোরই বাঁধাইকৃত একটি রূপ, এজন্য এটি আর রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্স অফিসে দাখিল করতে হয় নি'।

১০. গিরিশচন্দ্র সেন, **কোরআন শরীফ**, (কলিকাতা : ১৯৩৬), গ্রন্থস্বত্ব পৃষ্ঠা।

১১. গিরিশচন্দ্র সেন, **কোরআন শরীফ**, (কলিকাতা : ১৯৩৬) গ্রন্থস্বত্ব পৃষ্ঠা।

১২. এ সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৫, ৭২০।

১৩. গিরিশচন্দ্র সেন, **মূল কোরআন শরীফ হইতে অনুবাদিত কোরআন শরীফ** (ঢাকা : ঝিনুক পুস্তিকা, ১৯৭৭), পৃ. ৭৯২।

১৪. গিরিশচন্দ্র সেন [অনূদিত] **কোরআন শরীফ**। কলকাতা : হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৯। পৃ. ৬৮১+৬

১৫. কাজী মোতাহার হোসেন, "ভাই গিরিশচন্দ্র সেন" **কয়েকটি জীবন**, (ঢাকা : বি.এন.আর. ১৯৭১), পৃ. ৭৬-৯৮ ; মুহম্মদ মনসুর উদদীন "ভাই গিরিশচন্দ্র সেন" **মাহে-নও** (জানুয়ারি ১৯৬৯), পৃ. ৩৪-৩৭ ; সতীশকুমার চট্টোপাধ্যায় "মৌলবী ভাই গিরিশচন্দ্র সেন" (১৮৩৫—১৯১০), **কোরআন শরীফ** (কলিকাতা, : হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৯), পৃ. ১৪-২৪ ; যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, **কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য** (কলিকাতা : ১৩৪৩ বাং), পৃ. ৩২৮ ও অন্যান্য।

১৬. **আত্ম-জীবন, অর্থাৎ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কর্তৃক বিবৃত আত্ম-জীবন বৃত্তান্ত**। (কলিকাতা : ১৩১৩ বাং), পৃ. ১৪৬।

১৭. পত্রগুলো গিরিশচন্দ্র সেনের (কলিকাতা : ১৯৭৯) পুনর্মুদ্রিত **কোরান শরীফ**—এর শেষেও মুদ্রিত হয়েছে।

১৮. গিরিশচন্দ্র সেন [অনূদিত], **কোরআন শরীফ**। ৪র্থ সংস্করণ (কলিকাতা : ১৯৩৬) মুখবন্ধে মওলানা আকরম খাঁ-র "শ্রদ্ধা নিবেদন"।

১৯. বিস্তারিত আলোচনার জন্য A.M.A.H. Haqqani, **An introduction to the commentary on the Qooran**, Calcutta : 1910), pp. 548-592 দেখুন।

২০. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, **কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য** (কলিকাতা : ১৩৪৩ বাং), পৃ. ৩২৮ ও অন্যান্য ব্যক্তি হলেন : প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (খ্রিস্টান ধর্ম), গৌরগোবিন্দ রায় (হিন্দু ধর্ম) এবং অঘোর নাথ গুপ্ত (বৌদ্ধ ধর্ম)।

২১. **প্রবচনাবলী**—। কোরআন শরীফ থেকে ধর্মীয় উপদেশ অনূদিত। (কলিকাতা, ১৮৮০), ১৬ পৃ.। তথ্য : আলী আহমদ, **বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী**, পৃ. ৩৮১। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনীতে উদ্ধৃত উইলে এটাকে "কোরানের বচনাবলী" নামে আখ্যায়িত করেছেন। (পৃ. ৬৪)।

২২. Khan, "Translation of the Qu'ran in the African languages", **Op. cit.**

২৩. Khan, "English translations of the Qu'ran", **Op. cit.**

২৪. মুহম্মদ শফি, **তফসিরে মা'রেফুল-কোরআন** (ঢাকা : ১৯৮০) ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫।

২৫. এটি ৩৬ খণ্ডে শেষ হয়। কিন্তু শেষ ১০টি খণ্ড প্রকাশকালে প্রতি দুই খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়। ফলে প্রকৃতপক্ষে খণ্ড সংখ্যা হলো ২৯।

২৬. Baptist Missionary Society, London. In 21 : Cary's Manuscript letters".

২৭. **কূরআন** ২ : ৬৫ হরফ প্রকাশনীর ১৯৭৯, মুদ্রণের ৯ম পৃষ্ঠা দেখুন।

২৮. **কূরআন** ৪ : ৬ যশোরের কাজীপুর থেকে লেখা আফতাবুদ্দীনের এ পত্রটি দ্বিতীয় খণ্ডের ৪র্থ সংখ্যার সঙ্গে মুদ্রিত হয়।

২৯. পত্রটি ইংরেজিতে লেখা এবং এর ভাষ্য হলো, "the book may be very useful, particularly to the Mohamadans, if the style could be rendered a little easier so as to be understood by the less erudito".

৩০. ফ.র.ম. [ফজলুর রহমান মিঞা], "বঙ্গানুবাদিত কোরাণ শরিফ সমালোচনা', **আখবারে এসলামীয়া**, ৫ : ১০ (মাঘ ১২৯৫), পৃ. ১৪৪-১৪৫।

৩১. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, **কোর-আন শরিফ ; সঠিক বঙ্গানুবাদ, পারা আ'ম ত্রিংশ অধ্যায়**, ৩য় সং। (টাকা, ২৪ পরগণা : ১৩৩২) পৃ. [/.]

৩২. উক্ত, পৃ. ৩৭৫।

৩৩. **সাপ্তাহিক আহলে হাদিস** ২য় বর্ষ, ৪১ সংখ্যা (১৭ আশ্বিন ১৩৩৬ বাং, ৩ অক্টোবর ১৯২৯), পৃ. ৭, স্তম্ভ-২ ও ৩ ; পৃ. ৮ স্তম্ভ-১ ; ২ : ৪৩ (২৪ অক্টোবর ১৯২৯), পৃ. ১১, স্তম্ভ—১-৩ ; ২ : ৪৪ (৩১ অক্টোবর ১৯২৯) পৃ. ৮, স্তম্ভ-২ ও ৩ ; পৃ. ৯, স্তম্ভ-১।

৩৪. আলী আহমদ, **বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী**, পৃ. ৩৮৬-৩৯৩।

৩৫. করমজী, **আহলে হাদিস**, (৩১ অক্টোবর ১৯২৯), পৃ. ৮।

৩৬. করমজী, **আহলে হাদিস**, (৩১ অক্টোবর ১৯২৯), পৃ. ৮।

৩৭. শ্রীনাথ চন্দ, ব্রাহ্ম সমাজে চল্লিশ বৎসর, (কলিকাতা, ১৯১১), পৃ. ৫৫ ও ১৩১।

৩৮. গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১।

৩৯. আত্মজীবনী, পৃ. ৬।

৪০. **কোরআন শরীফ**, (কলিকাতা ১৯৭৯), প্রারম্ভিক, পৃ. ১৭-১৮।

৪১. মওলানা মুহম্মদ তাহের, **আল কুরআন** (কলিকাতা ১৯৭০), পৃ. ১০। তিনি তাঁর ভূমিকায় এ জাতীয় অনুবাদকে "অনধিকার চর্চা এবং অমার্জনীয় সাহস" বলে অভিহিত করেছেন।

৪২. মুজীবুর রহমান, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৫৫।

৪৩. এই পাঁচজন ছিলেন— মৌলবী সৈয়দ আবদোর রহমান (গোপালপুর), মুন্সী আবুয়ল মজফফর (গোপালপুর), মৌলবী আবদুল গফুর (ঢাকা), মৌলবী আবদুল আজিজ (কলিকাতা) এবং শেখ আবু হোসেন (কলিকাতা)।

৪৪. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

৪৫. মৌলবী নইমুদ্দীনের অনূদিত কুরআন অনুবাদটির প্রথম খণ্ড ১৮৮৭ ; ২য় খণ্ড ১৮৮৮ এবং ৩য় খণ্ড ১৮৯০ সনে করটিয়া থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই তিন খণ্ডে সূরা বাকারার ৫৪ আয়াত পর্যন্ত অনূদিত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে অনুবাদকের কাছে তাঁর ভাষার দুর্বলতা ধরা পরে। তিনি এই অনুবাদগুলো সংশোধন করে পুনরায় ১৮৯১ সনে প্রথম থেকে সূরা বাকারার ২০২ আয়াত পর্যন্ত "প্রথম খণ্ড" হিসেবে প্রকাশ করেন। অনুবাদটি সমাপ্তির পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

৪৬. আব্বাছ আলি সম্ভবত আকরম খাঁ-এর সঙ্গে যুক্তভাবে ১৯০৫ সালে অনুবাদের কাজ শুরু করেন। তাঁর অনুবাদ ১৯০৯ সালে শেষ হয়।

৪৭. তসলিমুদ্দীন তাঁর অনুবাদ খণ্ডে ১৯০৭ সাল থেকে প্রকাশ শুরু করেন। তাঁর তৃতীয় ও শেষ খণ্ডের অনুবাদ ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৪৮. তাঁর সম্পূর্ণ অনুবাদ ১৯৩১ সালে শেষ হয়।

৪৯. মুহম্মদ সালিহ কাসমী, সৈয়দ আবদুর রউফ ও সৈয়দ মাহবুব রিজভী তাঁদের উর্দু পুস্তক **জায়েজা তারাজিম কুরআনী** (দেওবন্দ : ১৯৬৮), ১৪৫ ও ১৪৬ পৃষ্ঠায় বাংলা অনুবাদ সম্বন্ধে বলেন 'যে ১৮৮২ সালে উলামাদের এক বোর্ড বাংলা অনুবাদ করেন। হতে পারে গিরিশচন্দ্র সে তর্জমাটি সম্পাদনা করেন"। এ তথ্যটি সবই মিথ্যা।

বৃটিশ যুগের বঙ্গানুবাদ

নইমূদ্দীন

ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী গিরিশচন্দ্র সেন যখন পবিত্র কুরআন তরজমা ও প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন মুসলিম "জাতীয় জীবনে তখন এক সূচীভেদ্য ঘোর অমানিশা রাজত্ব"[১] করছিল। সে "অন্ধকার যুগেও বাঙালার সাহিত্য গগনে সমাজের ... ধ্রুবতারা" স্বরূপ "অন্ধকারে আলোকচ্ছটা বিকীরণ" করতে এগিয়ে আসেন মৌলভী নইমূদ্দীন[২]। তাঁর সর্বপ্রথম সাহিত্য কীর্তি ছিল 'জোব্দাতল মসায়েল'[৩]। আল্লাহ্-তা'য়ালার 'মুখজাত' কুরআনে যে "আহার, বিহার, আরাধনা, ভজনা, অনুমতি, নিষেধ, সমুদয় নিয়ম ... লিখিত আছে"—তারই সারমর্ম নিয়ে তিনি রচনা করেন এই গ্রন্থ[৪]।

কুরআনের আহকামগুলো দেশজ ভাষায় লিখে প্রচার করার পক্ষে যুক্তি ও জনমত অতি প্রাচীনকাল থেকেই বঙ্গদেশে ছিল। এ-বিষয়ে আরবি ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থই পাওয়া যেত সেকালে। ফারসিতেও এ-সবের কোনো অভাব ছিল না। বাংলা ভাষায়ও ইতিমধ্যে দু'-একটি পুস্তক রচিত হয়েছে। কিন্তু "ভাষার অসুশ্রাব্য দোষে ও রচনার অসংমিলন গতিকে" এদেশের 'গুণিগণ' এ জাতীয় গ্রন্থ "কখনই পাঠ করিতে রত হন না এবং সন্তানগণকে পাঠ করিতে দেখিতেও ভালবাসেন না। বরং অনেকে নিষেধ করিয়া থাকেন"[৫]। এজন্য করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান "মুসলমানী ধর্মে একখানি অতি সরল বঙ্গ ভাষাতে" গ্রন্থ রচনা বা অনুবাদ করার জন্য মৌলভী নইমূদ্দীন-কে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় মৌলভী সাহেব কুরআনি তথা ইসলামি সাহিত্যে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। এ-বিষয়ে তাঁর সর্বপ্রথম গ্রন্থ, 'জোব্দাতল মসায়েল' ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি মুসলিম জনগণের খুবই সমাদর লাভ করে এবং অচিরেই প্রথম সংস্করণের 'সহস্র গ্রন্থ নিঃশেষিত' হয়ে যায়। ফলে, ১৮৮১ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে এর একটি তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশ লাভ করে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ যথাক্রমে ১৮৯১ ও ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয়।

'জোব্দাতল মসায়েল' ছাড়াও তিনি 'ফতুয়া আলমগিরি' ১ম খণ্ড (১৮৮৪), ২য় খণ্ড (১৮৮৭), ৩য় খণ্ড (১৮৮৯), ৪র্থ খণ্ড (১৮৯২), 'ইনসাফ' (১৮৮৬), 'ধোকা ভঞ্জন' (১৮৮৯), 'গো-কাণ্ড' (১৮৮৯), কলমাতুল কুফর (১৮৯০), আখের জ্বোহর (১৮৯২), 'সেরাতুল মস্তাকিম' (১৮৯৩), 'তারাবিহ' (১৮৯৪), 'বেতের' (১৮৯৪), 'আদেল্লায়ে

হানাফিয়া' (১৮৯৪), 'মৌলুদ শরীফ' (১৮৯৫), 'রফা-ইয়াদাহ্ন' (১৮৯৬), ছহি বুখারী (১৮৯৮), 'ধর্মের লাঠি' (১৯০৩) প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

"একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, তার্কিক, ওয়ায়েজ ও আবেদ"[৬] নইমূদ্দীন ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র রোকনউদদীন আহমদ[৭] কর্তৃক পরিবেশিত খানদানী কুরছীনামা থেকে পরিবেশিত তথ্যানুযায়ী মৌলভী নইমূদ্দীনের পূর্ব পুরুষ শাহ্ সৈয়দ মুহম্মদ খালেদ বাগদাদ থেকে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমন্ত্রণে দিল্লী আগমন করেন। সৈয়দ সাহেবের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ সৈয়দ মুহম্মদ তাহের শিক্ষকতার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসেন। এ দেশে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় তিনি মানিকগঞ্জের গালা গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। পরে, তাঁর অধস্তন পুরুষেরা সৈয়দ উপাধি ত্যাগ করেন এবং টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার দারাকুমুল্লী, মীর্জাপুর উপজেলার বানিয়াপাড়া এবং টাঙ্গাইল থানার শুরুজ (সুরঞ্জ) গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। মৌলভী নইমূদ্দীন এই শুরুজ গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করেন।

বাল্যে পিতার কাছে গৃহশিক্ষা লাভের পর ১২৪৫ (বাং) সালে তিনি গ্রামেরই মধ্য বাংলা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশের পর ১২৫৩ (বাং) সালে তিনি ঢাকা যান ইসলামি-শিক্ষায় পড়াশুনার জন্য। দীর্ঘ আট বছর তিনি এক বিশিষ্ট আলেমের তত্ত্বাবধানে আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং হাদিস, তফসির, ফিকহ্, মন্তেক প্রভৃতি শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। অত:পর তিনি মুর্শিদাবাদ, বিহার, এলাহাবাদ, জৌনপুর, গাজীপুর, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন এবং সেসব স্থানের বিখ্যাত আলেমগণের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করেন। তাঁর শেষ ওস্তাদ তাঁকে 'আলেম-উদ্-দহর' উপাধি দেন। মৌলভী সাহেব কিছু দিন পাবনা জেলার ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ও কাজীর পদে কাজ করার পর ১২৯৭ সালে ৪১ বৎসর বয়সে নিজগ্রাম শুরুজে ফিরে আসেন।

সে সময় টাঙ্গাইলে হানাফি ও আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্‌টি যে শরিয়ত সম্মত, সে নিয়ে তুমুল ""বাহাস্" চলছিল। করটিয়ার জমিদার সাদাত আলী খান পন্নী ছিলেন হানাফি মজহাবের লোক। তাঁরই উৎসাহে নইমূদ্দীন হানাফি মজহাবের সমর্থনে কয়েকটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। সাদাত আলী ইন্তেকাল করলে (বাং ১২৮৭ সালের ১৩ই পৌষ) তদীয় পুত্র মাহমুদ আলী খান পন্নীও তাঁর মতোই মৌলবী নইমূদ্দীনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে মৌলবী নইমূদ্দীন বেশ কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে ফেলেছেন। তাঁর রচিত "পুস্তকাবলী মুদ্রণ ও আখবারে এসলামীয়া' নামক একটি মাসিক পত্র প্রকাশের জন্য খান পন্নী 'মাহমুদীয়া যন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন[৮]। নইমূদ্দীন ছিলেন এ ছাপাখানার তত্ত্বাবধায়ক আর মীর আতাহার আলী ছিলেন মুদ্রাকর।

জমিদার মাহমুদ আলী খানের আনুকূল্যে ও তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রেস মৌলবী নইমূদ্দীনকে ইসলাম ও কুরাআন বিষয়ক ত্রিশখানি পুস্তক প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করে।

এগুলোর মধ্যে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কুরআনুল করিমের বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁর এ অনুবাদ খণ্ডে খণ্ডে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর বঙ্গানুবাদিত কোরান শরিফ–এ প্রত্যেকটি আয়াতের অংশগুলো আলাদা আলাদাভাবে মূল আরবিতে মুদ্রিত করে তার নিচে সে-অংশের বাংলা অনুবাদ এবং তারপরে অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে তার ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত তফসির দেয়া হয়েছে।

সর্বপ্রথম প্রকাশিত নইমূদ্দীন অনূদিত কুরআন শরিফের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

> আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্য (মাবুদ) নয়, মহাম্মদ তাহার/ প্রেরিত। (রসুল)/ বঙ্গানুবাদিত।/ কোরান শরিফ/প্রথম খণ্ড।/ জনাব মৌলবী গোলাম সরওয়ার সাহেবের/ সাহায্যে নইমূদ্দীন কর্ত্তৃক/ অনুবাদিত।/ প্রথম সংস্করণ।/ ইং ১৮৮৭ সাল, হিজরী ১৩০৫ সন, বাঙ্গালা ১২৯৪ সন।/ করটীয়া।/ মাহমুদীয়া যন্ত্রে/ মীর আতাহার আলী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ মূল্য।/ ।/০ পাঁচ আনা।

অনুবাদটির প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৮৮৮ খ্রি: এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্রের সংলেখের মধ্যে শুধু "দ্বিতীয় খণ্ড" ও "ইং ১৮৮৮ সন, হিজরী ১৩০৬ সন, বাঙ্গালা ১২৯৫ সন" ছাড়া কোনো ভিন্নতা নেই। দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ৪৯ থেকে ৯৬ ; এর মূল্য ছিল ছয় আনা।

অনুবাদটির তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ইং ১৮৯০, হিজরি ১৩০৮ এবং বাংলা ১২৯৭ সালে। এটির জন্য কোনো আখ্যাপত্রও মুদ্রিত হয় নি। প্রচ্ছদের আখ্যাই গ্রন্থ বিবরণীর একমাত্র উৎস। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ৯৭ থেকে ১১২। এর মূল্য ছিল তিন আনা। একই আকারে : ৯.৫″ × ৬.৫″ (২৪ সে. × ১৬ সে.) তিন খণ্ডে মুদ্রিত নইমূদ্দীনের এ বঙ্গানুবাদটিতে সুরা ফাতেহা ও সুরা বাকারার ৫৪ আয়াত পর্যন্ত অনূদিত হয়। কিন্তু, অচিরেই তাঁর অনুবাদের ভাষার দৈন্য ও দুর্বলতা ধরা পড়ে। সেজন্য ইতিমধ্যেই প্রচারিত তিন খণ্ডে অনূদিত কুরআনের অংশগুলো প্রচার বন্ধ করে দেন ; এবং প্রচারিত কপিগুলো গ্রাহকদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন। তিনি তাঁর অনুবাদের ভাষার পরিমার্জন ও সংশোধনে প্রবৃত্ত হন। প্রথম থেকে অর্থাৎ সুরা ফাতেহা থেকে সুরা বাকারার ৫৪ আয়াত পর্যন্ত ইতিমধ্যে অনূদিত ও প্রকাশিত অংশ সংশোধন ও পরিমার্জন করে অনুবাদক ১৮৯১ইং সালে তাঁর 'বঙ্গানুবাদিত কোরান শরিফ' খানির প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ পুনরায় প্রকাশ করেন।

নইমূদ্দীনের পুনর্মুদ্রিত ও পুন:প্রকাশিত বঙ্গানুবাদের প্রথম খণ্ডটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

> قرآن شريف / ব্যাখ্যা ও টীকা (তফসির) সহ/ বঙ্গানুবাদিত/ কোরাণ শরিফ।/ প্রথম খণ্ড।/ জনাব হাফেজ মাহমুদালী খাঁ জমিদার সাহেবের অনুমত্যানুসারে/

জনাব মৌলবী গোলাম সরওয়ার সাহেবের/ সাহায্যে।/ খাদেমোল এসলাম/ নইমূদ্দীন কর্তৃক/ অনুবাদিত।/ প্রথম সংস্করণ।/ সন ১৮৯১ ইং হিজরী ১৩০৯ সন।/ করটীয়া।/ মাহমুদীয়া যন্ত্রে/ মীর আতাহার আলী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।/ মূল্য ২ টাকা আট আনা।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এমন কি বিরাট ভুলের দরুন প্রথম সংস্করণের সদ্য মুদ্রিত অংশগুলো শুধু প্রচার বন্ধ নয়, প্রচারিত কপিগুলোও ফিরিয়ে নেয়া হলো? এ ধরনের তুলনামূলক পাঠ–বিচার সময়সাপেক্ষ। তথাপি, উভয় সংস্করণের মধ্যে একটি দ্রুত দৃষ্টিপাত এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেবে। প্রকৃতপক্ষে ভুল–ভ্রান্তি অমন কোনো মারাত্মক কিছুই ছিল না। একমাত্র ভাষার দৈন্যই ছিল এর কারণ। উদাহরণস্বরূপ ১ম সংস্করণের প্রথম পৃষ্ঠায় "বেসমেল্লা সম্বন্ধে কতকগুলিন ..." ছিল একটি বাক্যাংশ। পরিবর্তিত সংস্করণে "কতকগুলি" শব্দের পরিবর্তে "কতিপয়" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে "... ফাতেহা সুরার সমস্ত মর্ম বেসমেল্লা মধ্যে বিন্যস্ত রহিয়াছে" বাক্যের "বিন্যস্ত" শব্দের পরিবর্তে দ্বিতীয় সংস্করণে "নিহিত" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "কথিত আছে নুহ পয়গম্বরের ... সময় যখন সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন হইয়াছিল এবং প্রচণ্ড ঝড় দেখা গিয়েছিল ... "বাক্যাংশটি মুদ্রিত দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু সংশোধিত সংস্করণে এটির পরিবর্তে "লিখিত আছে নুহ পয়গাম্বরের সময়ে যখন সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন হইয়া মহাপ্রলয় ঘটিয়া ..." বাক্যাংশটি মুদ্রিত হয়।

যাহোক, অনুবাদটির সংশোধিত সংস্করণে সুরা ফাতেহা ও সুরা বাকারার শুরু থেকে ২০২ আয়াত পর্যন্ত স্থান লাভ করে। ছয়টি প্রারম্ভিক পৃষ্ঠা ছাড়াও এটির পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ৪০০। রয়েল আকারের (৮.৫″ × ৫.৫″ বা ২১ সে. × ১৪ সে.) এই খণ্ডটির মূল্য ছিল আড়াই টাকা।

অনুবাদের কাজ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। এবার সুরা বাকারার ২০৩ আয়াত থেকে সুরা নেছা–র ৭৬ আয়াত পর্যন্ত অনুবাদ দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান লাভ করে। এই খণ্ডটি ১৮৯২ ইং, ১৩০৯ হি:, ১২৯৯ বাং সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডেরই অনুরূপ আকারের ৪০০ পৃষ্ঠার এ খণ্ডটির মূল্য ছিল দু'টাকা আট আনা।

এভাবে "অনুবাদ বৃহৎ আকারে দুই খণ্ডে" অর্থাৎ সংশোধিত আকারে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর পৃষ্ঠপোষক হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী অনুবাদককে আপাতত বাকি অংশের ধারাবাহিক অনুবাদ স্থগিত রেখে কুরআনের ত্রিশ সংখ্যক পারা 'আমপারা'–র অনুবাদে হাত দিতে অনুরোধ করেন। কারণ, আমপারার সুরাগুলো ছোট–ছোট ; আর এগুলোই নামাজে পঠিত হয় সর্বাধিক। অনূদিত হলে, জনসাধারণ নিত্য–পঠিত এ সুরা গুলোর অর্থ জেনে নিতে পারবে। খান–পন্নীর এ উপদেশের কথা, অনুবাদক তাঁর সহযোগী মওলানা গোলাম সরওয়ার–এর গোচরে আনলে তিনিও এ মত সমর্থন করেন। অতএব, কুরআনের ধারাবাহিক অনুবাদ স্থগিত রেখে নইমূদ্দীন 'আমপারা' অনুবাদে মনোনিবেশ করলেন। টীকা–টিপ্পনী সমেত এ অনুবাদের কাজ বাংলা ১৩০০ সালের ১২ই

শ্রাবণ, শুক্রবার এশার নামাজের পরে শেষ হয়। সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদটির মুদ্রাঙ্কনের কাজও শেষ হয়। অনুবাদটি প্রকাশিত হলে জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী ও তৎপুত্র ওয়াজেদ আলী খান পন্নী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে অনুবাদককে যথাক্রমে "একখানি চশমা ও ৫০ টাকা" এবং "মূল্যবান একটি জেবঘড়ি" উপহার দেন[৯]। বাংলা ১৩১২ সালে আলোচ্য অনুবাদটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে কবি মোজাম্মেল হক ও পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন মাশহাদী যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষা পরিমার্জিত করে দেন। ফলে, অনুবাদক আশা প্রকাশ করেন যে, 'পূর্বের ন্যায়'–এর 'ভাষা দোষ তত নাই'[১০]। গ্রাহকদের সুবিধার্থে দু'খণ্ডে ছাপা আমপারাটির মূল্য ছিল এক টাকা।

সম্ভবত আমপারা অনুবাদের পরেই নইমূদ্দীন পুনরায় ধারাবাহিকভাবে কুরআন অনুবাদে মনোনিবেশ করেন। এক বছরের মধ্যেই সুরা নেছার ৭৭ আয়াত থেকে শুরু করে সুরা মায়দার ১২০ আয়াত পর্যন্ত অনূদিত হয়। এটি ছিল বঙ্গানুবাদের তৃতীয় খণ্ড। এ খণ্ডটিও যথারীতি করটিয়া থেকে ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। ২২৪ পৃষ্ঠার মুদ্রিত এ খণ্ডটির মূল্য ছিল সাড়ে বার আনা।

উপরের বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, নইমূদ্দীন তিন খণ্ডে সুরা মায়দা পর্যন্ত অনুবাদ করেন। এতে ৭ম পারার অংশবিশেষ মাত্র অনূদিত হয়।

কুরআনুল করিমে বর্ণিত, ইউসুফ জোলেখার কাহিনী সম্ভবত বাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগ থেকেই প্রচলিত আছে। কথা–সাহিত্যের অংশ হিসেবে গ্রাম্য কবিয়ালদের মুখে বাংলার জনগণ যুগে যুগে এ কাহিনী শুনে আসছেন। পরে শাহ মুহম্মদ সগীর এর একটি লিখিত কাব্যরূপ দিলে এটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কাব্যখানা ঘরে ঘরে পঠিত হতো। কিন্তু এসব সাহিত্যে অনেক অলীক কল্পনা স্থান লাভ করে। প্রকৃত ঘটনাটি কুরআনের ১২শ থেকে ১৩শ পারায় বিধৃত সুরা ইউসুফ–এ বর্ণিত আছে। এটি অনুবাদ করতে পারলে মুসলিম জনগণকে প্রকৃত তথ্য অবহিত করা যায়। কিন্তু, অনুবাদক তাঁর তৃতীয় খণ্ডে কুরআনের ৭ম পারা পর্যন্ত মুদ্রিত করেন। তাই, সম্ভবত বহুল প্রচলিত ইউসুফ জোলেখার প্রকৃত কাহিনী জনগণকে অবহিত করতে তিনি "ব্যাখ্যা, টীকা ও তফসিরসহ বঙ্গানুবাদিত কোরান শরীফ সপ্তম খণ্ড অর্থাৎ ইউসুফ সুরার তফসীর" প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। অনুবাদটি ইং ১৮৯৫ সালে, "মাহমুদীয়া যন্ত্রে মীর আতাহার আলী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়"। সুরা ইউসুফ অনুবাদের পর পরই মৌলবী নইমূদ্দীন "বঙ্গানুবাদিত পাঁচ সুরার সুবিস্তীর্ণ তফসির" প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন। অতিরিক্ত সওয়াবের আশায় কুরআনের পাঁচটি সুরা : ইয়া–সিন, আল–রহমান, তাবারাকাল্লাজি, মুজাম্মিল ও দহর দৈনিক তেলাওয়াত বাঙালি মুসলমানদের একটি রেওয়াজ। আল্লাহর কালাম পাঠ করলে যে "নাজাতের পথ প্রশস্ত হয়, উহাতে সন্দেহ নাই"। কিন্তু না বুঝে তেলাওয়াত করলে "সে আশা অতি কম"। এজন্য অনুবাদক 'অনেক বিদেশী বন্ধু–বান্ধবগণের অনুরোধে বহু পরিশ্রম, বহু ব্যয় স্বীকারে এই পাঁচটি সুরার অনুবাদ টীকা সহ" তৈরি করেন। পাঁচ সুরা তেলাওয়াত কালে " তফসির দেখে তেলাওয়াতে অসুবিধা দূর

করার জন্য এই সুবিস্তীর্ণ টীকার প্রথমেই কেবল আরবী পাণ [পাঁচ] সুরা সম্বলিত" করে দেয়া হয়। প্রত্যেক আয়াতের শেষে আয়াত সংখ্যাও দেয়া আছে। ফলে, যখন যে আয়াতের মানে জানার প্রয়োজন হবে, তফসির সে আয়াতের সংখ্যা দেখে বের করে নিয়ে আল্লাহ্ কি বলেছেন তা অনায়াসে বুঝে হৃদয়ে গেঁথে রাখতে পারবেন।

উপরে বর্ণিত "বঙ্গানুবাদিত পাণ সুরার সুবিস্তীর্ণ তফসির" সম্পর্কিত বিবরণটি অনুবাদক প্রণীত 'এনসাফ' তৃতীয় সংস্করণ (করটীয়া : ১৯০২) প্রচ্ছদের আভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন থেকে সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থটি আমরা দেখি নি।

পাঁচ সুরার বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনুবাদ প্রকাশে ছেদ পড়ে। এর কারণ অনুসন্ধান সাপেক্ষ। ইতিমধ্যে তদ্‌প্রণীত মৌলুদ শরীফ (১৮৯৫) 'রফা-ইয়াদাইন (১৮৯৬), এছবাতে আখেরজ্জোহর (১৮৯৭), বোখারী শরীফ, ১ম খণ্ড (১৮৯৮), বোখারী শরীফ, ২য় খণ্ড (১৮৯৮), ধর্ম্মের লাঠি (১৯০৩) এবং আদেল্লায়ে হানিফিয়া (১৯০৪) প্রকাশিত হয়। সম্ভবত তাঁর পৃষ্ঠপোষক হাফেজ মাহমুদ আলীর এন্তেকালের দরুন তিনি করটীয়া ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। সৌভাগ্যবশত তিনি অচিরেই তাঁর অনুবাদ কাজে জলপাইগুড়ির জমিদার খানবাহাদুর মৌলবী রহীম বখশ-এর সহানুভূতি ও পৃষ্ঠাপোষকতা লাভ করেন। ফলে, তিনি পুনরায় কুরআন অনুবাদ ও মুদ্রণে আত্মনিয়োগ করেন।

কলকাতা আগমনের পর তিনি ১৯০৮ সালে তাঁর অনুবাদের অষ্টম পারা প্রকাশ করেন। এ পারাটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

> বঙ্গানুবাদিত/ কোরাণ শরিফ/ অষ্টম পারা/ জলপাইগুড়ী—নিবাসী খান বাহাদুর সাহেবের/ দান-সাহায্যে/ মোহাম্মদ নইমূদ্দীন/ কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত/ কলিকাতা/ ২৫নং হক লেন, ইন্টালী, বণিক ইউনিয়ন প্রেসে/ সৈয়দ মোহাম্মদ আলী দ্বারা মুদ্রিত/

আখ্যাপত্রের পরের পৃষ্ঠায় অষ্টম পারার 'আভাষ'-এ মৌলবী নইমূদ্দীন সপ্তম পারা সমাপ্তি ও অষ্টম পারা মুদ্রণ চলার জন্য কৃতজ্ঞতা ও "সমুদয় প্রতিবন্ধক দূর করিয়া দিয়া ... সম্পূর্ণ অনুবাদ ও ছাপাইবার আয়োজনের তৌফিক" দানের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁর অনুবাদ মুদ্রণের পৃষ্ঠপোষকের জন্য দোয়া করার জন্য পাঠকদেরও অনুরোধ করেন। অষ্টম পারার অনুবাদটি বাং ১৩১৫ হিজরি ১৩২৬ ইং ১৯০৮ সালে ছাপা হয়।

একই বছর অর্থাৎ ১৯০৮ সালেই তাঁর বঙ্গানুবাদের নবম পারাটিও প্রকাশিত হয়। নবম পারার আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

> বঙ্গানুবাদিত/ কোরাণ শরিফ/ নবম পারা/ জলপাইগুড়ির সুপ্রসিদ্ধ জমিদার/ খানবাহাদুর মৌলবী রহিম বখ্‌স সাহেবের দান-সাহায্যে/ খাদেমল এসলাম— মোহাম্মদ নইমূদ্দীন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।/ ফখরুদ্দিন আহমদ এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত/ এসলামিয়া প্রেসে/ মুনশী মোহাম্মদ জান কর্ত্তৃক মুদ্রিত।/ ২৫ নং

> আন্তনি বাগান লেন/ কলিকাতা।/ ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ১৩২৬ হিজরী। মূল্য [আট] আনা।

নবম পারার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪২।

দশম পারার আখ্যাপত্রটিও নবম পারার অনুরূপ। কিন্তু প্রচ্ছদের আখ্যায় "হজরত মৌলবী মোহাম্মদ নইমূদ্দীন মরহুম মগফুর সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত। অনুবাদকের পুত্রগণ মৌলবী মোফাখ্খারুদ্দীন আহমদ এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ... ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ১৩২৬ হিজরী" কথাগুলো মুদ্রিত হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, দশম পারার মুদ্রণ শেষ হওয়ার পূর্বেই, ২৩ নভেম্বর ১৯০৮ সালে, নইমূদ্দীন এন্তেকাল করেন।

মৌলবী সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রগণ নইমূদ্দীনের অসমাপ্ত কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুবাদকের পুত্র মৌলবী কাছেমুদ্দীন আহমদ উক্ত দশম পারার প্রচ্ছদের শেষ আভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন :

> স্বর্গীয় পিতা হজরত মৌলবী নইমূদ্দিন মরহুম মগফুর সাহেব কর্ত্তৃক কোরাণ শরীফ ১০ম পারা পর্য্যন্ত অনুবাদিত হইয়া ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বর্গীয় পিতার আদেশানুযায়ী এবং তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক কোরাণ শরিফের অবশিষ্টাংশের অনুবাদকার্য্যে আমি ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ প্রবৃত্ত হইয়াছি।

উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী অনুবাদটি যথারীতি প্রকাশিত হতে থাকে। এর একাদশ পারা, আখ্যাপত্রের বিবৃতি অনুযায়ী "হজরত মৌলবী নইমূদ্দিন মরহুম মগফুর সাহেবের পুত্র কাছেমুদ্দীন আহমদ ও ফখরুদ্দীন আহমদ কর্ত্তৃক অনুবাদিত" হয় বলে জানানো হয়।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ ১১শ পারা হতে ২৩শ পারা পর্যন্ত প্রকাশ করেন। কাজটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। একাদশ পারাটি ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারি এবং ১২শ–১৪শ পারা এপ্রিল, ১৬শ থেকে ১৮শ পারা জুন এবং ১৯তম ও ২০তম পারা জুলাই মাসে মুদ্রিত হলে রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্স–এ জমা দেয়া হয়। অনুরূপভাবে, ২১শ থেকে ২৩শ পারাও ১৯০৯ সালেই প্রকাশিত হয়। তেইশ সংখ্যক পারাটি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে নেই। কিন্তু বাইশ সংখ্যক পারার বিজ্ঞপ্তিতে এটি "যন্ত্রস্থ" ছিল বলে জানা যায়। ডক্টর মুজীবুর রহমানের তথ্যানুযায়ী ২৩শ পারার খণ্ডটি "চাপাই নওয়াবগঞ্জ কুরআন ক্লাস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে"[১১]।

মোহাম্মদ নইমূদ্দীন কুরআন অনুবাদ শুরু করেন ১৮৮৭ সালে। তিনি মারা যান ১৯০৮ সালে। এতে দেখা যায় যে, তিনি জীবনের দীর্ঘ ২২ (বাইশ) বছর কুরআন তরজমায় অতিবাহিত করেন। তাঁর জীবৎকালে তিনি দশ পারা, আমপারা সুরা ইউসুফ ও পাঁচ–সুরা প্রকাশ করে যান। দশম পারা যখন যন্ত্রস্থ তখন তিনি এন্তেকাল করেন। এ হিসেবে দেখা যায়, প্রথম দশ পারা ত্রিশ পারা, ১২ ১৩, ২২, ২৩, ২৭ ও ২৯ পারার অংশ বিশেষ অনুবাদ ও প্রকাশ করার পর তাঁর মৃত্যু হয়। বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, তাঁর মৃত্যুর পর পরই অনুবাদ প্রকাশের গতি ত্বরান্বিত হয় এবং এক বছরেরও কম সময়ের

মধ্যেই ১১শ থেকে ২৩শ এই তের পারা প্রকাশিত হয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর পরই অনুবাদ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় চিরতরে।

নইমুদ্দীনের বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত লিখেছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে বলে মনে হয় না। এ সম্বন্ধে মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন বলেন :

> "তিনি এই অনুবাদ প্রথম হইতে তেইশ পারা পর্যন্ত সমাধা করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। এবং ইহার পূর্ব্বে তিনি আমপারা, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বঙ্গানুবাদ করেন"[১২]।

এ সম্বন্ধে ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলেন[১৩] :

> কোরআন শরীফের প্রথম হইতে পঞ্চদশ পারা পর্যন্ত তফসীরে তিনি নিজ নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। ষোড়শ পারা হইতে ত্রয়োবিংশ পারা পর্যন্ত তফসীরে (আট পারায়), তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র মওলবী কাসেমউদ্দিন ও মওলবী ফখরুদ্দিনের নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ করিবার কারণ হইয়াছিল যে, পুত্র কাসেমউদ্দিন ও ফখরুদ্দিনকে তিনি আর্বী, ফার্সী ইলেমে পণ্ডিতরূপে গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন। মওলানা মরহুম ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবদ্দশায় যদি কাসেমউদ্দিন ও ফখরুদ্দীন বাঙালী মুসলিম সমাজে সুপরিচিত হইতে পারে, তাহা হইলে আল কোরয়ানের অবশিষ্ট ছয় পারা তফসীর সমাপ্ত হইতে পারিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিধি-লিপি অন্যরূপ ছিল। তাই মওলানার ওফাতের পর তাহার অপর পুত্রগণের বাধা বিপত্তিতে কাসেম উদ্দিন ও ফখরুদ্দিন পিতার আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। মুসলিম বাঙলার মস্তবড় অভাবটি অপূর্ণ রহিয়া গেল।

ডক্টর সিদ্দিকী সম্ভবত অনেকটা তাঁর স্মৃতির উপর নির্ভর করেই উপর্যুক্ত তথ্য সরবরাহ করেন। তিনি সেজন্য উক্ত প্রবন্ধেই "মওলানা মরহুমের কেহ জীবিত কিনা" জানিতে চান। "যদি কেহ জীবিত থাকেন" তবে তাঁর নামে (দেবহাটা, পোঃ জেলা খুলনা) পত্র লিখতেও অনুরোধ করেন[১৪]। যা হোক তাঁর দু'টি তথ্য ভুল। একটি হলো মওলানার জীয়ৎ কালে এবং তাঁর নামে মাত্র দশ পারার অনুবাদ প্রকাশিত হয় (তেইশ পারা নয়)। একাদশ পারা থেকে ত্রয়োবিংশ পারায় (ষোড়শ পারা থেকে নয়) তাঁর পুত্রদের নাম ব্যবহৃত হয় এবং তা তাঁর মৃত্যুর পরেই হয়, আগে নয়।

ডক্টর সিদ্দিকীর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। এর তিন বছর পরে ১৯৫৮ সালে প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ-ও "মৌলভী নইমূদ্দীন" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর প্রবন্ধটি লেখা হয় মওলবী নইমূদ্দী-এর পুত্র ও অবসরপ্রাপ্ত পুলিস ইন্সপেক্টর মওলবী রোকনউদ্দিন-এর কাছ থেকে শুনে। রোকনউদ্দিন তাঁর পিতার সঠিক জন্ম তারিখও সরবরাহ করতে পারেন নি। তাঁরই বিবৃতি অনুযায়ী মওলানা নইমূদ্দীন "নিজ বাসস্থান শুরুজে এন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর শেষ কথা ছিল : "আফছোছ। কোরান শরীফের তরজমা শেষ করে যেতে পারলাম না"[১৫]।

ডক্টর সিদ্দিকী অনুবাদকের পুত্রদের মধ্যে বিরোধের ফলে কাসেমউদ্দীন ও ফখরউদ্দিন "পিতার আরদ্ধ কার্য্য সমাপ্ত" করতে পারেন নি-বলে বলেছেন। আর এদিকে নইমূদ্দীনের পুত্রের তথ্যানুযায়ী অনুবাদটি ছিল অসমাপ্ত।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় অনেক। অনুবাদটির কতটুকু অসমাপ্ত থেকে গেল নইমূদ্দীনের মৃত্যুকালে? অসমাপ্ত অনুবাদের কোনো কপিরাইট বা গ্রন্থ-স্বত্ব থাকতে পারে না। যে অংশটুকু মওলানা নইমূদ্দীন অনুবাদ করেন নি, সে অংশ কাসেমউদ্দীন এবং / অথবা ফখরউদ্দীন অনুবাদ করলে তাঁদের অন্যান্য অংশীদারের কোনো আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে কি নইমূদ্দীন মাত্র দশ পারা অনুবাদ করে মারা যান? নইমূদ্দীন যেখানে বাইশ বছরে দশ বা এগার পারা অনুবাদ করতে সক্ষম হলেন সেখানে তাঁর পুত্র বা পুত্রগণ কিভাবে এক বছরেরও কম সময়ে তের পারা (১১ থেকে ২৩) অনুবাদ করে ফেললেন? টীকা-টিপ্পনী সমেত এক একটি পারার অনুবাদ করা, প্রেস কপি তৈরি করা ও মুদ্রণ কাজ সমাধা করা অতো অল্প সময়ে কি করে সম্ভব? উদাহরণ স্বরূপ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্থদশ পারা প্রকাশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মওলানা মারা যায় ১৯০৮ সালের ২৩শে নভেম্বর। সে সময় দশম পারাটি ছিল প্রেসে। এটি প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর মাসে। এর-ই একটি কপি ১৯০৮ সালেরই ২৪শে ডিসেম্বর রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্স-এর কাছে পৌঁছে। এটিতে অনুবাদক হিসেবে মওলানার নাম ছাপা হয়। একাদশ পারাটিতে অনুবাদক হিসেবে আখ্যাপত্রে কাছেমুদ্দিন আহমদ ও ফখরুদ্দীন আহমদের নাম ছাপা হয়। এটি প্রকাশিত হয় ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯ খ্রি:। কিন্তু দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ—এ তিন পারা প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে। এতে দেখা যায় যে, মওলানার মৃত্যুর চার মাসের মধ্যেই তাঁর পুত্রগণ চার-চারটি পারার অনুবাদও প্রকাশ করে ফেলেছেন।

অনুবাদটি একই ব্যক্তির, না ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তির তা নির্ধারণের জন্য অন্য পন্থাও অবলম্বন করা যেতে পারে। এ জন্য প্রথম দশ পারা ও পরবর্তী তের পারার ভাষা তুলনামূলক বিচার করা যেতে পারে। ভাব, ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গি বিচার করলে রচনা কি একই ব্যক্তির না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির তা প্রকাশ হতে বাধ্য। এ-বিষয়ের যোগ্যতার দাবি আমরা করতে পারি না। তবুও স্বল্প জ্ঞানে এবং সময়ে উভয় অনুবাদ পাঠ করে আমাদের প্রতীতি জন্মেছে যে তেইশ পারা পর্যন্ত কোরআনের বঙ্গানুবাদটি একমাত্র মওলবী নইমূদ্দীনেরই কাজ। এ সম্বন্ধে মুজীবুর রহমানও একমত। তিনিও প্রথম দশ পারা ও পরবর্তী তের পারার "অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গভীর মনোনিবেশ সহকারে তুলনামূলক ভাবে পাঠ করে—"সাদৃশ্য" আবিষ্কার করেন। কিন্তু এ "সাদৃশ্যের" কারণ অনুসন্ধান না করে আবেগে আপ্লুত হয়ে অনুবাদটিকে "তাফসীর জালালাইন'—এর সঙ্গে তুলনা করেন[১৬]। এ প্রসঙ্গে তাফসির জালালাইন সম্বন্ধে[১৭] সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলে সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জালালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ মহল্লী (৭৯১-৮৬৪ হিজরি) সুরা কাহাফ থেকে সুরা

নাস পর্যন্ত তফসির প্রণয়নের পর এন্তেকাল করেন। অত:পর তাঁরই ছাত্র জালালুদ্দীন আবদুর রহমান বিন আবু বকর বিন মুহম্মদ সুয়ূতী (৮৪৯–৯১১ হি:) প্রথম থেকে সুরা বনি এসরাইল পর্যন্ত তফসির ৮৬৪ হিজরি থেকে ৮৭১ হিজরি সাল পর্যন্ত এই আট বছরে প্রণয়ন করেন। সুরা ফাতেহা থেকে সুরা বনি এসরাইল পর্যন্ত হয় পনের পারা। এই পনের পারার তফসির লিখতে সুয়ূতীর লাগে আট বছর। এতে দেখা যায় যে, তিনি প্রতি ছয় মাসে মাত্র এক পারার তফসির প্রণয়ন করতে সক্ষম হন। সুয়ূতীর ব্যাখ্যা, ভাষ্য— সবই ছিল আরবিতে। তদুপরি সুয়ূতি শুধু লিখেই ক্ষান্ত হন। তাঁকে মুদ্রণ কাজে কালক্ষেপণ করতে হয় নি।

কাছেমুদ্দিন আহমদ ও ফখরুদ্দিন আহমদ-এর কাজ ছিল সুয়ূতীর চেয়েও বেশি। সর্বপ্রথম আরবি ভাষায় মূল আয়াত সংস্থাপন। তার নিচে বাংলা তরজমা এবং তারপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও ভাষ্য প্রদান। এ কাজটি করতে গিয়ে মুজীবুর রহমানের মতে, তাঁদের "কখনো মোল্লা হুসাইন কাশেফী-এর ফারসী তাফসীর ইমাম বাগাভী-এর মাআ'লিমুততানযীল এবং অন্যান্য মূল আরবী ও ফারসী" গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তাঁদের কৃত শানে নজুল, ব্যাখ্যা, ভাষ্য, টীকা টিপ্পনীর বরাত দিতে হয়েছে"[১৮]। অতো সব পুস্তকাদি ঘেঁটে অনুবাদ ও তফসির রচনা করা, অনুবাদ প্রেসে দেয়া ও মুদ্রণ শেষ করা পর্যন্ত তদারক করে প্রতি মাসে এক পারা করে প্রকাশ করা যত মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিই হোন না, কেন, যে কোনো অনুবাদকের পক্ষে তা একান্তই অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে জালালাইনের সঙ্গে তুলনাকারক ড: মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের নিজের উদাহরণও টানা যায়। বর্তমানে তিনি "তাফসীর ইবনে কাসীর"—এর বঙ্গানুবাদে রত আছেন। অনুবাদের কাজে তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তদ্‌কর্তৃক ইবনে কাসির–এর বঙ্গানুবাদটির প্রথম খণ্ড আনুমানিক ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। এর ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। অনুবাদের কাজ যদি অতই সহজ হতো তবে তিনি নিজে পাঁচ পারা অনুবাদ করতে পাঁচ বছর সময় নষ্ট করতেন না।

দীর্ঘ বাইশ বছরের চেষ্টায় মওলবী নইমূদ্দীন মাত্র ১০ পারা অনুবাদ করতে সক্ষম হন। তাঁর পুত্র কাছেমুদ্দিন ও ফখরদ্দিনকে যদি তাঁদের পিতা অনুবাদ কাজে অতই পটু মনে করতেন তবে আগে থেকেই তাঁদের এ–কাজে নিয়োগ করে তাঁদের দিয়েই তরজমার কাজটি সারিয়ে নিয়ে নিজে শুধু সম্পাদনার কাজটি করে সমগ্র কুরআন অনুবাদের কাজ শেষ করে ফেলতে পারতেন। তা'ছাড়া পিতার মৃত্যুর পর তাঁরা তেইশ পারা পর্যন্ত অনুবাদ করেই ক্ষান্ত না হয়ে আরো ছয়টি মাস কষ্ট করে বাকি ছয় পারারও অন্তত অনুবাদের কাজটি সেরে ফেলতেন। তাতে আর্থিক সঙ্গতি না থাকলেও কোনো না কোনো সময় বাকি ছয় পারা প্রকাশ পেলে অন্তত নইমূদ্দীনের অন্তিম আকাঙ্ক্ষাটি পূরণ হতো। আর এ কাজে কোনো নৈতিক বা আইনগত বাধা থাকার কারণ থাকতে পারে না।

উপর্যুক্ত আলোচনার উপসংহার টেনে নিশ্চিত ভাবে বলা চলে যে, পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদটির ২৩ পারা, ২৯ পারার তিনটি সুরা ও ত্রিশ পারার অনুবাদ এককভাবে মওলবী নইমূদ্দীনই করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, মুদ্রণকালে তাঁর পুত্র কাছেমুদ্দিন

আহমদ ও ফখরুদ্দিন আহমদ হয়তো এখানে সেখানে ভাষার পরিমার্জন করলেও করতে পারেন ; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন নি। সম্ভবত এ-বিষয়টি তৎকালের পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সকলেরই জানা ছিল। সম্ভবত সমগ্র অনুবাদটিকেই মওলবী নইমূদ্দীন এর বলেই প্রচার করতেন। এরূপ একটি বিজ্ঞাপন ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়[১৯] :

> আল হেলাল এজেন্সীর বিজ্ঞাপন—মৌলবী নইমূদ্দীন মরহুম মগফুর সাহেবকৃত বাঙ্গালা অনুবাদ। তফশিরে কোরাণ শানে নজুল ও বিস্তারিত টীকা সহ মূল্য প্রতিপারা [দশ আনা] (৭ম হইতে ২২ পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড আকারে মৌজুত আছে)। ঐ ১৬ পারা একত্র মূল্য ৯ টাকা। এই কোরাণ শরিফ দুই খণ্ডে মজবুত বাঁধাই জেলদ মূল্য ১০ টাকা [চারি] আনা ... আমপারা (শেষ খণ্ড) ১ টাকা।

"বঙ্গবাসী ভ্রাতা—ভগ্নিগণকে কোরান শরীফের মর্ম অবগত করানোর মানসে"[২০]—ই নইমূদ্দীন তরজমায় হাত দেন। তাঁর পূর্বে রাজেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৭৯), পাদ্রি তারাচাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮২) এবং গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৮১-৮৫) বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন। এঁদের তরজমাগুলো "অনধিকার চর্চা এবং অমার্জনীয় দুঃসাহস" নামে অভিহিত[২১]। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের "ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ, দুর্বোধ্য মন্ত্রবৎ-অস্পষ্ট অনুবাদ"[২২]গুলো বাঙালি মুসলমানদের কোনো কাজে আসা তো দূরের কথা বরং যখন তাঁদের বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিল তখনই এগিয়ে আসেন মওলানা নইমূদ্দীন তাঁর তরজমা নিয়ে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তরজমা ও তফসিরগুলো পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি অনুবাদক ও ভাষ্যকার সর্বপ্রথম তাঁর পূর্বসূরিদের কৃতকাজগুলো পরীক্ষা করে এদের দোষ-ত্রুটি বের করে নিজের কাজটি ত্রুটিহীন বলে দাবি করেন। মওলবী নইমূদ্দীন কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী অমুসলানদের অনুবাদগুলো পরীক্ষা করে "স্বীয় সমসাময়িক অথবা পূর্বসূরীদের ... আপত্তিজনক বিকৃত ব্যাখ্যার খণ্ডন কিংবা প্রতিবাদ ও প্রত্যুত্তরের প্রচেষ্টা" না চালিয়ে সেগুলো উপেক্ষাই করেছেন। এটা যেমন দূষণীয় নয়, তেমনি নিজের অনুবাদের "স্তুতিবাদ"[২৩] ও অস্বাভাবিক উদাহরণ নয়।

নইমূদ্দীনের বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে কোনো বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। ডক্টর রহমানের তথ্যানুযায়ী ইদানিং নূর মোহাম্মদ আযমী (১৯০০-১৯৭২) নইমূদ্দীনের আরবি-জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন [২৪]। আযমীর মতে মূলের সহিত মিল না থাকায় নইমূদ্দীনের অনুবাদ প্রামাণ্য নয়। নইমূদ্দীন কুরআন অনুবাদ করেন আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে। তখনকার দিনে তো বটেই আজও মক্তব-মাদ্রাসায় আরবি শেখানো হয় ফারসি ও উর্দুর মাধ্যমে। কাজেই, আরবি ও বাংলা এ উভয় ভাষায় সমভাবে পারদর্শিতা সেকালের মতো একালেও বিরল। অথচ যে কোনো অনুবাদকের উভয় ভাষায় সমান দক্ষতা থাকা উচিত। এ অসুবিধা নইমূদ্দীনেরও ছিল। তাই তিনি বলেন [২৫]

> আরবী ভাষায় সে সকল শব্দ বঙ্গ ভাষায় ভাষান্তর করা অসাধ্য বুঝিলাম, এবং করিলেও অশ্রাব্য হয় তাহা পূর্ববৎ রাখা গেল।

মওলবী নইমূদ্দীন ছিলেন ইসলাম ধর্মে নিবেদিত প্রাণ মুসলমান। ইসলামকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা ও মুসলমাদের ঈমান দৃঢ়তর করা ছিল তাঁর অনুবাদের উদ্দেশ্য। নিশ্চয়ই তাঁর এ উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। সেজন্য, কুরআনের আর একজন অনুবাদক[২৬] নইমূদ্দীনের অনুবাদটি বাজারে পাওয়া যায় না বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

মওলানা আব্বাছ আলি

সমগ্র কুরআনের সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদক মওলানা আব্বাছ আলি[২৭]। চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার চণ্ডীপুর গ্রামে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। বাল্যে কিছুকাল গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষালাভের পর তিনি তাঁর চাচা মওলানা মনির উদদীন-এর কাছে আরবি-ফারসি ও উর্দু শেখেন। অতঃপর টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের জমিদার বাড়ির মাদ্রাসায় মওলানা আবদুর রহমান কান্দাহারীর নিকট দীর্ঘ পনের বছরকাল আরবি সাহিত্য, কুরআন, তফসির ও হাদিস অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি সেখানেই আরো পনের বছর শিক্ষকতা করেন। তারপর তিনি দেশে গিয়ে নিজ গ্রাম চণ্ডীপুরের মাদ্রাসার শিক্ষকতায় ব্রতী হন এবং ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রচারের ফলে পরগনা, যশোর, খুলনা, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার বহু লোক তাঁর অনুসারী হয়ে তাঁর বয়াত গ্রহণ করেন।

হেদায়েতের কাজে লিপ্ত থাকাকালে তিনি বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কিত পুস্তকের তীব্র অভাব অনুভব করেন। সেজন্য তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে বাংলায় পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর রচিত 'মহরম উৎসব'(১৮৮৪), 'মাছাএলে জরুরিয়া ও তরিকায় নববিয়া' (১৮৯৫), 'মুফীদল আহনাফ' (১৯০৩), ফতহুসশ্যাম' (১৯০৪), 'বারকোল মোয়াহেদীন' (১৯০৫), 'ফতহুল আজম' (১৯০৯), ফতহুল ইরাক' (১৯১২), 'ফতহুল মিসর' (১৯১২) প্রভৃতি পুস্তক এককালে খুবই জনপ্রিয় ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁর পিতৃব্য মনির উদদীন প্রণীত 'মনিরুল হুদা' (১৯০৮) গ্রন্থও প্রকাশ করেন। আব্বাছ আলি তাঁর 'মহরম উৎসব' গ্রন্থটি কলকাতার ওল্ড বৈঠকখানা সেকেন্ড লেনের শ্রীনকুলেশ্বর চক্রবর্তীর প্রেস থেকে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন[২৮]। মুদ্রণ ও প্রকাশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলে তৎকালে গ্রন্থকার বা লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ ছিল এক প্রকার অসম্ভব। আব্বাছ আলি ছিলেন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোক, কলকাতার উপকণ্ঠে, ২৪ পরগনা জেলার চণ্ডীপুরের তাঁতিবাগানে ১নং হুক লেনে এই সম্প্রদায়েরই হাজী আবদুল্লা নামক একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির একটি ছাপাখানা ছিল। মওলানা আব্বাছ আলি সম্ভবত এই প্রেসের মুদ্রাকরের চাকরি গ্রহণ করেন। এখান থেকেই তিনি 'মফিদুল আহনাফ' নামক ৪০ পৃষ্ঠায় একটি পুস্তিকা ১৯০৩ সালে প্রকাশ করেন। আর মুনশী করিম বখশের সঙ্গে তিনিও ছিলেন এটির মুদ্রাকর। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে এই প্রেস থেকে মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকার মুদ্রাকর হিসেবে আব্বাছ আলি ও মুনশী করিম বখশের নাম মুদ্রিত হতে দেখা যায়। পরে এই প্রেসটির নাম হয় আলতাফী

প্রেস এবং এটি ৩৩নং বেনেপুকুর রোডে স্থানান্তরিত হয়।[২৯] ইতিমধ্যে মওলানা আকরম খাঁ (১৯০০ সালে) কলকাতা মাদ্রাসা থেকে পড়াশুনা শেষ করে একটি পত্রিকা প্রকাশে সচেষ্ট হন। এ-বিষয়ে হাজী আবদুল্লা মওলানার সহায়ক হন। হাজী আবদুল্লা-রই মালিকানা ও গ্রন্থস্বত্বাধীনে 'মাসিক মোহাম্মদী' সর্বপ্রথম ১৯০৩ সালের আগস্ট মাসে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাটির প্রথম থেকে পঞ্চম সংখ্যা : আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ১৯০৩ এবং জানুয়ারি ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন মোহাম্মদ আকরম খাঁ। মুনশী করিম বখশ-এর সঙ্গে মওলানা আব্বাছ আলি ছিলেন এর মুদ্রাকর। মওলানা আকরম খাঁ নিজেও আব্বাছ আলিকে 'মোহাম্মদীর' "সর্বপ্রধান উদ্যোগী"[৩০] হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলা ভাষায় ইসলাম বিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকা ছাড়াও পবিত্র কুরআনের একটি বঙ্গনুবাদেরও অভাব অনুভব করেন মওলানা আব্বাছ আলি। তখনও পর্যন্ত কোনো মুসলমান পূর্ণাঙ্গ কুরআন বঙ্গানুবাদ করেন নি। মওলবী নইমুদ্দীন তখনও তাঁর অনুবাদ শেষ করতে পারেন. নি। আব্বাছ আলির ভাষায়[৩১] 'ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থ অমৃতময় কোরান... আলেমগণ পারসী, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার মুসলমানগণের বোধগম্য সরল বাংলা ভাষায় কোনো অনুবাদ অদ্যাবধি পরিদৃষ্ট হয় নাই। তাহাদের চিত্ত কোরআনের বাক্যসুধা পানে বঞ্চিত।"

অতএব, "সেই অভাব বিমোচনের জন্য"-ই মওলানা নিজেই একটি অনুবাদ রচনায় অগ্রসর হন। মওলানা আব্বাছ আলি "মাছালে জরুরিয়া ও তরিকায়ে নববিয়া" পুস্তকটি ১৮৯৫ সালে প্রকাশ করেন। পুস্তকটির সর্বশেষ পৃষ্ঠায় "এই কেতাব [অর্থাৎ মাছায়েলে জরুরিয়া] ও আর ২ কেতাব যাহা লেখা হইতেছে" তার একটি তালিকা আছে। এ তালিকার মধ্যে বাঙ্গলা "কোরান শরীফ"ও অন্তর্ভুক্ত । এতে অনুমতি হয় যে, ইতোমধ্যেই মওলানা আব্বাছ আলি কুরআন শরীফ অনুবাদে মনোনিবেশ করেছেন। পরে হাজি আবদুল্লাহর প্রেসে 'মোহাম্মদী' পত্রিকা মুদ্রণকালে সম্ভবত আকরম খাঁ-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ও পরে হৃদ্যতা জন্মে। ফলে সম্ভবত অনুবাদটি উভয়ে যুগ্মভাবে সম্পাদন করতে মনস্থ করেন।

তাঁর অনূদিত কুরআনের প্রথম পারায় আকরম খাঁ-র নাম বরঞ্চ প্রথম অনুবাদক হিসেবেই মুদ্রিত হয়।" সর্বপ্রথম প্রকাশিত অনুবাদের এই প্রথম পারাটি ১৯০৫ সালের ১৭ই আগস্ট রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্স -এ প্রথম জমা দেয়া হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩২ এবং মুদ্রাকর ছিলেন মওলানা আব্বাছ আলি নিজে। এর গ্রন্থস্বত্বাধিকারী হন হাজী আবদুল্লা।

অনুবাদটির দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ দ্বিতীয় পারা[৩৩] প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদক ছিলেন একমাত্র আব্বাছ আলি। এর মুদ্রাকর হিসেবে মুনশী করিম বখশ এবং গ্রন্থ স্বত্বাধিকারী হিসেবে অনুবাদক ও হাজী আবদুল্লার নাম ছাপা হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের বৎসরাধিকাল পরে অনুবাদকের তৃতীয় খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে। খণ্ডটির প্রকাশক ও মুদ্রাকর ছিলেন করিম বখশ। এটি ১৯০৭ সালের ১৩ই অক্টোবর রেজিস্টার অব পাবলিকেশন্স-এ জমা দেয়া হয়।[৩৪]

অনুবাদের কাজ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। নিয়মানুযায়ী প্রতিটি পারা আলাদাভাবে মুদ্রিত হয়। কিন্তু তিন পারা প্রকাশের পর পারাগুলো আর ভিন্ন ভিন্নভাবে জমা না দিয়ে অনুবাদক ১৯০৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি অনুবাদের প্রথম ৭ পারা একত্রে রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্স- এ জমা দেন। এ সাত পারার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২২২।[৩৫]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৭ এই তিন বছরে সর্বমোট সাত পারা অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম থেকে সপ্তম এই সাতটি পারাই সুপার রয়েল কোয়ার্টো অর্থাৎ ৩৪ সে.×২৬.৫ সে. আকারে মুদ্রিত হয়। প্রথমে থেকে তৃতীয় পারা পর্যন্ত অনুবাদটির আখ্যা ছিল। قران شریف কোরআন শরিফ। কিন্তু যখন একত্রে সাত-সাতটি পারা রেজিস্ট্রার অফিসে জমা দেয়া হয় তখন এর আখ্যা হয় قران مجید مترجم -কুরআন মজিদ মুতরজিম।

একত্রে প্রথম থেকে সপ্তম পারা পর্যন্ত জমাকৃত খণ্ডটি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। এর আখ্যাপৃষ্ঠার বাংলা আখ্যাটি নিম্নরূপ :

> কোরান শরীফ/খণ্ড/মৌলবী মোহাম্মদ আব্বাছ আলি কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত/ ও/ ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ তফসীর ও সহী হাদিছ অবলম্বনে টীকা লিখিত।/ কলিকাতা/ ৩৩ নং বেনেপুকুর রোড/ আলতাফী প্রেসে মুন্‌শী করিম বখশের দ্বারা মুদ্রিত/ সন ১৩১৪ সাল।

খণ্ডটির শেষে একটি বিজ্ঞাপনে "সর্ব্ব সাধারণকে জানান" হয় যে, "এখন হইতে এই কোরাণ শরীফ প্রতিমাসে ২ খণ্ড করিয়া ছাপা সমাপ্ত হইতেছে। গ্রাহকগণ মাসিক ২ খণ্ড করিয়া পাইবেন"। উপরে উদ্ধৃত আখ্যাটির প্রতি একটু মনোযোগ দিলেই দেখা যায় যে, "কোরাণ শরীফ"-এর "খণ্ড" কথাটির পূর্বে এটি কত সংখ্যক খণ্ড তা মুদ্রিত হয় নি; খণ্ড সংখ্যার স্থানটি শূন্য রাখা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ আখ্যাপৃষ্ঠাটি প্রতি খণ্ডেরই আখ্যাপৃষ্ঠা হিসেবে মুদ্রিত হয়ে ব্যবহৃত হত। সম্ভবত খণ্ডের পূর্বের শূন্যস্থানে ইপ্সিত খণ্ড সংখ্যাটি হাতে লিখে কিংবা মুদ্রিত করে প্রচার করা হতো ; যেমন— প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড ইত্যাদি।

এভাবে মওলানা আব্বাছ আলি যখন তাঁর অনুবাদটি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন তখন অনেকে আমপারার বাংলা তরজমা করার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ, মুসলিম মাত্রই নামাজের মধ্যে এই পারার অধিকাংশ সুরা পড়ে থাকেন। কিন্তু, অনেকে এসব সুরার মানে বুঝতে পারেন না। ফলে এই পারার তরজমা একান্তই আবশ্যক মনে করেন। অনেকের এই মত দেখে অনুবাদক চতুর্থ পারার কাজ বন্ধ রেখে সাধারণের সুবিধার জন্য' প্রথমে আমপারার অনুবাদ ছোট আকারে (২৬সে.×১৫সে.) বের করেন। এটি ১৯০৬ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৪৮ এবং এর মূল্য রাখা হয় চার আনা [৩৬]।

অনুবাদটির সর্বশেষ অংশ : ৮ম পারা থেকে ৩০শে পারা যথা সময়েই প্রকাশিত হয়। এ পারাগুলোও বাংলা ১৩১৪ সালে মুদ্রিত হয় কিন্তু রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্স –এর দফতরে পৌঁছে ৩রা নভেম্বর ১৯০৯ সালে। এ অংশটির পৃষ্ঠা[৩৭] সংখ্যা ছিল ৭৫৪। পূর্বে প্রকাশিত অনুবাদটির প্রথম থেকে সপ্তম পারার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২২২। অতএব এক থেকে ত্রিশ পারার (২২২+৭৫৪) সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৭৬–এ[৩৮]।

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, অনুবাদ শুরুর গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত মওলানা আব্বাছ আলি তাঁর অনুবাদের প্রতিটি পারা আলাদা আলাদা ভাবে মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন। কিন্তু এগুলোতে ধারাবাহিক পৃষ্ঠাঙ্ক দেয়া হয়। তথাপি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশের সময় প্রতিটি পারা স্বতন্ত্র পুস্তকেরই মতো একটি মালাটে আবৃত থাকতো, আর এগুলোতে আখ্যা এবং অন্যান্য বিবরণও মুদ্রিত থাকতো। এভাবে মুদ্রিত পুস্তকটি বাঁধাইয়ের সুবিধার জন্য মুদ্রণ সমাপ্তির পর অনুবাদক সর্বশেষ পারার সঙ্গে একটি আখ্যাপত্র ও ভূমিকা সমেত সূচিপত্র মুদ্রিত করে পাঠান।

সৌভাগ্যবশত বর্তমান নিবন্ধকার উত্তরাধিকার সূত্রে মওলানা আব্বাছ আলি অনূদিত এক জিল্‌দ কুরআনের অধিকারী হয়েছেন। তাঁর বড় চাচা ছৈলাদীর বড় মিঞা ফজলুল করিম খাঁন (১৮৮৭–১৯৬৮) চাঁদার মাধ্যমে খণ্ডে খণ্ডে তা সংগ্রহ করেন। সমগ্র কুরআন প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি সেটি এক জিল্‌দে বাঁধাই করেন। গ্রন্থটি তিনি তাঁর মৃত্যুর দু'বৎসর পূর্বে ১৯৬৬ সালে বর্তমান নিবন্ধকারের কাছে হস্তান্তর করেন। গ্রন্থটির দু' দু' পারার মধ্যবর্তী মলাটগুলো নেই। সম্ভবত বাঁধাইয়ের সময় দপ্তিরই এগুলো ফেলে পৃষ্ঠা মিলিয়ে বাঁধাই করেন। অতীব দুষ্প্রাপ্য এ অনুবাদটির আখ্যা পৃষ্ঠা নিম্নরূপ:

> কোরাণ শরিফ/ মৌলবী মোহাম্মদ আব্বাছ আলি /কর্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত / ও/ ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ তফছীর ও ছহি হাদিছ অবলম্বনে/ টীকা লিখিত/মৌলবী মহাম্মদ বাবর আলী ছাহেবের দ্বারা কবির কাশ্যাফ ইত্যাদি/তফছীর অবলম্বনে সংশোধিত ও টীকা লিখিত। কলিকাতা / ৩৩ নং বেনেপুকুর রোড/ আলতাফী প্রেসে/ মুন্‌শী করিম বখশের দ্বারা মুদ্রিত/ সন ১৩১৬ সাল।

পুস্তকটির মুদ্রণ সমাপ্তির পর অনুবাদকের একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা সংযুক্ত করেন। ভূমিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

> সেই অপর করুণাসিন্ধু, বিশ্বপিতা আল্লাতায়ালাকেই কায়মনোবাক্যে প্রশংসা করিতেছি, যিনি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাপিক্ষুদ্রের দ্বারা ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থ, প্রেরিত পুরুষ মহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওছাল্লামের উপর অবতীর্ণ তাঁহার পবিত্র বাণী কোরাণ শরিফের বঙ্গানুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অমৃতময় কোরাণ, মানবমণ্ডলীর অশেষ কল্যাণকর নীতিসমূহে পরিপূর্ণ। কিন্তু আরবী ভাষায় অভিজ্ঞতাবিহীন ব্যক্তির পক্ষে অন্ধের দর্শদের ন্যায় নিষ্ফল ছিল। তাই

আলেমগণ, পারসী, উর্দ্দু ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানগণের বোধগম্য সরল বাঙ্গালা ভাষায় কোন অনুবাদ অদ্যাবধি পরিদৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাদের চিত্তচকোর কোরাণের বাক্যসুধা পানে বঞ্চিত ছিল। তাঁহাদের সেই অভাব বিমোচনের জন্য এই অনুবাদ প্রকাশিত হইল। ইহার অনুবাদ ও সংশোধন কার্য্যে যে কতদূর পরিশ্রম করা হইয়াছে, শোণিত শোষী চিন্তায় শরীর দিবানিশি জর্জরিত হইয়াছে, আমাদের লেখনি তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম; প্রত্যেক আরবী পংক্তির নিম্নে উর্দ্দু তরজমা এবং তন্নিম্নে তাহার সরল বঙ্গানুবাদ রাখা হইয়াছে। আমাদের এ কার্য্যে যদি বঙ্গীয় মুসলেম সমাজের কিঞ্চিৎ মাত্র উপকার উপলব্ধি হয় তাহা হইলে আমরা শ্রম সার্থক মনে করিব। ঈদৃশ গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে আমাদের ন্যায় ভ্রান্তিময় মানব যে কুত্রাপিও স্খলিতপদ হইবে না তাহা নহে, যদি ইহা কোন মহাত্মার দৃষ্টিপথে পতিত হয় তবে তিনি আমাদের নিকট লিখিয়া বাধিত করিবেন বারান্তরে তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে। পরিশেষে সবিনয়ে নিবেদনে এই যে, হে পাঠক পঠিকাগণ। যদি তোমরা ইহা দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উপকার প্রাপ্ত হও তবে হস্ত দুটি তুলিয়া দয়াময় আল্লাতালার নিকট প্রার্থনা করিও যেন তিনি আমাদিগকে ও আমাদের মাতাপিতা গুরুজন, আত্মীয় স্বজন এবং সমস্ত মুসলমান নর-নারীকে ইহকালে ও পরকালে মঙ্গলদান করেন। আমিন। আমিন।

ভূমিকার অব্যবহিত পরেই "প্রত্যেক টীকার শেষভাগে যে চিহ্ন শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত" হয়েছে তার একটি তালিকা আছে। এ তালিকা থেকেই বোঝা যায় যে, অনুবাদক "হাদিস অতি-তাফসির, তাফসির, আরবি সউদ, জামি আল-কুরআন, তফসির মুদহি কুরআন, তফসির কবির, জালালাইন, হুসেইনী, ফত্হ আল-বায়ান" প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্যে এ অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা করেন।

"সূচিপত্রে" সমগ্র অনুবাদে পুস্তকের ধারাবাহিক সূচি তালিকাভুক্ত আছে। এতে সুরা এবং পারা এ উভয়েরই সূচি বাংলা ও আরবি পৃষ্ঠাঙ্কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মওলানা আব্বাছ আলির অনুবাদ মূল আরবি পাঠের নিচে শাহ্ রফিউদ্দীন-এর উর্দু তরজমা, তার নিচে বাংলা অনুবাদ। মার্জিনে উর্দু ও বাংলা টীকা দেয়া হয়েছে। বঙ্গানুবাদটির অন্যূন ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনুবাদটির বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয়। অনুবাদটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তা সুপার রয়েল আকারে ছাপা হয়। পরে এর একটি সংস্করণ স্মল রয়েল আকারেও (২৪সে.× ১৬সে.) বেরোয়। এদের মূল্য ছিল যথাক্রমে ১০ টাকা ও ৮ টাকা।

আব্বাছ আলির "উর্দু তরজমা সহ বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ"-এর "সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ" বেরোয় ১৯৩৬ সালে, অনুবাদকের মৃত্যুর চার বছর পরে। এ সংস্করণের সময় "কয়েকজন বিখ্যাত ফেকাহ্ তত্ত্ববিদ আলেম ও প্রখ্যাতনামা মুসলমান সাহিত্যিক ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পূর্ববর্ত্তী সংস্করণত্রয়ে যে সকল ভুল প্রমাদ ছিল

তদসমূহ সংশোধন"[৩৯] করে দেন। সংস্করণটি প্রকাশ করেন কলকাতার ৩৩/৩ বেনেপুকুর রোডের মিনার কোম্পানি। অনুবাদের এ সংস্করণটি " সুপার রয়েল চার পেজি বাঁধান দশ টাকা, অবাঁধান আট টাকা, ১নং মাঝারি সাইজ (রয়েল ৪ পেজি) বাঁধাই আট টাকা, ২নং রয়েল মাঝারি সাইজ বাঁধাই সাত টাকায়" বিক্রি হতো[৪০]।

অনুবাদটির সম্ভবত শেষ সংস্করণ হলো পঞ্চম সংস্করণ। এ সংস্করণটি "একমাত্র স্বত্বাধিকারী আলতাফী প্রেস [-এ] মৌলবী মোহাম্মদ এহিয়া সাহেবের ৩৩ নং বেনেপুকুর রোড, কলিকাতার [য়] মোহাম্মদ নকীবুদ্দীন খাঁ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত" হয় বাংলা ১৩৪৪ অর্থাৎ ১৯৩৭। প্রকাশক "পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন"-এ বলেন[৪১]

> এই বাংলাদেশের মাটিতে প্রায় চারি কোটি মুসলমানের বাস। আর বাংলা ভাষায় টীকা ও তরজমা লিখিত সম্পূর্ণ কোরান এই একখানা ব্যতীত— আর দু'খানা নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই বাংলাদেশে মাতৃভাষার সাহায্যে কাল মুল্লার অর্থ বুঝিয়া পড়িবার মত আগ্রহী লোকের এতই অভাব যে আজ দীর্ঘ আটাইশ বছর পরে পবিত্র কালামের মাত্র পঞ্চম সংস্করণ বাহির করিতে হইল"।

আল্লাহ্ তওফিক দিলে ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশের আশাও এতে প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বাজারে বেশ ক'জনের বাংলা তরজমা ও তফসির বের হয়ে গেছে। তাঁদের মধ্যে আবুল ফজল আবদুল করিম (১৯১৪), আবদুল হাকিম ও আলি হাসান (১৯২২-১৯৩৮), আকরম খাঁ (১৯২২—১৯৬০), ফজলুর রহিম চৌধুরী (১৯৩২) উল্লেখযোগ্য। তদুপরি প্রকাশক নকীবউদ্দীন খাঁ নিজেই তাঁর তরজমা ও তফসির প্রকাশে (১৯৩৮—১৯৪৯) আত্মনিয়োগ করেন। ফলে সম্ভবত আরো একটি সংস্করণ প্রকাশের অবকাশ আর তিনি পান নি।

মওলানা আব্বাছ আলির বঙ্গানুবাদ আজ দীর্ঘকাল যাবৎ দুষ্প্রাপ্য। সম্ভবত মওলানা মৃত্যুর (১৯৩২) পরে মাত্র দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য অনুবাদের প্রথম সংস্করণে আখ্যাপত্রের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, টীকা -টিপ্পনীর রচয়িতা ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ বাবর আলী। তরজমাটি সংশোধন অর্থাৎ সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেন তিনি।

মওলানা মোহাম্মদ বাবর আলী (১৮৭৪—১৯৪৬) ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর জেলার বাইসহাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরে পৈত্রিক নিবাস ত্যাগ করে এ জেলারই বারুইপুর থানার খোদার বাজার নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। হানাফি পন্থী পিতৃকুলে জন্মগ্রহণ করলেও কলকাতা, বিহার ও দিল্লীতে তাঁর কুরআন-হাদিসে উচ্চ শিক্ষা তাঁকে আহ্‌লে -হাদিস মতবাদে দীক্ষিত করে[৪২]।

মওলানা বাবর আলী প্রথম জীবনে সম্ভবত আলতাফী প্রেসে মওলানা আব্বাছ আলি ও করিম বখশের সহকর্মী ছিলেন। তাঁর দু'টি পুস্তক : খোতবা (১৯১১) ও ছেয়ানাতল মোমেনিন ফি রদ্দে ছায়েকাতোল মোসলেমীন (১৯১৭) আলতাফী প্রেস থেকেই মুদ্রিত হয়।

মওলানা বাবর আলী পরে আঞ্জুমানে আহলে হাদিস-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি আঞ্জুমানের মুখপত্র মাসিক **আহলে হাদিস** পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। অতঃপর তাঁরই চেষ্টায় পত্রিকাটি সাপ্তাহিকে পরিণত হলে (১৯২৮) তিনিই হন এর সম্পাদক। যথারীতি সম্পাদকের কাজ পরিচালনা ছাড়াও তিনি পবিত্র কুরআন-এর বঙ্গানুবাদ ও তফসির রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর এ অনুবাদ ও তফসির প্রথমে মাসিক ও পরে সাপ্তাহিক **আহলে হাদিস** পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হতো। কিন্তু ১৯৩০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকে মনিরুদ্দীন আনওয়ারী সম্পাদক নিযুক্ত হলে এটি সম্পাদকীয় স্তম্ভে থেকে সরে অন্য স্তম্ভে প্রকাশিত হতে শুরু করে। আমরা আহলে-হাদিস পত্রিকাটির ১৮মার্চ ১৯৩৭ (৯:২৮) সংখ্যা পর্যন্ত পরীক্ষা করেছি। এতে সুরা মায়েদার ১৫ রুকুর তরজমা ও তফসির ছাপা হয়। কিন্তু ড. মুজীবুর রহমানের তথ্যানুযায়ী ৪র্থ বর্ষের শুরু থেকে ১০ম বর্ষের ৩য় সংখ্যা (২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৪) পর্যন্ত প্রকাশিত অনুবাদাংশের প্রণেতা ছিলেন তৎকালীন সম্পাদক মনিরুদ্দীন আনওয়ারী।[৪৩]

সম্ভবত বাবর আলী স্বেচ্ছায় কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। কারণ **আহলে হাদিস** পত্রিকায়ই (৩ : ১১ : ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০) সংখ্যায় "বিদায় বাণী" নামক কবিতায় মওলানা আলী বলেন :

উজ্জ্বল যৌবন মম তরুণ জীবন
সমাজ সেবায় সব করেছি অর্পণ।
নাহিক সম্বল আর এ বিদায় দিনে
হৃদয়ের তপ্তশ্বাস আঁখি অশ্রু বিনে।

... ...

জরা জীর্ণ, রোগক্লিষ্ট অভাব কাতর
এভাবে নির্জ্জন বাস শ্রেয়ঃ অতঃপর।

সম্ভবত আহলে হাদিস থেকে অবসরগ্রহণের পর মওলানা স্বগ্রামে "নির্জ্জন বাস"ই করেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অনুবাদ ও তফসির আজও পুস্তকাকারে প্রকাশ লাভ করে নি।

মওলানা আব্বাছ আলি যখন তাঁর তরজমা প্রকাশ শুরু করেন তখন তিনি এর প্রতিটি খণ্ড ৫০০০ কপি করে মুদ্রিত করেন। তৎকালীন পাঁচ হাজার দূরের কথা, এক একবারে এক হাজার কপি মুদ্রণও ছিল বিরল ঘটনা। গিরিশচন্দ্র থেকে শুরু করে আকরম খাঁ পর্যন্ত কেউ কারও তরজমা ৫০০০ কপি ছাপতে সাহস করেন নি। প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, আব্বাছ আলির অনুবাদের পাঁচটি সংস্করণ বের হয়েছিল। তবে, এর দু'টি সংস্করণ অনুবাদকের মৃত্যুর পর। আমাদের মনে হয় এর সংস্করণ সংখ্যা আরো অনেক বেশি ।১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপনগুলো

পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এটি দু'সাইজে বাঁধাই অবাঁধাই উভয় অবস্থায় পাওয়া যেতো। তৎকালে অর্থাৎ চল্লিশের দশক পর্যন্ত অনুবাদটি ঘরে ঘরে পঠিত হতো। এবং এটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল বলে মনে হয়।

খানবাহাদুর তসলীমুদ্দীন আহ্‌মদ (১৮৫২-১৯২৭)

খানবাহাদুর তসলীমুদ্দীন আহ্‌মদ[৪৪] ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল দার্জিলিং-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্‌শী তরীকুল্লা। পৈত্রিক নিবাস দার্জিলিং জেলার চন্দননগর গ্রামে তিনি লেখাপড়া আরম্ভ করেন। রংপুর জেলা স্কুল থেকে ১৮৭৭ সালে এন্ট্রাস, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. এবং ১৮৮২ সালে বি. এল পাশ করেন। পুর্ণিয়া, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে কিছুকাল ওকালতি করার পর ১৮৮৯ সাল থেকে তিনি রংপুরে ওকালতি শুরু করেন। ১৯২৭ সালের ২৪শে মার্চ তিনি জান্নাতবাসী হন।

রংপুরে স্থায়িভাবে বসবাসের সূচনা থেকেই তসলীমুদ্দীন পবিত্র কুরআন অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। একেবারে প্রথমেই পুস্তকাকারে প্রকাশ না করে তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপি থেকে কুরআনের অংশবিশেষ বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশ শুরু করেন। তৎকালে মুসলমানদের প্রকাশিত সাময়িক পত্রগুলো পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, তাঁর অনূদিত কুরআনের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৯১ সালে **ইসলাম প্রচারক'** পত্রিকায়। ইসলাম প্রচারক ছাড়াও মাসিক নবনূর ও বাসনা পত্রিকায় তাঁর অনুবাদের বিভিন্ন অংশ প্রকাশিত হয়। এভাবে তাঁর অনুবাদের প্রকাশনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ১৯০৮ সাল পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলে।

সম্ভবত ১৮৯১ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯০৮ এই সতের বছরে তিনি সমগ্র কুরআন অনুবাদ করতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি অনুবাদটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার প্রয়াশ পান। সর্বপ্রথম তিনি কুরআনের ২৯ সংখ্যক পারা 'তাবারাকাল্লাজি' প্রকাশ করেন। এটি ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১০১ এবং মূল্য ধার্য্য হয় দশ আনা। পুস্তকটির মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন কলকাতার ১৫৯ নং কড়েয়া রোডের রেয়াজুদ্দীন আহমদ। অতঃপর তিনি প্রকাশ করেন আমপারা। এটি ১৯০৯ সালে রেয়াজুদ্দীন আহমদ কলকাতা থেকে পুনরায় ছেপে প্রকাশ করেন। আট আনা মূল্যে বিক্রীত এ পারার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৯৬।

কুরআন মুদ্রণ ও অনুবাদ প্রকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উদ্যোক্তাগণ প্রথমত এর সুরাগুলো প্রকাশ করেন।। অনেকেই আবার প্রথম থেকেই শুরু করেন ; দু'-এক পারা মুদ্রণের পর আমপারা মুদ্রণে হাত দেন। এ বিষয়ে বাংলায় নইমুদ্দীন ও আব্বাছ আলির নাম করা যেত পারে। উভয়েই কুরআনের প্রথম থেকে প্রকাশ শুরু করেছিলেন। পরে, কিয়দ্দুর অগ্রসর হলে পাঠকদের অনুরোধে ধারাবাহিক মুদ্রণ ও প্রকাশ স্থগিত রেখে আমপারা মুদ্রণে হাত দেন। তসলীমুদ্দীনও এ বিষয়ে ব্যতিক্রম

নন। তাঁর সম্পূর্ণ আমপারা মুনশী রেয়াজুদ্দীন আহমদের 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় ইতিমধ্যেই (৭ম বর্ষ, ১৯০৫) প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, সম্ভবত মুনশী সাহেবেরই পরামর্শে তিনি আপাতত আমপারা প্রকাশ স্থগিত রেখে সর্বপ্রথম 'তাবারাকাল্লাজি' প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন।

এ সম্বন্ধে ডক্টর মুজীবুর রহমান বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন "তিনি সর্বপ্রথম কেন যে উনত্রিশ পারা 'তাবারাকাল্লাজি'র তর্জমা প্রকাশ করলেন, আমরা বহু চিন্তা-ভাবনা করেও কোন হদিস পাই নি"[৪৫] । এ-বিষয়ে 'চিন্তা-ভাবন'রা কোনো অবকাশ নেই। কুরআনের সুরাগুলো ক্রমান্বয়ে ছোট— এভাবে গ্রন্থির হয়েছে। আটাশ সংখ্যক পারার চেয়ে উনত্রিশ সংখ্যাক পারা ছোট আর সবচেয়ে ছোট আমপারার সুরা। কাজের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উনত্রিশ ও ত্রিশ সংখ্যক পারা আলাদা মুদ্রণের রেওয়াজ প্রচলিত। ফারসি, তুর্কি, সোয়াহেলি, হাউসা, উর্দু ভাষায় এ জাতীয় প্রকাশনা অসংখ্য। উদাহরণ স্বরূপ লক্ষ্ণৌ থেকে ১৯১৭ সালে আবদুল হাকিম কানপুর থেকে ১৮৮৬ সালে আবদুল রহমান মুহম্মদ তাবারাকাল্লাজি-র উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে নাইজেরিয়ার কানু থেকে ১৯৬৯ সালে আবুবকর গুমী কর্তৃক তাবারাকাল্লাজি ও আমপারার হাউসা অনুবাদের প্রকাশও উল্লেখ করা যেতে পারে।

তসলীমুদ্দীন নিজেই আমপারা প্রকাশের সময় এর কারণ ব্যাখ্যা করেন[৪৬]। তিনি বলেন :

> উনত্রিংশৎ পারা ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে, দয়াময়ের অনুগ্রহে ত্রিংশৎ পারাও মুদ্রিত হইল। এই পারা মহা কোরআনের শেষ পারা। এই পারাই প্রথমত: বালক-বালিকাগণকে পড়ান হয়, অধিকাংশ মুসলমানই কোরআন শরীফের কেবল এই পারাই পাঠ করিয়া থাকেন, পূর্ব্বপর এই রীতিই চলিয়া আসিতেছে, এজন্য ২৯/৩০ পারার অনুবাদ প্রথম মুদ্রিত হইল। ... সমস্ত কোরআনের অনুবাদ কার্য্য শেষ হইয় গিয়েছে। ... কোর-আনে আল্লাহর, পরকালের অর্থাৎ কেয়ামতের এবং পয়গম্বরগণের আবির্ভাবের সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য সমস্ত বিষয় এই তিন বিষয়ের অন্তর্গত। উনত্রিংশৎ এবং ত্রিংশৎ (২৯/৩০) পারাতে এই কয়েকটি বিষয় প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইবেন। ... কোর-আনে প্রত্যেক সুরা স্বাধীন, ... অন্য সুরাতে তৎসম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা তাহার ব্যাখ্যা মাত্র। সুতরাং ত্রিংশৎ এবং উনত্রিংশৎ পারাও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ... এই দুই পারায় এত বিষয় আছে যে, তাহা জানিলে অনেক জানা যাইবে। এই দুই পারাতেই পাঠাকগণ ইসলাম ধর্ম্মের পবিত্রতার বহুল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইবেন।

'তাবারাকাল্লাজি'-র প্রকাশের সময় তসলীমুদ্দীন-এর পরিকল্পনা ছিল, "সম্মানিত কোর-আনের ত্রিশ পারার অনুবাদে মাসে মাসে এক এক পারা করিয়া বাহির হইবে। প্রত্যেক পারার মূল্য দশ আনার অধিক হইবে না [এবং] আমপারা ইহার পরেই বাহির হইবে"।

রংপুরে বাস করে কলকাতা থেকে 'মাসে মাসে' অনুবাদ প্রকাশ করা সম্ভবত খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল অনুবাদক তসলীমুদ্দীনের জন্য। তাই তিনি কুরআনের প্রথমাংশ সুরা ফাতিহা ও সুরা বাকারার অনুবাদ রংপুর কাদেরিয়া প্রেস থেকে প্রকাশ করেন।[৮] অনুবাদের এ অংশটি আমরা দেখে নি। সম্ভবত রংপুরের মুদ্রাঙ্কন অনুবাদকের মনঃপূর্ত হয় নি। তাই তিনি পুনরায় কলকাতার ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড–এর মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক–এর শরণাপন্ন হন।

ইতিমধ্যে (১৯১৪–১৯১৯) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ফলে কাগজ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ হয়ে যায়। এই অবকাশে হয়ত তসলীমুদ্দীন তাঁর অনুবাদের উপর আরো কিছু কাজ করার অবকাশ পান। অতঃপর ১৯২০ সালে তিনি তার সমগ্র রচনা কলকাতার ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এ্যন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড–এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মৌলবী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের কাছে অর্পণ করেন। দুর্ভাগ্যবশত অনুবাদটি প্রকাশে আরো বিলম্বিত হয়। অবশেষে ১৯২২ সালে অনুবাদটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

প্রথম খণ্ডে স্থান লাভ করে প্রথম দশ পারা : সুরা ফাতিহা থেকে সুরা তওবা। এ খণ্ডের প্রথমেই প্রায় দু'পৃষ্ঠাব্যাপী একটি "অনুবাদকের নিবেদন" আছে। এতে অনুবাদক তাঁর অনুবাদের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়:

> প্রত্যেক সুরার অনুবাদের প্রথমে ঐ সুরার মর্ম রুকুক্রমে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু ঐতিহাসিক, 'দার্শনিক', অধ্যাত্ম (তসওফ) সম্বন্ধীয় বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। আপত্তিকারিগণের আপত্তি খণ্ডন সম্বন্ধীয় বিষয় পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। কোরআনের সুরা সকলের কোন্‌টির পর কোন্‌টি সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে, এবং প্রত্যেক সুরার প্রথমেই বেড়ের মধ্যে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে এক বিস্তীর্ণ সূচিতে বর্ণমালাক্রমে প্রত্যেক বিষয় এক স্থানে সংগৃহীত করা হইয়াছে। ... সহযোগ বা অসহযোগ সম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করা হয় নাই, যে মত অভ্রান্ত তাহা তাহারা ঠিক করিয়া লইবেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন অনুবাদ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি অনুবাদের পূর্বেই অনুবাদক একটি বিস্তারিত 'মুকাদ্দিমাহ' জুড়ে দেন। এটা সাধারণত হয় কুরআন বা কুরআন পাঠের ভূমিকা। এ প্রসঙ্গে ইংরেজিতে George Sale–এর উল্লেখ করা যেতে পারে। সেল তাঁর অনুবাদের পূর্বে একটি বিস্তরিত "Preliminary discourse"সংযুক্ত করেন। সম্ভবত তসলীমুদ্দীন সেল–এর অনুবাদ পড়ে থাকবেন। এমনও হতে পারে যে, তিনি সেল–এর অনুবাদটি তাঁর নিজের অনুবাদ কাজে ব্যবহারও করে থাকতে পারেন। কাজেই, সেল–এর অনুকরণে খানবাহাদুর তসলীমুদ্দীনও তাঁর ৮২ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় ইসলাম ভূমি জাজিরতল আরব, ফেলাফত, কোর–আন, অগ্নিপূজক পারসিকগণের ধর্মগ্রন্থ দার্শাতিরে, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদে, উপনিষদে, পুরাণে ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণী এবং পাপহারী পয়গম্বরের ইউরোপীয় মহাযোদ্ধা জাতিগণের আবির্ভাবের ও

তিরোভাবের, বিজ্ঞানের উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণী, জগৎব্যাপী ভ্রাতৃত্বের আহ্বান ইত্যাদি সন্নিবেশিত করেন।

অনুবাদটি প্রকাশিত হলে তা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিভিন্ন আলোচক এর প্রশংসা করেন। বিভিন্ন ব্যক্তি এটিকে "সুপাঠ্য বাঙ্গালা", "অনুবাদ শুদ্ধ এবং ভাষা প্রাঞ্জল" এবং "আরবী তফসীর জালালায়নের ন্যায়, মতলবসহ অনুবাদ কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে, ইহাতে বুঝিবার পক্ষে সহজ হইয়াছে"— বলে মন্তব্য করেন। তৎকালে বিখ্যাত **মোসলেম জগৎ** "কোরআনের এমন প্রাঞ্জল অনুবাদ ইতিপূর্বে আর কখনো বাহির হয় নাই" বলে মন্তব্য করে। নবযুগ পত্রিকার মতে: "খান বাহাদুর [তাঁহার] পরিণত বয়সে এক মহা সাধুকার্য্যে, কষ্টসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে সাফল্য লাভ করিয়াছেন" বলে মন্তব্য করে। রায়তবন্ধুর মতে এর "বিশাল ভূমিকাও অতি অপূর্ব জিনিস [এবং] সুন্দর অনুবাদ হইয়াছে"। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর মতে, "অনুবাদের ভাষা সরল প্রাঞ্জল"। কাজেই তিনি মুসলমানদের এ অনুবাদের সাহায্যে "আল্লাহতালার আদেশ, উপদেশ, জানিবার এবং বুঝিবার জন্য" বিশেষরূপে আহ্বান জানান।[৪৮]

প্রথম খণ্ডের সংস্করণটির এক হাজার কপি মুদ্রিত হয়। এর মূল্য নির্ধারিত হয় আড়াই টাকা। তৎকালে পুস্তকটি দুর্মূল্যই বলা চলে। তথাপি তা খুবই জনপ্রিয় হয়। অনুবাদকের ভাষায় "দয়াময়ের কৃপায়, এই অনুবাদ হিন্দু মোসলমান ভ্রাতাগণের অনুগ্রহ লাভ" করে। ফলে "এক বৎসর পূর্ণ না হইতেই প্রথম খণ্ডের সংস্করণের প্রায় সমুদয় কপি বহি নিঃশেষিত"[৪৯] হয়ে যায়। অনুবাদটির জনপ্রিয়তার কারণেই হোক কিংবা "সর্ব সাধারণের হিতার্থেই" হোক ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেডের ম্যানিজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক অনুবাদকের দ্বিতীয় খণ্ড "কোম্পানীর ব্যয়ে প্রকাশ করিতে প্রস্তুত ছিলেন"[৫০] কিন্তু অনুবাদকের "স্বাস্থ্যের উন্নত হওয়ায়"— ইহা অনুবাদকের নিজের খরচেই মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল ছিল ১৩৩০/১৯২৩ সাল। এতে এগার পারা থেকে বিশ অর্থাৎ সুরা "ইউনুস" থেকে আনকাবুত" এই বিশটি সুরা স্থান লাভ করে।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের অব্যবহিত পরেই খানবাহাদুর তাঁর তৃতীয় খণ্ড মুদ্রণের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন এবং যথরীতি তা ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়। এটিও "মৌলবী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, বি. এ. সাহেবের সাহায্যে" অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সুরা "রোম" থেকে সুরা "নাস" পর্যন্ত মোট ৮৪টি সুরা তৃতীয় খণ্ডে স্থান লাভ করে।

তসলীমুদ্দীন পবিত্র 'কোরআন'-এর "বহু ব্যাখ্যাসহ সরল সবিস্তার বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ"-এর দাবিদার। খেলাফতের সম্পাদক মৌলবী ওজিহউদ্দীনের মতে অনুবাদ "আরবী তফসির জালালএনের ন্যায়, মতলবসহ অনুবাদ কার্য্য-সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাতে বুঝিবার পক্ষে সহজ হইয়াছে"[৫১]। সাধারণত ব্যাখ্যা-ভাষ্য পাদটীকায় কিংবা মার্জনের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু অনুবাদকের মতে এ জাতীয় টীকা টিপ্পনী "পাঠকালে হঠাৎ

মনোযোগ ভঙ্গ করিয়া" পাদটীকায় মনোযোগ দিতে হয়। এ জন্য তিনি 'বেড়ের মধ্যে' অর্থাৎ বন্ধনীর মধ্যে ব্যাখ্যা স্থাপন করেন। তিনি "তফসীর হাক্কানী, আজামুত তফসীর, তফসীর কাদেরী, এবং আধুনিক এবং পুরাতন বহু উর্দ্দু, পার্শী এবং মৌলানা নজীর আহম্মদ-এর অনুবাদের মূলের সহিত মিলাইয়া, যে অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা ভালবোধ হইয়াছে তাহাই"[৫২] গ্রহণ করেছেন তাঁর অনুবাদে। নিজ অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় তিনি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লাহোরী দলের নেতা মোহম্মাদ আলী প্রদত্ত ব্যাখ্যার অসামঞ্জস্য প্রদর্শন এবং ইউরোপীয়দের বিভিন্ন অপব্যাখ্যা খণ্ডন করেন।

মৌলবী তসলীমুদ্দীন তাঁর অনুবাদে কুরআনের মূল আরবি পাঠ সন্নিবেশিত করেন নি। এবিষয়ে কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি বলেন, "আরবী অনভিজ্ঞ পাঠকগণের পক্ষে তাহা আবশ্যক কিন্তু প্রত্যেক পৃষ্ঠার মাথায় সূরা, রুকূ এবং আয়াতের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, এবং অনুবাদে ও আয়াতের সংখ্যা লেখা হইয়াছে। সুতরাং মূলের সহিত অনুবাদ ঐক্য করিয়া দেখা সহজ।... ইহাতে মূল আরবী সন্নিবেশিত না করাতে হিন্দু পাঠক ভ্রাতাগণের পক্ষেও কোরআনে কি আছে তাহা জানিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই অনুবাদের হিন্দু গ্রাহক মহোদয়গণের সংখ্যা এক পঞ্চমাংশ নিত্য পাঠ্যগ্রন্থ (কোরআনে) কি আছে, যাহাতে পাঠকগণ তাহা সহজে জানিতে পারেন, তাহাই এই অনুবাদের উদ্দেশ্য। দয়াময় আর্-রহ্মানকে ধন্যবাদ যে অনুবাদকের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে"।[৫৩]

রেভারেন্ড উইলিয়ম গোল্ড়স্যাক

গোলড়স্যাক ছিলেন সাউথ অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির একজন সদস্য। এদেশে এই সোসাইটির প্রধান প্রচার কেন্দ্র ছিল ফরিদপুরে। অন্য একটি প্রচার কেন্দ্র ছিল পাবনায়। গোলড়স্যাক[৫৪] দীর্ঘদিন ফরিদপুরে থেকে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। ইসলামের ছিদ্রান্বেষণে তিনি কুরআন সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর রচিত ইসলামে কোরআন (১৯০৬),তাহরিফে কোরান (১৯০৭) দি অরিজিন অফ দি কোরান' (১৯০৭) এবং 'দি কোরান ইন ইসলাম' (১৯১২) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বাংলায় অন্যান্য অনুবাদকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গোল্ড়স্যাকও খণ্ডাকারে কুরআন অনুবাদে ব্রতী হন। তাঁর অনুবাদের প্রথম খণ্ড, প্রথম পারা "আ. লা. মি. সিপারা" নামে ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। তদনূদিত সর্বশেষ পারাটি প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। আমপারা নামে অভিহিত কুরআনের ত্রিশ সংখ্যক এই পারাটির গোলড়স্যাক প্রদত্ত আখ্যা ছিল "গম সিপারা"। অনুবাদটি প্রকাশকালে প্রতি পারার মূল্য ছিল তিন আনা, কিন্তু শেষ খণ্ডের মূল্য ধার্য হয় আট আনা।

আমরা ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সংগ্রহে রক্ষিত এ অনুবাদটির দু'টি কপি দেখেছি। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হলেও সম্ভবত প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল যে, এটি তিন খণ্ডে বাঁধাই করা হবে। এজন্য প্রতি দশ পারা অন্তর অন্তর সমাপ্তকৃত দশ পারার বর্ণানুক্রমিক "সূচীপত্র" ছাপা হয়। এ ছাড়াও প্রথম খণ্ডের শুরুতে "কোরানের

সুরাসমূহ"–এর একটি তালিকা আছে। এতে সংখ্যানুযায়ী বাংলা অক্ষরে সুরার আরবি নাম এবং পৃষ্ঠাঙ্ক দেয়া আছে। সম্ভবত অনুবাদটির পনের পারা মুদ্রণ সমাপ্তির পর অনুবাদক কিংবা প্রকাশক পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করে দু' খণ্ডে বাঁধাইয়ের সিদ্ধান্ত নেন। এ জন্যই হয়তো আমাদের পরীক্ষারত গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

> قران شريف /মূল আরবী হইতে অনুবাদিত, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ তফসীর ও হাদীস অবলম্বনে লিখিত/ সটীক/ কোরাণ শরীফ/ দ্বিতীয় খণ্ড।/ রেভা: উইলিয়ম গোল্‌ড়স্যাক সাহেব/ কর্তৃক প্রণীত। Christian literature society for India [ব্লক] /কলিকাতা ।/ ধর্মতলা স্ট্রীট, ৪৬ নং ভবনে/খ্রীস্টীয় সাহিত্য সমিতি দ্বারা প্রকাশিত/ ১৯১৫।

আলাদাভাবে পারাগুলো প্রকাশিত হলেও এর ক্রমাগত পৃষ্ঠাঙ্ক দেয়া হয়। ফলে, অনুবাদটি ১১৯৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়। প্রথম ও পনের পারার প্রদত্ত আখ্যা পত্র ছাড়াও পুস্তকটির প্রতি পারায়ই একটি করে সুদৃশ্য নীল রঙ–এর মলট দেয়া থাকত। আমরা দ্বিতীয় পারার মলাটের আখ্যাপত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

> ان جعلنه قرعناعربيا لعلكم تعقلوان قران شريف
>
> "সত্য আমরা ইহাকে আরব্য কোরান কারয়াছি, যেন/ তোমরা বুঝিতে পার"/ (সুরা আল জুখরুফ ২ আয়েৎ) /বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত ও ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ তফসীর অবলম্বনে/ লিখিত টীকসহা /কোরাণ শরীফ / দ্বিতীয় খণ্ড–সয়কুল সিপারা।/ কলিকাতা : / ৪১ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ ১৯০৮ / মূল্য তিন আনা।

অনুবাদটির প্রতিটি খণ্ডই বর্ডারসহ সুদৃশ্য ইংলিশ কাগজে মুদ্রিত হয়। তৎকালে কলকাতার ব্যাপ্টিস্ট মিশন ছিল এ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুদ্রণালয়। কুরআনের এ অনুবাদটি এ মুদ্রণালয়ের বৈশিষ্ট্য তো রক্ষা করেছেই— উপরন্তু পুস্তকটির পাতা উল্টালে মনে হবে এর প্রতিটি মুদ্রাক্ষরে আন্তরিকতার ছাপ রয়েছে। এতে সর্বপ্রথম আরবি এর আয়াত তৎপর বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে। এভাবে আরবি বাংলা যুগল ছত্রকে লাইন টেনে আলাদা করা হয়েছে। প্রয়োজনে পাদটীকা দেয়া হয়েছে। যে যে পৃষ্ঠায় পাদটীকা নেই সেখানে প্রতিটি পৃষ্ঠায় ১১ যুগল ছত্রে বিধৃত এ মুদ্রণ।

বলার অপেক্ষা রাখে না, খ্রিস্টান পাদরি কর্তৃক–এ অনুবাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং খ্রিস্ট ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার। অনুবাদক কর্তৃক প্রদত্ত নির্ঘন্টে উল্লেখিত "মিথ্যাকথা বলিতে অনুমতি" অথবা মুহম্মদ (দ:) 'ইসাইদের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন" কিংবা "কোরান : উহার ব্যাকরণ অশুদ্ধি" ইত্যাদি শিরোনামের প্রতি চোখ বুলালেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এ অনুবাদটি ছিল উদ্দেশ্যমূলক। তথাপি নিখুঁত মুদ্রণ, ভাষার লালিত্য, প্রকাশন সৌকর্য্য যে কোনো পাঠক বা গ্রাহককে অনুবাদটির প্রতি আকৃষ্ট না করে পারে না। বাংলাদেশের কুরআন মুদ্রক ও প্রকাশকদের জন্য দীর্ঘ আট দশক পরেও এই অনুবাদটির মুদ্রণ ও প্রকাশভঙ্গি উজ্জ্বল আদর্শ হিসেবে কাজে লাগতে পারে।

খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম

খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম[৫৫] টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার ডাকঘরের অন্তর্গত শ্রোতলী গ্রামে[৫৬] ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খোন্দকার মোহাম্মদ সাবিত। পিতার কাছে বাল্য শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকা যান। তৎকালে ঢাকার নওয়াব বাড়ি থেকে অনেক মুসলিম ছাত্রই পড়াশুনা করতেন। আবদুল করিম ছিলেন তাঁদেরই একজন। জানা যায় যে, ছাত্রাবস্থায় তিনি নওয়াব হাবিবুল্লাহর গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি কলকাতায় পরলোকগমন করলে সেখানকারই ৩নং গোবড়া কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

যথাসময়ে পড়শুনা শেষ করে আবদুল করিম টাঙ্গাইল ফিরে আসেন এবং সেখানকার বিন্দুবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে আরবি ও ফারসি ভাষার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এ সময়ে তিনি টাঙ্গাইলে পি. এম. কলেজে ও আরবি-ফারসির খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবেও কাজ করেন। এ ছাড়া আঞ্চলিক ম্যারেজ রেজিস্ট্রারও ছিলেন।

বিন্দুবাসিনী স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করার পর আবদুল করিম কুরআন তরজমায় হাত দেন। সর্বপ্রথম তিনি অনুবাদ করেন আমপারা। আরবি মূলহীন এ পুস্তকটি ঢাকার সাতরওজাস্থ মোহাম্মদ এব্রাহিমের ইসলামিয়া প্রেস থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯১৪ সালে মুদ্রিত হয়। এটি টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার ডাকঘরের অধীন শেহরাতৈলের এসলামিয়া লাইব্রেরির নামে প্রকাশিত হয়। অনুবাদটির দু' হাজার কপি মুদ্রিত হয়। এর মূল্য ছিল চার আনা। এর একটি কপি ১৯১৪ সালের ২৬শে জুন রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্স অফিসে জমা দেয়া হয়। এ কপিটিই ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। পুস্তকটিতে শেষ চার পৃষ্ঠাব্যাপী একটি পরিশিষ্টে রসুলুলাহ মুহম্মদ (দ:)-এর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সংকলিত হয়েছে। পরিশিষ্ট ছাড়াই পুস্তকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬। পুস্তকটিতে আলাদা কোনো আখ্যা পত্র নেই। প্রচ্ছদটিই আখ্যাপত্র। আখ্যাপত্রটি নিম্ন

> انه لقران الكريم (নিশ্চয় ইহাই গৌরবান্বিত কোর-আন।), সরল। প্রাঞ্জল এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ/ বঙ্গানুবাদ/ কোর-আন শরীফ/ বিভিন্ন প্রকার/ আরব্য পারস্য ও উর্দ্দু তরজমা এবং তফ্সীর অবলম্বনে/ মৌলভী খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম টাঙ্গাইল বি. বি. হাই ইংলিশ স্কুলের ভূতপূর্ব আরব্য ও পারস্যাধ্যাপক কর্ত্তৃক অনুবাদিত।/ প্রথম সংস্করণ/ এসলামীয়া লাইব্রেরী, সেহরাতৈল, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশিত।/ ঢাকা, এসলামীয়া প্রেসে, মহাম্মদ এব্রাহীম দ্বারা মুদ্রিত/ সন ১৩২১ বঙ্গাব্দ

আমপারার অংশ না হলেও এ দেশে সাধারণত সুরা দিয়ে আমপারা শুরু হয়। তৎপর কুরআনের ত্রিশ পারায় সংকলিত ঐ সুরাগুলি উল্টাভাবে (সুরা ১১৪) সুরা নাস থেকে শুরু করে (সুরা ৭৮)সুরা নাবায় শেষ হয়। কিন্তু দেশাবাব লংঘন করে খোন্দকার আবদুল করিম তাঁর অনূদিত আমপারায় কুরআন শরীফের মূল বিন্যাস অনুসরণ করে (সুরা ৭৮) সুরা

নাবা থেকে শুরু করে (সুরা ১১৪) নাস-এ মুদ্রণ শেষ করেন। এ খণ্ডে তিনি সুরা ফাতিহার অনুবাদও অন্তর্ভুক্ত করেন নি। পুস্তকটির মলাটের শেষের পৃষ্ঠায় একটি বিজ্ঞাপন আছে। এতে অনুবাদক জানান যে "পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার জন্য খণ্ডাকারে মুদ্রিত মূল্য প্রতিখণ্ড চারি আনা, ৩০ খণ্ড একত্র লইলে ডাক মাশুল সহ ৭ টাকা । অগ্রিম পাঠালেই ৫ টাকা।

আমপারা অনুবাদের পরপরই আবদুল করিম কুরআনের প্রথম থেকে অনুবাদ প্রকাশ শুরু করেন। একই বছর অর্থাৎ ১৯১৪ সালে "বঙ্গানুবাদ কোর্-আন শরীফ, প্রথম খণ্ড" প্রকাশিত হয়। এ খণ্ডটিও ঢাকার সাতরওজাস্থ এসলামিয়া প্রেসে মোহাম্মদ এব্রাহিম মুদ্রিত করেন। এটি ছিল কুরআনের প্রথম পারার অনুবাদ এবং আমপারারই মতো শেহড়াতৈলের এসলামিয়া লাইব্রেরির নামে প্রকাশিত হয়। দু'হাজার কপি মুদ্রিত হলে এর একটি ১৯১৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্স-এ জমা দেয়া হয়। পুস্তকটির মূল্য ছিল চার আনা।

এভাবে তিনি সম্ভবত ঢাকা থেকেই তৃতীয় পারা পর্যন্ত মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন। মওলানা করিম কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত আমপারাও প্রথম তিন পারা ছিল আরবি মূলহীন বঙ্গানুবাদ। প্রথম তিন পারা প্রকাশের পর আবদুল করিম খণ্ড তিনটির একটি সেট "বঙ্গের খ্যাতনামা পীর ও মোর্শেদ" বঙ্গীয় প্রাদেশিক জমিয়তে ওলামা ও আঞ্জুমানে ওয়াজীনে হানাফিয়ার সভাপতি এবং আমিরে শরিয়তে বাঙ্গালা মুহম্মদ আবুবকরকে উপহার দিলে ১৯২৪ সালের ১লা ডিসেম্বর তিনি (আবুবকর) লেখেন :[৫৭]

> আমি মৌলবী খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম সাহেব কর্তৃক অনুবাদিত কোর্-আন শরীফের ১ম তিন পারা এন্-আম পাইয়া অত্যন্ত খুশীর সহিত তাহাকে মোবারকবাদ দিতেছি। [ইহা] ... সাধারণের বোধগম্য সরল ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ ... এবং [এতে] আবশ্যক মত তফছির ও শানে নজুল সন্নিবেশিত হইয়াছে। ... আমার নিকট [ইহা] খুব ভাল ও নির্ভুল ... [এবং] উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। বর্ণিত [অনুবাদ] খানা সংক্ষিপ্ত ও সকলের পাঠের উপযোগী। আমি দোওয়া করি, আল্লাহতায়া'লা গ্রন্থকারকে এই মহৎকার্য সম্পাদনে তৌফিক দেন। এবং মোছলমান ভাইদিগকে উপদেশ দেই যে, তাহারা প্রত্যেকেই আপন মাতৃ ভাষায় অনুবাদিত এই মহাগ্রন্থের এক এক খানা খরিদ করত: পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ ও ছওয়াবে দারায়েন হাছেল করেন ও গ্রন্থকারকে উৎসাহ প্রদান করেন, ইহার ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট এবং মূল্যও সুলভ ; ইতি।

তৎকালে ঢাকা শহরে মুদ্রণ ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। প্রয়োজনীয়, বিশেষত আরবি মুদ্রাক্ষর ছিল নাগালের বাইরে। সেজন্য, আবদুল করিম ভারতবর্ষের মুদ্রণ ও প্রকাশনীর প্রকৃষ্ট স্থল কলকাতা যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন। সুযোগও মিলে যায় শীঘ্রই। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে আরবি ফারসি প্রুফ রিডারের একটি চাকরি[৫৮] পেয়ে যান। তাই তিনি টাঙ্গাইল ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় বসতি স্থাপন করেন।

কলকাতায় পৌঁছার পর তিনি স্বনামধন্য স্যার ডক্টর আবদুল্লাহ আল মা'মুন সুহরাওয়ার্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় দার-উল-ইশায়াত নামক একটি প্রকাশনী সংস্থার প্রতিষ্ঠা করে কুরআন ও ইসলাম বিষয়ক পুস্তকা-পুস্তিকা প্রকাশে মনোনিবেশ করেন। সম্ভবত দার-উল-ইশায়াত থেকেই তিনি পুনরায় প্রথম থেকে আরবি মূল সমেত তদনূদিত কুরআন প্রকাশে রত হন। এভাবে ১৯৩১ সালের মধ্যেই তাঁর অনূদিত কুরআনের ত্রিশটি পারাই অনুবাদ সম্পন্ন হয়ে যায়। ১৯৩১ সালে আবদুল করিম নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন[৫৯]

> মওলানা খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম সাহেব অনূদিত সরল প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সহ বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ সম্পূর্ণ ত্রিশ খণ্ড একত্রে বাহির হইয়াছে। ইহার কাগজ ছাপা উৎকৃষ্ট । এ যাবৎ এইরূপ অনুবাদ আর প্রকাশিত হয় নাই। ১৫০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য পাকা জেল্‌দ সহ ৯ টাকা সাত আনা। বিনামূল্যে নমুনা প্রাপ্তব্য। প্রপ্তিস্থান : মুনশী মহম্মদ জামেন আলী পাবলিশার বুক সেলার। ১৩ নং ওয়েলেসলী স্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুবাদ সমাপ্তি ও মুদ্রণের পর তিনি অনুবাদটির দ্বিতীয় সংস্করণে হাত দেন। পুনরায় তিনি প্রতি পারা আলাদা আলাদাভাবে খণ্ডাকারেই প্রকাশে মনোনিবেশ করেন। দ্বিতীয় সংস্করণের এই প্রথম পারাটির প্রকাশকাল হলো ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুন। এ পারাটির সঙ্গে সংযুক্ত এক বিজ্ঞাপনে অনুবাদক জানান :

> "সরল প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ"। বিভিন্ন প্রকার তফসির ও তরজমা অবলম্বনে ইহা অনূদিত ; শানে নজুল এবং টীকা সন্নিবেশিত সম্পূর্ণ ত্রিশ পারা ১৫০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পাকা জেল্‌দসহ... আরব্য-বঙ্গ সংস্করণ। ১০ টাকা স্থলে ৮ টাকা।

মওলানা আবদুল করিমের অনুবাদের বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেক সুরার প্রারম্ভে আরবি বাংলায় সেই সুরার নাম। প্রতিটি আয়াতের আরবির ক্ষেত্রে আরবি আর বাংলার ক্ষেত্রে বাংলা ক্রমিক সংখ্যা। প্রতিটি পৃষ্ঠায়ই সর্বপ্রথম মূল আরবি, তৎনিম্নে বাংলা অনুবাদ। এভাবে প্রতি পঙতির পরে আঁকা বাঁকা রেখা টেনে দেয়া হয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠার সর্বনিম্নে পাদটীকায় 'মূল শব্দার্থ' ও 'টীকা' সন্নিবেশিত হয়েছে।

সম্ভবত প্রথম সংস্করণটির কপিগুলো ১৯৩৮ সালের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। কারণ উপরে উদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তিতে বোঝা যায় যে, অনুবাদক তখন 'অবশিষ্ট' কপিগুলো বিক্রয় করছিলেন। কারণ, প্রকাশনা জগতের রীতি হলো, যখন পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের পথে, তখন পূর্ববর্তী সংস্করণের অল্প সংখ্যক অবিক্রিত কপিগুলো অল্প মূল্যে বিক্রি করে দেয়া.। এভাবে প্রথম সংস্করণের কপিগুলির নিঃশেষ হলেই সম্ভবত তিনি দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণ শুরু করেন। এ সংস্করণটি ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হলে এর এক কপি দারুল উলুম দেওবন্দের গ্রন্থাগারে এবং অন্য একটি কপি ফকির আহমদ সাঈদকে

উপহার হিসেবে পাঠানো হয়। দেওবন্দের মাওলানা তাইয়েব এবং ফকির সাঈদ এগুলোর প্রাপ্তিস্বীকার ও মওলানা করিমের সাফল্য কামনা করে দোয়া করেন। উর্দুতে লেখা দু'টি পত্রই অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছেদের যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় আভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। সম্ভবত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৫০, কারণ দ্বিতীয় খণ্ড 'সায়্যাকূল' ৫১ পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠার সংখ্যা ৯৮।

দ্বিতীয় খণ্ডের একটি কপি সৌভাগ্যক্রমে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সংগ্রহ করেছিলেন। এ খণ্ডের কোনো আখ্যাপত্র নেই। প্রচ্ছেদের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

> পরম দয়ালুদাতা বিশ্ব-পতি আল্লার দান ইহ পরকাল-বিধান-মহাগ্রন্থ।/القران/আল্-কোর্-আন/ সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শব্দার্থ, ব্যাখ্যা, অবতরণিকা ও টীকা সম্বলিত।/ কোর্আন শরীফ।/ দার-উল-ইশায়াত, কলিকাতা [মনোগ্রাম]/ দ্বিতীয় সংস্করণ/ এ. এফ. আবদুল করিম/ সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ১৩৪৬ ব: প্রতিখণ্ড তিন আনা ।
>
> শিরোপা : vol. I regd. Cal 842, 3-1-29, Part 2.
>
> দ্বিতীয় খণ্ডের প্রচ্ছদের শেষ বহি: পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বিবৃতিটি ছাপা হয় :
>
> কলিকাতা 'দার-উল-ইশায়াত'-এর মহাদান القران /বঙ্গানুবাদ কোরআন-শরীফ।
>
> সরল প্রাঞ্জল অর্থ, ব্যাখ্যা, অবতরণিকা ও টীকা সন্নিবেশিত "কোর্আন শরিফ"। মাসিক কাগজের ন্যায়, মুদ্রিত, প্রকাশিত। ইহার কাগজ, কালি ও ছাপা উৎকৃষ্ট, মূল্য প্রতি খণ্ড ১।।০ আনা, ১ টাকা জমা দিলে ছয় আনা, ৫ টাকা পাঠালে কেবল খরচে ক্রমান্বয়ে ত্রিশ খণ্ডে সমগ্র মহাগ্রন্থ প্রাপ্তব্য। মাসুল স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয় সংস্করণে এ অনুবাদটি "মিডিয়ম এবং রয়েল আট পেজী আকারে বিলাতী কাগজে খণ্ডে খণ্ডে ছাপা হয়। মূল্য [ধার্য হয়] প্রতি খণ্ড রয়েল ।।০ আনা—মিডিয়ম ছয় আনা, ত্রিশ খণ্ডের মূল্য যথাক্রমে ৭।।০ টাকা ও ৫ টাকা। ভি. পি. ডাকে [গ্রাহক হলে] প্রতি খণ্ডে সাত আনা মাসুল ... [দিতে হত, অথচ] ছয় সংখ্যা একত্রে লইলে মাশুল দিতে" হতো না।

সমগ্র কুরআনের গদ্যানুবাদ ছাড়াও তিনি পদ্যে আমপারার অনুবাদ প্রকাশ করেন। তদুপরি তিনি মূল আরবি কুরআন, আশরাফ আলী থানবীর উর্দু অনুবাদও প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়া তিনি "সিলসিলাত-উল্-কোর্আন" নামে কোর্আন শরিফের নির্বাচিত সুরার অনুবাদও প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের কপিগুলো শেষ হয়ে গেলে অনুবাদক পুনরায় তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু সম্ভবত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আবুল ফজল আবদুল করিমের অনুবাদ এখন দুষ্প্রাপ্য। সম্ভবত বাংলাদেশের কোনো গ্রন্থগারেই এটি সংরক্ষিত হয় নি।

মুনশী করিম বখশ

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের বাংলা সাহিত্য তথা ইসলামি বাংলা সাহিত্য জগতে কয়েকজন করিম বখ্স–এর নাম পাওয়া যায়। অধ্যাপক আলী আহমদ[৬০] চারজন করিম বখশ–এর পুস্তক তাঁর গ্রন্থপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। স্বতন্ত্র গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি এ গ্রন্থপঞ্জিতে পুথিগুলো অন্তর্ভুক্ত করেন নি ; করলে হয়তো আরো করিম বখ্শের সন্ধান পাওয়া যেতো। এ চারজন করিম বখশের মধ্যে একজন হলেন 'করিম বখ্শ' দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন মুনশী করিম বখ্শ, তৃতীয় জন মোহাম্মদ করিম বখ্শ, আর চতুর্থ ব্যক্তি হলেন করিম বখ্শ সর্দার। এঁদের মধ্যে একমাত্র মোহাম্মদ করিম বখশই কুরআন বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আমরা ত্রিপুরা জেলার (বর্তমান কুমিল্লা) "শাছন (শাষণ?) মেগ নিবাসী" একজন মোহাম্মদ করিম বখ্শ–এর সন্ধান পেয়েছি। তিনি "চরিতামৃত বা গোলজারে ইব্রাহীম আদহাম" নামক পুঁথির রচয়িতা। তিনি স্বীয় বিবৃতি অনুযায়ী "কোরাণ শরীফের সভ্যতা" ও অন্যান্য পুস্তক "উচ্চ–ভাষায়" প্রণয়ন করেন ; ফলে স্বল্পশিক্ষিত জনগণের বুঝতে অসুবিধা হয় বলে তিনি 'চরিতামৃত' পুস্তকটি পুঁথির[৬১] ভাষায় লেখেন। তৎকালে তিনি ছিলেন একজন ইসলাম "প্রচারক এবং আরবি ভাষাভিজ্ঞ মৌলবী ।

বাংলার সাহিত্য জগতে অন্য একজন ব্যক্তি হলেন কলকাতার ৩নং হক লেনে হাজী আবদুল্লা প্রতিষ্ঠিত আলতাফী প্রেসের মুদ্রাকর মুনশী করিম বখশ। তিনিই মওলানা আব্বাছ আলির অঙ্গে আকরম খাঁর সম্পাদনায় নবপর্যায়ে মাসিক 'মোহাম্মদী' ১৯০৩ সালে মুদ্রিত করেন। তিনি দীর্ঘকাল এ প্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তিনিই মওলানা আব্বাছ আলির বঙ্গানুবাদ 'কোরাণ শরীফ' মুদ্রিত করেন।

পবিত্র কুরআন প্রসঙ্গে আমরা অন্য একজন মুনশী করিম বখশের–ও সন্ধান পাই। এবার তিনি কুরআন–এর মুদ্রাকর হিসেবে নন অনুবাদক হিসেবে। এ অনুবাদের প্রথম খণ্ডটি অনুবাদক কর্তৃক ইন্টালীর (কলকাতা) জাননগর রোডের মুনশী আবদুল লতিফ এর তরিকা–ই–ইসলাম প্রেস থেকে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এটি কুরআনের প্রথম পারা। এতে ছিল যথাক্রমে আরবি, মূল বাংলা অক্ষরে আরবি উচ্চারণ ও বঙ্গানুবাদ।

তৎকালে প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি খণ্ডে খণ্ডে সমগ্র কুরআন অনুবাদ করেছিলেন কিনা জানা না গেলেও তিনি এর সর্বশেষ পারা 'আমপারা' অনুবাদ করেছিলেন সে প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। ৫২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'আমপারা'র এ খণ্ডটি ১৯১৮ সালে পুনরায় অনুবাদক কর্তৃক মুনশী আবদুল লতিফের তরিকা–ই–ইসলাম প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।[৬২]

করিম বখ্শ অনূদিত 'কুরআন শরিফ' আমরা দেখি নি। ড. মুজীবুর রহমান কলকাতার জাতীয় গ্রন্থগারে "শুধুমাত্র প্রথম (আলিফ–লাম–মিম) পারা" দেখে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন আয়াতের অনুবাদের ভাষা পরীক্ষা করে এর ভুল ত্রুটি আবিষ্কার করে সম্ভবত প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মুনশী করিম বখ্শ ছিলেন "স্বল্প

শিক্ষিত"। সেজন্য "কুরআন তরজমার মত মহান গুরুত্বপূর্ণ কাজের যোগ্যতা ততোটা তাঁর ছিল না" ড: রহমানের এ অভিমতের সঙ্গে আমরা একমত নই।

কুরআন অনুবাদক মুন্‌শী করিম বখ্‌শ এবং আলতাফী প্রেসের মুদ্রাকর মুনশী করিম বখ্‌শ কি একই ব্যক্তি? নিজে মুদ্রাকর হয়ে যদি তিনি ১৯১৬ সালে মোহাম্মদ নেয়ামতুল্লার "ধোকা-ভঞ্জন বা ভ্রম খণ্ডন" পুস্তক মুদ্রিত করতে পারেন তবে তাঁর নিজের পুস্তক কেন মুনশী আবদুল লতিফের তরিকা-ই-ইসলাম প্রেসে নিয়ে গেলেন?

করিম বখ্‌শ মুদ্রাকর ছিলেন বলেই ড: রহমান তাঁকে 'স্বল্পশিক্ষিত" মনে করেছেন কিংবা অনুবাদকের ভুল ত্রুটির জন্য তা তাঁর লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে না। মুদ্রাকর হলেই যেমন কেউ "স্বল্পশিক্ষিত" হন না তেমনি অনুবাদকের ভুলত্রুটি-ও শিক্ষার মাপকাঠি নয়[৬৩]। কারণ "অনুবাদক" যে "প্রতারক"[৬৪] তা বিশ্ববিদিত। প্রকৃতপক্ষে, মুনশী করিম বখ্‌শ ও তাঁর অনুবাদ সম্বন্ধে আরো গবেষণার প্রয়োজন। অন্যথায় কোনো মন্তব্য করা হলে পাঠকদের কেবল বিভ্রান্তই করা হবে, কোনো প্রকৃত তথ্যের সন্ধান দেয়া যাবে না।

রুহল আমিন

বাংলার "আলেম সমাজের গৌরব-মুকুট" ও "দীপ্ত সূর্য্য" বলে অভিহিত মওলানা রুহল আমিন[৬৫] ছিলেন তফসির, হাদিস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে একজন বিশিষ্ট আলেম। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র। কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা, ফিকাহ্-তত্ত্বের বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন অতীব দক্ষ। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত বক্তা। বঙ্গদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে তিনি কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা করে অসংখ্য বক্তৃতা করেন। মওলানা আমিন 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'-এর বঙ্গদেশ শাখার সভাপতি ছিলেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কারে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। অর্ধশতাব্দীকাল ধরে তিনি সমগ্র বাংলা ও আসামের বিভিন্ন জেলায় "প্রায় প্রত্যহই" অসংখ্য ধর্মসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পবিত্র কুরআন, হাদিস, ফিকাহ্ ও তাসাওফ সম্বন্ধে শতাধিক পুস্তক রচনা করেন। মওলানা হামিদীর তালিকানুযায়ী তাঁর রচিত ১১৪টি পুস্তকের পৃষ্ঠা[৬৬] সংখ্যা ছিল ১২৩৮৩।

মওলানা আমিন ১৮৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার নারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মুনশী গাজী দবিরুদ্দিন। বাল্য-শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন। তিনি যে কেমন মেধাবী ছাত্র ছিলেন তা বর্ণনা করতে যেয়ে ১৯৪৫ সালের ২রা নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হলে 'মোসলেম' পত্রিকা মন্তব্য করেন :[৬৭]

> কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ছাত্র উচ্চ ডিগ্রী লইয়া বা শেষ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইতেছেন। কিন্তু শতাব্দীর মধ্যে বাংলার মোছলমানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটির বেশী ফজলুল হক এবং কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে একটির বেশী রুহুল আমিন সৃষ্টি হয় নাই। ভবিষ্যতে কতদিনে হইবে তাহাও জানি না।

মওলানা রুহুল আমিন তাঁর অধ্যয়ন ও ইসলাম প্রচারকালে বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের একটি বিশুদ্ধ ও বিস্তৃত বঙ্গানুবাদের অভাব অনুভব করেন। মৌলবী নইমুদ্দীন তাঁর অনুবাদে "সময়োচিত তফসীর সমূহের সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ " করতে পারেন নি। তা ছাড়া এ অনুবাদ তখন দুষ্প্রাপ্য। গিরিশচন্দ্র সেনের অনুবাদ ব্রাহ্মধর্মের ভাবধায়ায় প্রভাবান্বিত। মৌলবী আব্বাছ আলি-র "অনুবাদেও বিস্তর ভুল-ভ্রান্তি" আছে। খ্রিস্টান পাদ্রি উইলিয়ম গ্যোল্‌ড্‌স্যাক যে অনুবাদ করেছেন "তাহাতে ইচ্ছা করিয়াই ... বিপরীত অর্থ ও বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহা পাঠ করিয়া বিপরীত মতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে, মুসলমানদের ঈমান নষ্ট হইবার কথা। ... তাহার প্রতিবাদ না করিলে মুসলমান সমাজের সর্বনাশ হইবে।"[৬৮]

সর্বপ্রথম তিনি হাত দেন আমপারা অনুবাদে। এর প্রথম খণ্ড ১৯১৭ সালে কলকাতার মোহাম্মদ রেয়াজল ইসলাম প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। খণ্ডটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৪০। অচিরেই এর দ্বিতীয় খণ্ডটিও প্রকাশ লাভ করে। একই প্রেস থেকে ১৯১৮ সালে মুদ্রিত এ খণ্ডটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৪১-৪২৪। এ অনুবাদটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। তৃতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪৫৮।

আমপারা প্রকাশের পরপরই মওলানা প্রথম থেকে সম্পূর্ণ কুরআন অনুবাদে হাত দেন। তাঁর 'আলিফ-লাম-মিম পারার বিস্তারিত তফসির' ১৯২৫ সালে, 'সাইয়াকুলের তফসির' ১৯২৭ এবং ১৯২৭ এবং 'তেলকার রোছোলের তফসির' ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত কুরআন অনুবাদে এখানেই তিনি ছেদ টানেন। সম্ভবত অনবরত ধর্ম প্রচার ও রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়া এবং পীর-মুরিদী কাজে বস্ততার জন্য তাঁর পক্ষে সমগ্র কুরআন অনুবাদ সম্ভব হয় নি।

মওলানা আমিনের অনুবাদ ও তফসির এখন দুষ্প্রাপ্য। তাঁর অনুবাদে রয়েছে সর্বপ্রথম শানে নজুল, তৎপর আরবি আয়াত, তৎপর বঙ্গানুবাদ। অনুবাদের পরপরই তিনি টীকা-টিপ্পনীর মাধ্যমে বিস্তৃত তফসিরের অবতরণা করেছেন প্রতি সুরায়। টীকা-টিপ্পনীর ব্যাখ্যা ও তফসির ছাড়াও তাঁর পূর্ববর্তী অনুবাদক যথা— গিরিশচন্দ্র, আব্বাছ আলি, গোল্‌ড্‌স্যাক প্রমুখের অনুবাদ ও তফসিরের দোষ-ত্রুটি কিংবা অপব্যাখ্যা প্রদর্শন ও খণ্ডন করেন।

অনুবাদটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় মওলানা রুহুল আমিনের অনুসারী ও ভক্ত মোহাম্মদ কেরামত আলী তা ১৯৭৫ সালে মাসিক **আল-আমিন** পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। পত্রিকাটির প্রথম বর্ষ ১ম সংখ্যা (জানুয়ারি ১৯৭৫) থেকে তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ১৯৮১) পর্যন্ত অনুবাদ ও তফসিরটির কিয়দংশ প্রকাশিত হয়।

তৎকালে "বাংলা, উর্দ্দু, ইংরাজি ভাষায় তফসীর সুন্নত জামাতের খেলাফ আকিদা সহ বাহির হওয়ায় দীন এসলামের খুব ক্ষতি" হচ্ছিল। সেজন্য, "হজরত নবী করিম (সা:) ঐ সমস্ত বিপরীত অর্থযুক্ত তফসীর রদ করাইবার জন্য" ফুরফুরার পীর মোহাম্মদ আবুবকরকে "মওলবী আবদুল লতিফ সাহেব দ্বারা স্বপ্নযোগে বিশেষভাবে আদেশ্ন করেন। হযরতের আদেশানুসারে" উক্ত পীর সাহেব মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিনকে "প্রত্যেক গোমরাহ লেখকের প্রতিবাদ" সমেত কুরআন অনুবাদ ও তফসির প্রণয়নের নির্দেশ দেন।

ফুরফুরার পীরের নির্দেশানুযায়ী "নেচারী সম্প্রদায়ের নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ, কাদিয়ানী (আহমদী) সম্প্রদায়ের মোহম্মদ আলি, ডাক্তার আবদুল হাকিম, মির্জ্জা বসিরুদ্দিন, মোহাম্মদী দলের মৌলবী আব্বাছ আলি, আক্রাম খাঁ, খ্রিস্টিয় সম্প্রদায়ের পাদ্রী গোল্ডসেক, রডওয়েল পা[ল]মার, সেল ই. এম. ওয়ারী [Wherry] প্রমুখাত, ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের বাবু গিরিশচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য বহু বিপথগামী সম্প্রদায়ের লিখিত ভ্রমপূর্ণ তফছিরের বিশেষ সমালোচনা দ্বারা সত্যমত সুপ্রতিষ্ঠিত" করা ছিল এ তরজমা ও তফছিরের উদ্দেশ্য। ফলে এ তফসির "প্রত্যেক ভ্রমপূর্ণ তফসিরকারগণের মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার খণ্ডনার্থে যথোচিত হাদিস এবং প্রাচীন তফসির সমূহের সত্য মতালম্বী পেশ করা হইয়াছে। ইহাতে ... কোথায় কোন স্থলে কোন দল কি ভুল করিয়াছেন, কোথায় তাহারা আরবী ব্যাকরণের বিরুদ্ধারচারণ করিয়াছেন, কোথায় খোদার কালামের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিয়া নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন" তা প্রদর্শন করা হয়েছে।[৬৯]

আবদুল হাকিম ও আলি হাসান

একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক ও কুরআন অনুবাদক আবদুল হাকিম[৭০] গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর থানার 'নগর সুন্দরদী' গ্রামে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাশিয়ানী স্কুলে শিক্ষা সমাপনান্তে এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাশ করে নগরকান্দা জুনিয়ার মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ আরম্ভ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল গনি।

বাল্যকাল থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। ধার্মিক পিতার কাছেই তিনি ইসলামি পুস্তকাদি পাঠে ও রচনায় প্রবৃত্ত হন। কালক্রমে তিনি আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন।

আবদুল হাকিম চাকরির সন্ধানে কলকাতা গেলে অচিরেই তিনি ডাক্তার মোহাম্মদ শফির ছাপাখানায় একটি চাকরি পেয়ে যান[৮]। এ প্রেসে কাজ করার সময়েই 'তিনি আজ্ছারুর ছালাত', 'শরিয়তুল মোসলেমিন' ও 'মসলা-মসায়েল' পুঁথিগুলি রচনা ও প্রকাশ

করেন। এই পুঁথিগুলি বেশ সমাদর লাভ করে। 'এশকে জওহর', 'এশকে গোলজার' ও 'অলকা সুন্দরী' নামক আরও তিনখানি পুঁথি রচনা করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন"।[৭২]

কালক্রমে তিনি সাংবাদিকতার দিকে আকৃষ্ট হন। সাংবাদিক শেখ আবদুল রহিম ও মোহাম্মদ রেয়াজদ্দিন আহমদ-এর কাছে তিনি সাংবাদিকতার শিক্ষালাভ করেন। তিনি মুনশী শেখ আবদুর রহিম পরিচালিত "মোসলেম হিতৈষী" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী ফাজেল এন্ড সন্সের সহায়তায় "ইসলাম দর্পণ" নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন। কয়েক বছর চলার পর এ পত্রিকাখানি বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে মওলানা রুহল আমিন সাপ্তাহিক "হানাফী" পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করলে আবদুল হাকিম-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু পত্রিকাটির আর্থিক অসুবিধার দরুন মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। তিনি 'মোসলেম' ও বঙ্গনূর' পত্রিকারও সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন।

আবদুল হাকিম ফুরফুরার পীর মওলানা আবুবকরের সঙ্গে নানা স্থানে ওয়াজ মহফিলে যোগদান ও বক্তৃতা করেন। ১৯২৮ সালে তিনি আঞ্জুমানে ওয়াজিনে বাংলার সম্পাদক নিযুক্ত হন। দীর্ঘদিন তিনি জমিয়াতে ওলামায়ে বাঙলার সম্পাদক ছিলেন। এভাবে ইসলাম প্রচারক হিসেবে তিনি মুসলমান সমাজের যথেষ্ট খেদমত করেন।

শেরে-বাংলা ফজলুল হক-এর উৎসাহে আবদুল হাকিম রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং ১৯৩০ সালে 'নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি'-র কার্যকরী সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ড ও জেনারেল কমিটির সদস্য ছিলেন। বিভাগ পূর্বকালেই তিনি নীতিগত কারণে মুসলিমলীগ থেকে বের হয়ে আসেন এবং রাজনীতি থেকে অবসরগ্রহণ করেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত আবদুল হাকিম দেশের বাড়িতে অবস্থান করেন। ১৯৫৭ সালের ৮ই জানুয়ারি তিনি জান্নাতবাসী হন।

আলি হাসান সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি ফেকাহ্ পুস্তক মসলা শিক্ষা (১৯১৪) ও 'শেষনবী' (১৯১৫) নামক জীবনী গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন।

ইতিমধ্যে আমরা কয়েকজনের অনূদিত কুরআন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। মওলবী নইমুদ্দীন তাঁর অনুবাদ শেষ করার আগেই এন্তেকাল করেন। খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিমের অনুবাদ তখনো সমাপ্ত হয় নি। মওলানা রুহল আমিন সবেমাত্র আমপারা (১৯১৮) অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র মওলানা আব্বাছ আলির অনুবাদই শেষ হয়েছে (১৯০৫-১৯০৯)। খ্রিস্টান পাদ্রি উইলিয়ম গোল্‌ড্‌স্যাক কর্তৃক ইসলাম ও কুরআন বিরোধী টীকা-টীপ্পনী সমেত অনূদিত কুরআন

সবেমাত্র বাজারে বেরিয়েছে। তখনকার বইয়ের দোকানের বিজ্ঞাপনগুলির প্রতি চোখ বুলালে সবগুলোর মধ্যে গিরিশচন্দ্রের বঙ্গানুবাদের বিজ্ঞাপনের সংখ্যাই বেশি পরিদৃষ্ট হয়। এ সব অনুবাদ পরীক্ষা করার পর মওলবী আবুল হাকিম ও আলি হাসান কুরআন অনুবাদে ব্রতী হন। তাঁদের মতে তৎকালে :

> বঙ্গদেশের প্রায় তিন কোটী বাঙ্গলা ভাষাভাষী মুসলমানের পড়িবার ও বুঝিবার উপযোগী একখানিও বিশুদ্ধ অনুবাদ অথবা উৎকৃষ্ট তফসীর এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। জনৈক ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীর ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ, দুর্ব্বোধ্য মন্ত্রবৎ-অস্পষ্ট অনুবাদ এ পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানের একমাত্র অবলম্বন হইয়া রহিয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের মধ্যে যাহারা কোরান শরিফের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন— বাঙ্গলা ভাষায় উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের অনুবাদ সেরূপ বিশুদ্ধ, সরল ও সহজবোধ্য হইতেছে না। ভাষায় দৈন্য ও ভাব-প্রকাশের অক্ষমতা হেতু ঐ সকল গ্রন্থে কোরান শরিফের স্বর্গীয় উপদেশ ও বিশ্ব-হিতকর শিক্ষার আদর্শ আদৌ পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। পক্ষান্তরে উচ্চ-শিক্ষিত ও নব্য-তান্ত্রিক ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে দুই একজন এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁদের অনুবাদ আরও জটিল, দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। শুধু ভাষা ও ভাব প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'ব্রাকেটে'র বেড়াজালে রাশি রাশি অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ করায়, তাঁহাদের গ্রন্থে কোরান শরিফের প্রকৃত উক্তি ও মূল শিক্ষা একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। মহান আল্লার পবিত্র বাণী বিশুদ্ধ সরল ভাষায় এবং সহজভাবে বুঝাইয়া দিতে কেহই সমর্থ হন নাই। ফলত: এ পর্য্যন্ত পবিত্র কোরান শরিফের যে সকল অসম্পূর্ণ অনুবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে ভাষার দুর্ব্বোধ্য জড়তা ও অস্পষ্ট হেঁয়ালী এবং ভাব-প্রকাশের অক্ষমতা ও কষ্ট কল্পনা যেন জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য যাঁহারা এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য, পরিশ্রম ও সাধনা প্রশংসনীয় হইলেও — কোরান শরিফের অনুবাদ ঠিক যেরূপ হাওয়া উচিত ছিল, তাঁহারা যে কেহই সেরূপ করিতে সমর্থ হন নাই— একথা বলিলে বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

এই তো গেল অনুবাদের কথা। তাফসিরের অবস্থা ছিল "আরও শোচনীয়"। এ সম্বন্ধে অনুবাদকদের বক্তব্য হলো :

> কোরান শরিফের তফসীরের অবস্থা আরও শোচনীয়। বাঙ্গলা ভাষায় কোরান শরিফের দুই-এক পারা তফসীর যাহা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে জ্ঞান-গবেষণা ও চিন্তা-চালনার পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়। কেহ বদ্ধমূল অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বশত: বর্ত্তমান উন্নতিশীল জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-ধারা সযত্নে বর্জ্জন করিয়া অন্ধযুগের পরিকল্পিত অসম্পূর্ণ মতবাদ ও অনৈতিহাসিক বিক্ষিপ্ত কাহিনীর পুনরুক্তি করিয়া স্ব স্ব তফসীর অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

> কেহ বা কাল-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শুধু অবিশ্বাস ও কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আল্লার কালামের অর্থ ও মর্ম বিকৃত করিয়া সরল বিশ্বাসী লোকদিগকে পথভ্রান্ত করিতেছেন। অনেকের রচিত গ্রন্থ আবার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা এবং পরমতা-বিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।

কুরআন অনুবাদ ও তফসির রচনায় এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে আবদুল হাকিম ও আলি হাসান-এর পর্যবেক্ষণ হলো অনুবাদকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণের অভাব। তাঁদের ভাষায় :

> কোরান শরিফের অনুবাদ-কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, যে সকল যোগ্যতা ও গুণের সমাবেশ থাকা অত্যাবশ্যক— তন্মধ্যে আরব্য ভাষার গতি, প্রকৃতি, অর্থ-মর্ম্ম ও ভাব-প্রকাশ-ভঙ্গিমা এবং অনূদিত ভাষার রচনা-পদ্ধতি, বাক্য-বিন্যাস শব্দ গঠন, ধাতু-প্রত্যয় ও ব্যঞ্জনা দ্যোতনা সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান ও যথেষ্ট অধিকার থাকা— আমরা একান্ত অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে করি। সুতরাং বিশেষ প্রতিভাশালী অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত মামুলী ধরণের আলেম অথবা সাধারণ শিক্ষিত লোকের দ্বারা এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। সেই জন্যই প্রচলিত অনুবাদ ও তফসীর সমূহে এই সকলগুণের সমাবেশ অথবা বিকাশ আদৌ পরিলক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থ জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্থায়িত্ব লাভ করিবে বলিয়াও আশা করা যাইতে পারে না।

উপর্যুক্ত কারণে তাঁহারা "একখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর সরল ও বিশদ্ধ বঙ্গানুবাদ এবং সর্বসাধারণের বুঝিবার উপযোগী সহজবোধ্য তফসীর প্রণয়নে" হস্তক্ষেপ করেন। তাঁদের অনুবাদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন :

> আমরা আরবীর অনুবাদ কালোপযোগী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও উন্নত পন্থা অবলম্বন করিতে যত্নবান হইয়াছি। ইহাতে সর্ব্বত্রই মূল আরবী আয়ত পার্শ্বে রাখিয়া — বন্ধনীর বিভীষিকার মধ্যে একটীও অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার না করিয়া আরবী আয়ত ও শব্দের সংখ্যানুপাতে তুল্য-মর্ম্ম ও সম-ওজনের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়া বাক্য গঠন করা হইয়াছে। অনূদিত পদ-বিন্যাসে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা রচনা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইলেও আরবী আয়তের প্রকৃতি বজায় রাখিয়া যাহাতে কোরান-বাণীর অর্থ বা মর্ম্মের একটুও ব্যতিক্রম অথবা বিকৃত না হয়, তৎপ্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিয়াছি ; অথচ ভাষা যতদূর সম্ভব সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও মধুর করা হইয়াছে। আমাদের অনুবাদ-পদ্ধতি ও রচনা-কৌশলের বিশেষত্ব ইন্‌শা-আল্লাহ কোরান শরিফের বিস্তৃত ভূমিকায় বিশেষরূপে বিশ্লেষিত হইবে।
>
> অনুবাদের সহিত তফসীর অর্থাৎ ভাষ্য-সঙ্কলনেও আমাদিগকে সম্পূর্ণ অভিনব পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কোনরূপ সংস্কার-বশে প্রাচীন তফসীর সমূহের মধ্যে যে সকল সিদ্ধান্ত অযৌক্তিকর ও বর্জ্জনীয় তাহা নির্ভয়ে বর্জ্জন করিয়াছি

> এবং যাহা যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণীয় তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছি ; সেইরূপ আধুনিক তফসীর সমূহের যে সকল স্থানে শুধু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, সত্য-গোপন প্রচেষ্টা ও কল্প-কল্পনার কুহেলিকা আছে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া উহার গবেষণামূলক যুক্তিপূর্ণ আলোচনাগুলি সাদরে গ্রহণ করা হইয়াছে। যেখানে মতভেদের সহিত অনিশ্চয়তা বিদ্যমান, সেখানে আবশ্যকানুসারে উভয়বিধ মতই সঙ্কলিত করিয়া দিয়াছি। ফলত: আমাদের তফসীর-অংশকে প্রাচীন ও আধুনিক তফসীরের সংক্ষিপ্ত সমন্বয় বলিলেও বলা যাইতে পারে।
>
> আমরা যে সকল বিশেষত্ব লইয়া এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত আভাষ প্রদান করিলাম। অবশ্য আমরা ভ্রমেও এমন দাবী করিতেছি না যে, আমরাই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। অপরের ন্যায় আমাদের মধ্যেও সহস্র দোষ-ত্রুটি বা অক্ষমতা থাকিতে পারে এবং তাহা থাকাই স্বাভাবিক। সেই জন্য আমরা আমাদের সাধনার ফলস্বরূপ "কোরান শরিফের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসীরের বিচার-ভার আমাদের শ্রদ্ধেয় ওলামা ও শিক্ষিত সমাজের উপর অর্পণ করিলাম।" বলা বাহুল্য, আমরা তাঁহাদের কর্ত্তব্য-ভার মাথায় করিয়া তাঁহাদেরই দ্বারে উপস্থিত করিতেছি। তাহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের ভুল-ত্রুটি নির্দেশ করিয়া দিলে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত সেগুলি করিতে যত্নবান হইব[৭৩]।

আল্লাহর "কালাম ও রসুলুল্লাহর তোহ্ফা", "লোক সমাজের ঘরে ঘরে প্রচার" করার উদ্দেশ্যে "অতি অকিঞ্চিৎকর শক্তি সামর্থ্য" নিয়ে অনুবাদকদ্বয় "এই বিরাট কাজে হাত দেন। এজন্য তাঁদের "বহু মূল্যবান তর্জমা, তফসীর ও অন্যান্য গ্রন্থ" সংগ্রহ করতে হয়। হাজার হাজার টাকা খরচ করে স্বতন্ত্র ছাপাখানার জন্য "নূতন নূতন ব্লক ও টাইপ" আমদানি করতে হয়।[৭৪] এ কাজ ছিল অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য।

অনুবাদটি প্রকাশিত হলে তা খুবই জনপ্রিয় হয়। দেশের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুবাদটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। শেরে-বাংলা ফজলুল হকও এর একটি কপি সংগ্রহ করেন। তৎকালে তিনি ছিলেন বঙ্গদেশের শিক্ষা ও প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন[৭৫] :

> কোরান শরীফের এই বঙ্গানুবাদ ও তফসীরখানি অতি উৎকৃষ্ট এবং শিক্ষিত সমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় কোরান শরিফের একখানি উৎকৃষ্ট অনুবাদ ও তফসিরের অভাব চিরদিন অনুভব করিয়া আসিতেছি ; এতদিনে সেই অভাব পূর্ণ হইল দেখিয়া আমি সত্যই আনন্দ অনুভব করিতেছি। আলোচ্য গ্রন্থখানির অনুবাদ বিশুদ্ধ এবং ভাষা সরল ও মার্জ্জিত হইয়াছে। তফসীর ভাগ বিশেষ গবেষণামূলক হইলেও বেশ পরিস্ফুট ও সহজবোধ্য।

আল্লামা ডক্টর স্যার আবদুল্লাহ্-আল-মামুন সোহরাওয়ার্দী বলেন, "এই তফসীরখানি যে বাঙলা ভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের একটি স্থায়ী সম্পদ ও গৌরবের জিনিস হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই"[৭৬]। ফুরফুরার পীর আবুবকর এর তরজমা 'সহিহ' ও তফসির "খুব

ভাল হইয়াছে" বলিয়া মন্তব্য করেন।[৭৭] মৌলবী খোন্দকার আন্‌ওয়ার আলি "ব্রাকেটের মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ না লিখিয়া পবিত্র কোরানকে [যে] তহরীফ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে"— এজন্য প্রশংসা করেন।

মওলানা মোহাম্মদ মোয়েজদ্দীন হামিদী ছিলেন মওলানা রুহুল আমিনের মুরিদ ও খলিফা। রুহুল আমিনের তরজমা ইতিধ্যেই প্রকাশ লাভ করেছে। কজেই নিশ্চয়ই তিনি মওলানা আমিনের তরজমা পাঠ করে থাকবেন। তিনি হয়তো অন্যান্য তরজমাও ইতিমধ্যে দেখেছেন। আবদুল হাকিম ও আলি হাসানের তরজমা বের হলে তিনি তুলনামূলকভাবে এটিকে "সর্বশ্রেষ্ঠ" বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে "অনুবাদের বিশুদ্ধতা ও মৌলিক সৌন্দর্য্য তফসীরের গবেষণা ও প্রাচুর্য্য, ভাষার উচ্ছ্বসিত অতুলনীয় ঝংকার এবং ভাবের অনুপম প্রাণ–মাতান মাধুর্য্যের জন্যই ইহা সর্ব্বাংশে অতুলনীয় হইয়াছে"[৭৯]।

অনুবাদটির বৈশিষ্ট্য হলো মূল কুরআনের আয়াতমালার পার্শ্বে সংখ্যাসহ বাংলা অনুবাদ এবং নিম্নে পাদটীকায় বিস্তৃত তফসির ; এতে পড়তে বা অর্থ বুঝতে কারো বেগ পেতে হয় না। তফসির বা ব্যাখ্যাংশে তৎকালে অনূদিত ও প্রাপ্তব্য জর্জ সেল, রডওয়েন, পামার, মুহম্মদ আলী প্রমুখের ইংরেজি, স্যার সৈয়দ আহমদের উর্দু অনুবাদ ও তফসিরের যুক্তিসম্মত সমালোচনা করে পবিত্র কুরআনের গৌরব ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে। এতে সর্বত্রই মূল আরবি আয়াতের পাশে রেখে বন্ধনীয় মধ্যে একটিও অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার না করে— আরবি আয়াত ও শব্দের সংখ্যাপাতে তুল্য–মর্ম ও সমওজনের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করে বাক্য গঠন করা হয়েছে। অনূদিত বাক্য রচনায় বিশুদ্ধ বাংলা রচনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হলেও এতে কুরআনের বাণীর অর্থ ও মর্মের একটুও ব্যতিক্রম বা বিকৃতি ঘটে নি।

অনুবাদটির প্রথম পারা প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে। অনুবাদকদ্বয়ের পরিকল্পনা ছিল প্রতিমাসে একপারা এই হিসেবে তিন বছরের মধ্যে অনুবাদ সমাপ্ত করা। কিন্তু তা সম্ভম হয় নি। দীর্ঘ ষোল বছর পরে অনুবাদের কাজটি ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেষ হয়। আর অনুবাদের সম্পূর্ণ অংশ মুদ্রিত করতে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় লাগে। ফলে, প্রকৃতপক্ষে অনুবাদের কাজটি সতের বছরে সম্পন্ন হয়।

অধ্যাপক আবদুল হাই–এর মতে হাকিম ও হাসান–এর অনুবাদটি " এ যাবৎ প্রকাশিত কোরআন শরীফের বাংলা অনুবাদগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ"[৮০]। সম্ভবত এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। অনুবাদটির প্রথম প্রকাশক ছিলেন হাফেজ মোহাম্মদ ফাজেল। অনুবাদটির প্রথম পাবার আখ্যাপত্র ছিল নিম্নরূপ :

> [আরবি] ফাইন্নামা ইস্‌সার নাহু বেলিসানিকা লায়াল্লাহুম ইয়াতাজাক্কারুন/ অনন্তর এইজন্য আমি উহা (কোরান শরিফ) তোমার ভাষায় সহজ করিয়াছি, যেন তাহারা বুঝিতে পারে। —কোরান/কোরান শরিফ/মূল আরবিসহ/ বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসীর/ ১ম পারা /মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও মোহাম্মদ আলি হাসান/অনূদিত ও সঙ্কলিত / প্রকাশক :— মোহাম্মদ ফাজেল এণ্ড সন্স/ ৪৭ নং রিপন স্ট্রীট, কলিকাতা। /মূল্য [চৌদ্দ] আনা/ এজেন্ট এফ. আহম্মদ এণ্ড ব্রাদার্স ৭৮ নং মৌলবী বাজার, ঢাকা।

অনুরূপভাবে প্রতিটি পারারই একটি প্রচ্ছদপত্র ছিল। প্রথম পারার প্রচ্ছদ পত্রে '১ম' –এর মুদ্রণ প্রকৃতি দেখেই সহজে ধরা যায় যে— প্রচ্ছদগুলো ১ম, বা ২য় বা ৩য় ইত্যাদি বাদ দিয়ে মুদ্রিত করা হয়েছিল। পরে এতে, ১ম, ২য় ইত্যাদি বসিয়ে দেয়া হয়।

কলকাতাতে যখন (১৭৭৮) আরবি মুদ্রণ প্রচলিত হয় তখন সর্বপ্রথম নাস্‌তালিক লিপি ব্যবহৃত হয়। এ মুদ্রণের জনক চার্লস উইলকিন্স টাইপের মাধ্যমে এ–জাতীয় মুদ্রণের অক্ষর তৈরি করা খুবই কষ্টসাধ্য বলে তিনি ইংল্যান্ডে গেলে তথায় নাস্‌খ পদ্ধতির মুদ্রাক্ষর তৈরি করেন। পরে আলাদা আলাদাভাবে অক্ষর তৈরির প্রথা প্রচলিত হয়। আরবি একই বর্ণ শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে বসলে তিন প্রকার রূপ ধারণ করে। এগুলো যুক্ত করে মুদ্রণের সময় অনেক অক্ষর পড়ে যায়। আবার সমতার অভাবে অনেক শব্দ অস্পষ্ট মুদ্রিত হয়। সেজন্য আরবি, বিশেষত কুরআন মুদ্রণের ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ লিথো মুদ্রণ ব্যবহার করে। এ প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথম কোনো না কোনো কাতিবকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে হয়। পরে এ লেখাই সরাসরি মুদ্রণপাতে বদলি করে মুদ্রিত করতে হয়। এ প্রক্রিয়ায় মুদ্রণ আক্ষরিক মুদ্রণের চেয়ে ব্যয় সাপেক্ষ। সেজন্য তৎকালে কলকাতা ও ঢাকার মুদ্রাকরগণ লেটার প্রেসেই নাস্‌খ পদ্ধতির মুদ্রাক্ষরে কুরআন মুদ্রিত করতেন। এগুলোই সাধারণত কলকাতার ছাপ নামে পরিচিত ছিল কিংবা এখনও আছে। ফাজেল এন্ড সন্স যখন আবদুল হাকিম ও আলি হাসানের কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করে তখন আরবি অংশও লেটার প্রেসেই ছাপা হয়। ফলে, অনুবাদ ও তফসির যত ভালোই হোক এর আরবি মূলে অসংখ্য মুদ্রণপ্রমাদ থেকে যায়।

১৯৩৮ সালে সমাপ্তিকৃত এ অনুবাদটি খুবই জনপ্রিয় হয়। ফলে সম্ভবত বিভাগপূর্ব কালেই এর কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দেশবিভাগের পর উভয় অনুবাদক কলকাতা ছেড়ে বাংলাদেশে চলে আসেন। এখানে চলে আসার পর এঁরা উভয়ে একত্রে উক্ত অনুবাদটি আর প্রকাশ করতে পারেন নি। আবদুল হাকিম ও আলি হাসানের মধ্যে এ অনুবাদ সম্বন্ধে যে দলিল হয়, তাতে নাকি তাঁরা ইচ্ছা করলে একত্রে বা পৃথক পৃথকভাবে অনুবাদ প্রকাশের অধিকার পান। ফলে, ঢাকার ওসমানিয়া বুক ডিপো আলি–হাসানের অধিকার সূত্রে কুরআন শরিফের উক্ত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে আসছে। অনুরূপভাবে আবদুল হাকিমের পক্ষে ঢাকার 'কোরআন মঞ্জিল' প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান থেকে অনুবাদখানা প্রকাশিত হতো। ঢাকায় সর্বপ্রথম উক্ত অনুবাদখানি আবদুল হাকিমের নামে 'দার–উল কোরআন' নামক প্রতিষ্ঠান ১৯৫৬ সালে প্রকাশ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'কোরআন মঞ্জিল'–এর নাম মুদ্রিত হতে থাকে। অন্যদিকে আলি হাস্যানের নামে অনুবাদখানির প্রথম পারা 'ওসমানিয়া বুক ডিপো' সর্বপ্রথম ১৯৫৭ সালে প্রকাশ করে। তদুপরি মূল প্রকাশস্থল কলকাতাতেও অনুবাদটির প্রকাশ অব্যাহত থাকে। অধ্যাপক আলী আহ্‌মদের সংবাদানুযায়ী ১৯৬৭/৬৮ সালে কলকাতার কোরআন প্রচার অফিসে এ অনুবাদখানি একত্রে ৪৫ টাকায়, দু' খণ্ড ৪৩ টাকায়, পৃথক পৃথক পারা ১ টাকা ২৫ পয়সা হারে বিক্রি হতো[৮১]। এভাবে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক অনুবাদখানি মুদ্রণের ফলে অনুবাদের মূল ভাষ্যের পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা। এ বিষয়ে প্রতিটি প্রকাশকেরই সম্মিলিতভাবে দেখা উচিত যেন অননুমোদিত

ভাবে অনুবাদের ভাষা মূল থেকে সরে না যায়। যাহোক, আবদুল হাকিম ও আলি হাসান উভয়েরই ইচ্ছা ছিল তাঁদের অনূদিত গ্রন্থটি যেন "জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্থায়িত্ব লাভ করে"[৮২]। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল যাবৎ সমভাবে জনপ্রিয়তার দরুন এ কথা বলা চলে যে, অনুবাদকদ্বয়ের আশা পূর্ণ হয়েছে।

সৌদি আরবে মক্কা আল্ মুকাররামায় রাবিতা আল-আলামে ইসলামী ঐ দেশে অবস্থান ও কর্মরত অসংখ্য বাঙালির জন্য কুরআন শরিফের একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত প্রতিষ্ঠান নতুন করে কোনো অনুবাদ প্রকাশ না করে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সবক'টি অনুবাদ পরীক্ষা করে আবদুল হাকিম ও আলি হাসানের অনুবাদখানি সর্বদিক থেকে উৎকৃষ্টতম বলে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু, চিরাচরিত প্রথায় এটিকে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রণের ব্যবস্থা না করে আরবি হরফে মুদ্রণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। ফলে, এটি আরবি হরফে মুদ্রিত হয়। এক পৃষ্ঠায় আরবি মূল অন্য পৃষ্ঠায় বঙ্গানুবাদ ও তফসির এই নিয়মে এটি মুদ্রিত হয়। পৃষ্ঠাগুলোতে অনুবাদকদ্বয়ের ভূমিকা ও রাবিতা-র সেক্রেটারি জেনারেলের ভূমিকা এবং আরবি প্রতিবর্ণায়নের একটি তালিকা আছে। আরবি হরফে মুদ্রিত এ অনুবাদখানি পড়লে দেখা যাবে যে, প্রতিবর্ণায়ন অতীব ত্রুটিপূর্ণ। মুদ্রিত গ্রন্থে কোনো তারিখ নেই। তবে সম্ভবত এটি ১৯৮৪ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়ে থাকবে।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)[৮৩] একাধারে সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও ইসলামবিদ হিসেবে শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র ভারত উপমহাদেশে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তিনি ২৪ পরগনার হাকিমপুর গ্রামের আলহাজ গাজী মওলানা আবদুল বারীর পুত্র। তাঁর মাতার নাম ছিল বেগম রাবেয়া খানম। মাতা-পিতার কাছে কুরআন, গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁ পড়ার পর খাঁ সাহেব কলকাতার মাদ্রাসা আলিয়ায় পড়াশুনা করে ১৯০০ সালে ফাইনাল মাদ্রাসা পাশা করেন। পড়াশুনার পর পরই মওলানা আকরম খাঁ বাঙালি মুসলমানদের অবস্থার উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। এদিক দিয়ে মওলানা ছিলেন আলীগড় আন্দোলনের নেতা স্যার সৈয়দ আহমদের ভাবশিষ্য। স্যার সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন আহবান করলে আকরম খাঁ এতে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলা ভাষায় প্রথম সমগ্র কুরআন অনুবাদক এবং বহুসংখ্যক ইসলামি গ্রন্থের অনুবাদক ও প্রণেতা ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারক গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আকরম খাঁর পিতার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। আবদুল বারী তাঁর পুত্র আকরম খাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে যেতেন। এহেন পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে নিশ্চয়ই আকরম খাঁ বাল্যকাল থেকে গিরিশচন্দ্র কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত কুরআন পাঠ করে থাকবেন। এর দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৯২) একটি কপিও আকরম খাঁ-র সংগ্রহে ছিল। সম্ভবত তিনি গিরিশচন্দ্রের একজন ভক্ত ছিলেন। সেজন্যই ১৯৩৬ সালে গিরিশ সেনের অনুবাদের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশকালে তিনি "শ্রদ্ধা নিবেদন" আখ্যায় এটির একটি মুখবন্ধে গিরিশচন্দ্রকে তাঁর "গুরু" ও অগ্রপথিক বলে এবং তার অনুবাদকে জগতের "অষ্টম আশ্চর্য্য" বলে সম্মান

প্রদর্শন করেন[৮৪]। সম্ভবত গরিশচন্দ্র সেনই ছিলেন মওলানা আকরম খাঁর কুরআন চর্চা এবং কুরআন অনুবাদে অনুপ্রেরণার উৎস।

পড়াশুনা শেষ হলেই আকরম খাঁ সংবাদপত্র প্রকাশ করে সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশ সেবার সংকল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ও সামর্থ এ দু'টিরই অভাব ছিল। তথাপি তিনি "কাগজ বাহির করার বাতিকে কলিকাতার রাস্তায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিয়া বেড়াই"-তে থাকেন। শিয়ালদহের তৎকালীন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার (১৯৩২) মৌলবী কাজী মোহাম্মদ খায়রুল আনাম ছিলেন আকরম খাঁ-র "সহপাঠি ও বাল্য-বন্ধু"। সেজন্য তাঁর পিতা মৌলবী আবদুল খালেক আকরম খাঁ-কেও "পুত্রবৎ স্নেহ করতেন।" ঘটনাক্রমে মৌলবী আবদুল খালেকই প্রথম বাঙালি মুসলমান, যিনি রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সময় (১৮৭৭-৭৮) "মোহাম্মদী" নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পরেই বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত আবদুল খালেক মওলানা খাঁ-কে "মোহাম্মদী" নামে পুনরায় একটি কাগজ বের করতে অনুপ্রাণিত করেন এবং তাঁর 'মোহাম্মদী'-র ফাইলটিও স্নেহের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ" তাঁকে উপহার দেন[৮৫]।

তৎকালে পত্র-পত্রিকা কিংবা পুস্তক প্রকাশ অত সমজ ছিল না। এ জাতীয় যে কোনো উদ্যোগের প্রথম শর্তই ছিল একটি মুদ্রাযন্ত্র। বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে এর প্রমাণ সর্বত্র। একটি প্রেসের প্রতিষ্ঠা করা ছিল আকরম খাঁ-র সামর্থ্যের অতীত। সৌভাগ্যবশত হাজী আবদুল্লা নামে কুষ্টিয়ার এক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির কলকাতার হক লেনে একটি প্রেস ছিল। সেখানে থেকেই তিনি সর্বপ্রথম মাসিক হিসেবে 'মোহাম্মদী' প্রকাশ করতে থাকেন।। প্রথমে কথা ছিল, হাজী আবদুল্লা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন আর আকরম খাঁ "প্রেসে যাওয়া আসা" করবেন। "কিন্তু, সময়কালে তিনি [সম্পাদকীয় লিখতে] অস্বীকার করেন। কাজেই" তাঁকেই (আকরম খাঁ-কে) সম্পাদকীয় লিখতে হয়[৮৬]। পত্রিকাটির প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা ১৯০৩ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা যথাক্রমে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর ১৯০৩ সালে বেরোয়। কিন্তু, পরবর্তী অর্থাৎ পঞ্চম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালের জানুয়ারি মাসে। পত্রিকাটির প্রথম দুই সংখ্যা ডিমাই বারপেজী ও পরবর্তী তিন সংখ্যা ডিমাই আটপেজী আকারে বেরোয়। সাধারণত প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৬। কিন্তু তৃতীয় সংখ্যাটি ছিল ৬৭ পৃষ্ঠার। প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা হলেও এটির (৩য় সংখ্যার) মূল্য ছিল চার আনা। পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী ছিলেন হাজী আবদুল্লা, সম্পাদক আকরম খাঁ আর মুদ্রাকর করিম বখ্‌শ ও আব্বাছ আলি। এভাবে পাঁচ-পাঁচটি সংখ্যা বের হওয়ার পরই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়[৮৭]। তারপর "কতক বৎসর যাবৎ 'মোহাম্মদী' মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক আকারে অনিয়মিতরূপে প্রচারিত হয়। ... অতঃপর কিছুকাল বন্ধ থাকার পর, ১৯১০ সাল হইতে সম্পূর্ণরূপে ...[আকরম খাঁ-র] তত্ত্বাবধানে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়"[৮৮]। পরবর্তীকালে তিনি দৈনিক সেবক, উর্দু জমানা ও অবশেষে দৈনিক আজাদ (১৯৩৬) পত্রিকা প্রকাশ করেন।

আকরম খাঁ-র মতে, ইহ-পরকালের প্রতিটি কাজে মুসলমানদের প্রধান সম্বল কুরআন। কুরআনের সম্মান ও সেবা করেই মুসলমানেরা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। কিন্তু, তিনি লক্ষ্য করেন যে, সুন্দর ছাপা, সুন্দর বাঁধাই, সুন্দর যুজদান ও রেহেল সহ লক্ষ লক্ষ কপি ক্রয়ের মাধ্যমেই বঙ্গদেশের মুসলমানেরা কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন ; অথচ কুরআনের শিক্ষাগুলোকে আয়ত্তে আনাই হলো কুরআনের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন। তাই অন্ধ বিশ্বাস পরিহার করে কুরআনকে বাঙালি মুসলমাদের সামনে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করার আকাঙ্ক্ষা ছিল আকরম খাঁ-র আজন্ম[৮৯]। এ জন্যই সম্ভবত প্রকল্পিত কুরআন-অনুবাদে তিনি মওলানা আব্বাছ আলির সহযোগী হন। কিন্তু-এর প্রথম পারার পর এ কাজ থেকে বিরত হয়ে সার্ব্বক্ষণিকভাবে সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন। সাংবাদিকতায় প্রতিষ্ঠা লাভের পরই তিনি মাতৃভাষায় ইসলামের শিক্ষা প্রচারকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন।[৯০] এ কাজের প্রথম পদক্ষেপস্বরূপ তিনি রচনা করেন "কোরআনের দুইটি আদর্শ"। তাঁর এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় **আল-এসলাম** পত্রিকার এপ্রিল ১৯১৫ সালে। তাঁর মতে কুরআনে দু'টি আদর্শ আছে; একটি হলো সৎ অন্যটি হলো অসৎ। কুরআন এতদুভয়ের প্রভেদ বিশ্লেষণ করে। কুরআনের এ ভাল এবং মন্দ দু'টি আদর্শ ব্যাখ্যার জন্যই দরকার কুসংস্কার বর্জিত, বিজ্ঞানভিত্তিক একটি তফসির। কিন্তু, বাঙালি আলেমদের "আরবী ভাষা-জ্ঞানের অভাব" থাকায় "স্বাধীন গবেষণা করার ক্ষমতা নাই"। অতএব "সেকালের কয়েকজন ভাষ্যকার বা মোফাস্‌সেরদের ব্যাখ্যা ও "উর্দু ফারসী ও আরবী ভাষায় কেতাবের কোন কথা লিখিত" থাকলেই তা কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ এক প্রকার রেওয়াজে পরিণত হয়েছে"[৯১]। অতএব, আকরম খাঁ নিজের এ কাজেই আত্মোৎসর্গ করতে মনস্থ করেন।

আকরম খাঁ তরজমা ও তফসির রচনা শুরু করেন সুরা ফাতিহা থেকে। তাঁর "সুরা ফতেহা"-র "বঙ্গানুবাদ" ও ভাষ্য সর্বপ্রথম ১৯১৮ সালে **আল-এসলাম** পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে তিনি الحمد। (আল-হাম্‌দ) এর অনুবাদ করেন "কৃতজ্ঞতা" । তিনি বলেন "বাংলা অনুবাদকেরা সাধারণত : 'হামদ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন— প্রশংসা। কিন্তু আমার মতে, কৃতজ্ঞতাই এ ক্ষেত্রে ঠিক শব্দ"[৯২] । তাঁরই সহযোগিতায় মওলানা আব্বাছ আলি যে অনুবাদ করেন তাতে 'হামদ' শব্দের অর্থ 'প্রশংসা'-ই করা হয়েছে[৯৩] । সম্ভবত এ ধরনের মতনৈক্যের কারণেই উভয়ে সম্মিলিতভাবে কুরআন অনুবাদে সক্ষম হন নি।

'মওলানা'-র 'সুরা ফাতেহা' বঙ্গানুবাদের পর সকলেই হয়তো আশা করেছিলেন যে, তাঁর অনুবাদ ও তফসিরের কাজ অব্যাহত গতিতেই চলবে। কিন্তু, ইতিমধ্যে তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (দ:)-এর জীবনচরিত রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং "দুই বৎসরের অবিরাম পরিশ্রমের ফলে 'মোস্তফা রচিত' নামে হজরতের জীবনীর প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করেন।

মোস্তাফা চরিত "রচনায় অব্যবহিত পরে [হি] খেলাফৎ ও তার্কে মওলাত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়" এবং অবস্থার চরম শোচনীয়তা দর্শনে বিচলিত হয়ে তিনি

গ্রন্থাগার পরিত্যাগ করে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। সরকার অন্যান্য নেতাদের সাথে তাঁকেও এক বছরের জন্য কারাগারে প্রেরণ করেন। কারাগারের প্রাথমিক অসুবিধা ও অশান্তি কেটে যাওয়ার পর এবং সেখানে তাঁর শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হওয়ার পরপরই আকরম খাঁ "নিজের আজীবনের সাধনায় ব্রতী" হয়ে কয়েক মাসের অবিরাম পরিশ্রমের ফলে আমপারার অনুবাদ শেষ করতে সমর্থ হন [৯৪]।

১৯২২ সালে সমাপ্ত আমপারার এ অনুবাদটি আকরম খাঁ 'কারাগারের' সওগাত হিসেবে শিক্ষিত মুসলমান যুবকদেরকে উৎসর্গ করেন। আমপারায় কুরআনের ৭৮ সংখ্যক সুরা থেকে ১১৪ সংখ্যক সুরা অন্তর্ভুক্ত। কুরআন শরীফে এই সুরাগুলো উক্ত সংখ্যায় ক্রমিকভাবে সাজানো আছে। কিন্তু আমপারার প্রকাশকগণ সম্পূর্ণ উল্টাভাবে সাজিয়ে থাকেন। মওলানা আকরম খাঁ-র অনুবাদেও এ ব্যবস্থাই বহাল আছে। এতে সুরা নাবা (সুরা সং ৭৮) সর্বশেষে আর সর্বশেষ সুরা নাস (সংখ্যা ১১৪)-কে সর্বপ্রথম আনা হয়েছে। অতঃপর সুরা ফাতেহা ৩০ পারার অংশ না হলেও আমপারার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে অনুবাদক বলেন : [৯৫]

> ফাতেহা, কোরআনের প্রথম পারার প্রথম সুরা। সুরা বকরের পূর্বেই ইহার স্থান। এ জন্য আমি প্রথমে আমপারার সহিত ইহার অনুবাদ করি নাই। শেষে কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে ইহার অনুবাদ ও ভাবার্থ মাত্র দেওয়া হইল। এই সুরা জানিবার ও বলিবার এত কথা আছে যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার স্থান সংকুলান হওয়াও অসম্ভব। এই সকল কারণে এখানে উহার টীকা ও তফছির দেওয়া হইল না। আল্লাহ শক্তি দিলে যথাস্থানে সেগুলি পাঠকগণের গোচরীভূত করার চেষ্টা করিব।

কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায়, অর্থাৎ ১৯২২ সালে সমাপ্ত হলেও সম্ভবত আমপারাটি ১৯২৩ সালের আগে প্রকাশিত হয় নি। আমরা যে পুস্তকটি পরীক্ষা করেছি তাতে প্রকাশের কোনো তারিখ নেই। এতে উৎসর্গে সেন্টাল জেল, আলিপুর, ১৯২২ সাল মুদ্রিত আছে। **সাম্যবাদী** ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় মোহাম্মদী বুক এজেন্সীর বইসমূহের বিজ্ঞাপনে এটি ছাপা হচ্ছে বলে বলা হয়েছে। কিন্তু এই পত্রিকাটি ৪র্থ সংখ্যায় (কার্তিক ১৩৩০) পুস্তকটি বিক্রয়ের জন্য মজুদ আছে বলে দেখানো হয়েছে। অতএব, ১৩৩০ (১৯২৩) সালের শ্রাবণ ও কার্তিক মাসের যে কোনো এক সময় এটি প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক ছোলতান (৮ : ২৮: ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩০ বা ৩০ নভেম্বর ১৯২৩ খ্রি:) এই আমপারার একটি সমালোচনা প্রকাশ করে। কিন্তু, এটি ১২ই এপ্রিল ১৯২৪ তারিখে রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্স-এ জমা দেয়া হয়। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমপারায় অন্তর্ভুক্ত সুরা ফাতেহার শেষে অনুবাদক এ সুরার একটি বিস্তারিত তফসির পাঠকদের গোচরীভূত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু, ইসলামি সংস্কৃতি ও ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য 'মাসিক মোহাম্মদী" সম্পাদনা, প্রকাশ ও প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য অনুবাদ ও তফসির রচনার কাজ সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হয়ে যায়।

সাময়িকভাবে স্থগিত হলেও মওলানা খাঁ তাঁর "জীবনের শেষ" কাজ— কুরআনের অনুবাদ ও তফসির রচনার পরিকল্পনা বাতিল করে দেন নি। অনুবাদ ও রচনার সঙ্গে সঙ্গে যাতে মুদ্রণ ও প্রকাশনা চলতে থাকে এবং অনুবাদের সঙ্গে মূল আরবি তেলওয়াতের যাতে সুবিধা হয় সেজন্য জার্মানি থেকে নতুন টাইপ আমদানি করেন। পরে ঐ টাইপেই মওলানার সমগ্র তফসিরের আরবি পাঠ ছাপা হয়। ঐ টাইপ এতো সুন্দর যে, ছাপার পর "মতন" টা উচ্চ শ্রেণীর পাথরের ছাপার মতই" (লিথো ছাপা) দেখায়।[৯৬]

ইতিমধ্যে 'মাসিক মোহাম্মদী'র অন্যান্য কাজের চাপ হ্রাস পেলে আকরম খাঁ পুনরায় অনুবাদ ও তফসিরের কাজে হাত দেন। ফলে 'আমপারা' অনুবাদের সাত বছর পর ১৯২৯ সালে তাঁর "উম্মল কেতাব বা ছুরা ফাতেহার তফসির" প্রকাশিত হয়। সর্বমোট ২৩ পৃষ্ঠা (২৪ সেন্টিমিটার) সংবলিত এ তফসিরটির মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ। প্রকাশকের মোহাম্মদী প্রেস, ২৯ সংখ্যক আপার সারকুলার রোড, কলকাতা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

ডক্টর মুজীবুর রহমান ১৯২৯ সালে প্রকাশিত "উম্মল কেতাব"-কে দ্বিতীয় সংস্করণ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। তাঁর মতের প্রমাণ স্বরূপ ১৯০৫ সালে মওলানা আকরম খাঁ ও মওলানা আব্বাছ আলি সমন্বয়ে ত্রি-ভাষিক আরবি, বাংলা ও উর্দুতে প্রকাশিত قران شريف -এর উল্লেখ করেছেন। এ প্রকাশনাটি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন অধ্যাপক আলী আহমদ [৯৭]। সম্ভবত মুজীবুর রহমান অধ্যাপক আলী আহমদের পাণ্ডুলিপি দেখে এতথ্য সংগ্রহ করেন। আর আলী আহমদ এ তথ্যটি সংগ্রহ করেন বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ থেকে। আমরা বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের সংলেখটি হুবহু নিচে তুলে দিচ্ছি[৯৮]।

> Tri Lingual BooKs, Arabic Musalmani, Bengali and Urdu books. قران شريف [Quran Sharif. The Holy Quran] Translated by Maulvi Mahammad Akram Khan. pp. 32 Maulvi Mahammad Abbas Ali. 3 Huk Lane . Calcutta . 17-8-05 SR 4 to1st. As 14. Printer and place of printing : Maulvi Mahammad Abbas Ali, 3 Huk Lane, Calcutta, 5000 copies. Copyright : Haji Abdulla, 26, Huk Lane, Calcutta.

উক্ত সংলেখ থেকে বোঝা যায় যে, পুস্তকটি মৌলবী আকরম খাঁ ও মৌলবী আব্বাছ আলি যৌথভাবে অনুবাদ করেন। সম্ভবত মুদ্রণের ভুলবশত পৃষ্ঠা সংখ্যাটি উভয় নামের মধ্যস্থলে এসে গেছে। কিন্তু পুস্তকটি ৩২ পৃষ্ঠায় "SR 4 to" অর্থাৎ Super Royal Quarto আকারের ছিল। এ জাতীয় পুস্তকের আকার হলো ১৩.৫ × ১০.৫ অর্থাৎ ৩৪×২৬ সেন্টিমিটার। কিন্তু ১৯২৯ সালে প্রকাশিত উম্মল কেতাবের আকার Royal octavo. ২৪×১৫ সেন্টিমিটার। কিন্তু উম্মল কেতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ২৩। কাজেই ১৯০৫ সালে প্রকাশিত পুস্তকটি যদি "উম্মল কেতাব" হতো তবে দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকটি ক্ষুদ্রাকৃতি হওয়ার দরুন এর পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে যেতো। আকরম খাঁ অনূদিত

কুরআন গ্রন্থমালার প্রতিটির আকারই Royal octavo এবং কোনোটিরই Super Royal Quarto নয়। কাজেই ১৯০৫ সালে প্রকাশিত ত্রি-ভাষিক 'কোরআন শরিফ' খানি আকরম খাঁ-র 'উম্মল কেতাব' হতে পারে না। উম্মুল কেতাব যদি পূর্বেই প্রকাশিত থাকতো তা' হলে আকরম খাঁ সুরা ফাতিহার একটি তফসির রচনার প্রতিশ্রুতি না দিয়ে পাঠকগণকে তাঁরই প্রণীত প্রথম সংস্করণে পাঠ করার জন্য উপদেশ দিতেন। আর ১৯২৯ সালে প্রকাশিত উম্মল কেতাবের গ্রন্থস্বত্ব পৃষ্ঠায় "প্রথম সংস্করণ" কথাগুলিও মুদ্রিত করতেন না।

আকরম খাঁ ১৯১৮ সালে আল-এসলাম পত্রিকায় সুরা ফাতিহার যে তর্জমাটি প্রকাশ করেন তা বাদ দিয়ে ১৯২২ সালে 'আমপারা'র সম্পূর্ণ নতুন একটি অনুবাদ পেশ করেন। ১৯২৯ সালে উম্মল কেতাব' প্রকাশের জন্য সম্পূর্ণ নতুনভাবে সুরাটির অনুবাদ করেন। তুলনার সুবিধার জন্য আমরা উক্ত তিনটি তরজমাই নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

আল্‌-এসলাম

কৃতজ্ঞতা মাত্রই আল্লার জন্য, যিনি সর্ব্বলোকে পরিপোষক, করুণাবান ও দয়ালু (এবং) বিচারকালের কর্ত্তা। (হে প্রভু!) আমরা কেবল তোমাকেই পূজা করি, এবং তোমা হইতেই শক্তি যাঞ্চা করি। আমাদিগকে সুদৃঢ় সরল (ধর্ম্ম) পথে— তাহাদের পথে যাহাদের প্রতি তুমি কল্যাণ করিয়াছি— পরিচালিত কর, কিন্তু যাহাদের প্রতি তোমার অভিশাপ, এবং যাহারা ভ্রষ্ট — তাহাদিগের পথে নহে।

উম্মল কেতাব	আমপারা
১. যাবতীয় কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই প্রাপ্য— যিনি সকল জাহানের প্রভু পরওয়ার-দেগার	১. সর্বজগৎ স্বামী আল্লাহরই সমস্ত মহিমা
২. যিনি করুণাময় কৃপানিধান	২. যিনি করণাময় কৃপা নিধান।
৩. তিনি বিচার দিবসের মালিক	৩. যিনি বিচারকালের কর্ত্তা।
৪. আমরা এবাদত করি একমাত্র তোমারই —আর সাহায্য প্রার্থনা করি একমাত্র তোমারই নিকটে	৪. আমরা তোমারই মাত্র দাসত্ব করি এবং তোমারই নিকট শক্তি প্রার্থনা করি
৫. আমাদিগকে পরিচালিত করিও সরল সুপ্রতিষ্ঠিত পথে	৫. আমাদিগকে সহজ সরল পথে চালিত কর,
৬. যাহাদের উপর কৃপা করিয়াছ তাহাদের পথে,	৬. যাহাদিগের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ তাহাদিগের পথে
৭. কিন্তু দণ্ডভাজন করা হইয়াছে যাহাদিগকে এবং সুপথ হারা হইয়াছে যাহারা, তাহাদের পথে নহে।	৭. কিন্তু অভিশপ্ত ও ভ্রষ্টদিগের পথে নহে।

'উম্মল কেতাব' প্রকাশ করেই আকরম খাঁ ক্ষান্ত হন নি। তাঁর অনুবাদের কাজ ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে। ফলে ১৯৩০ সালে তাঁর "কোরান শরীফ", প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এ খণ্ডে সুরা ফাতেহা ও সুরা বাকারা অন্তর্ভুক্ত হয়। তেরটি প্রাথমিক পৃষ্ঠা সমেত এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪৭৫। যথারীতি এটিও খায়রুল আনাম খাঁ তাঁর মোহাম্মদী প্রেস থেকে মুদ্রিত করে মোহাম্মদ পাবলিশিং কোম্পানির নামে প্রকাশ করেন[৯৯]। খাঁ সাহেবের অনুবাদের দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। এ খণ্ডে সুরা আল এমরান অন্তর্ভুক্ত হয়। এটিও খায়রুল আনাম খাঁ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়[১০০]। এ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৪৮।

ইতিমধ্যে মওলানা আকরম খাঁ রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় তাঁকে সম্পূর্ণ সময় ও শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে রাজনীতি ক্ষেত্রে। ফলে তাঁর তরজমা ও তফসিরের কাজ ব্যাহত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয়ে গেলে মওলানা তাঁর কর্মক্ষেত্র ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। মাসিক মোহাম্মদীকে অবলম্বন করে "মুক্তভারতে মুক্ত এসলামকে প্রতিষ্ঠা করার" কাজ,[১০১] মুসলিম লীগের নেতৃত্ব, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ এবং আজাদের পরিচালনা তাঁর জীবনকে এত কর্মবহুল করে তোলে যে, তাঁর পক্ষে বাকি অনুবাদ শেষ করা সম্ভব হয় না। তথাপি তিনি কলকাতাতে ১৯৩০ ও ১৯৩৮ সালে মুদ্রিত অনুবাদের খণ্ড দু'টি ঢাকায় পুনর্মুদ্রণের প্রয়াস পান। এর উভয় খণ্ডই সদরুল আনাম খাঁ কর্তৃক আজাদ প্রেস ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়ে মোহাম্মদী বুক এজেন্সীর নামে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়। উভয় খণ্ডেরই ১০০০ কপি করে মুদ্রিত হয়।[১০২] এর প্রথম খণ্ডের মূল্য ছিল সাত টাকা আর দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য ছয় টাকা।

এ পর্যন্ত আমরা মওলানা আকরম খাঁ-র তরজমা তফসির সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি তাতে দেখা যাবে যে, তিনি ১৯২২ সালে তাঁর অনুবাদের কাজে সুরা আল-এমরান পর্যন্ত অনুবাদ ও তফসির রচনার কাজ শেষ করতে সক্ষম হন। ইতিমধ্যে ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ নির্বাচনে পরাজিত হলে মওলানা আকরম খাঁ রাজনীতি থেকে অবসর নেন এবং পুনরায় কুরআনের বাকি অংশের তফসির রচনার কাজে আত্মনিয়াগ করেন। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত এ অনুবাদ ও তফসিরটি মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য প্রায় লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। "সৌভাগ্যক্রমে সে সময় স্যার আদমজী এগিয়ে আসেন এর প্রকাশ-ব্যাপারে মওলানা সাহেবকে আর্থিক সাহায্য দিতে। প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার কাগজের ব্যবস্থা তিনি করে দেন। এর ফলে মওলানা সাহেব নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর 'তাফসিরুল কোরআনের' মুদ্রণ ও প্রকাশ ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দীর্ঘ দু'-তিন বৎসরে [তফসিরটির] পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত হয়"[১০৩]।

সাধারণত "তাফছিরুল কোরআন" নামে পরিচিত মওলানা আকরম খাঁ-র অনুবাদটির আখ্যা হলো " সরল বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তাফছীর সহ কোরআন শরীফ"। তবে এটির প্রাগ-আখ্যা হলো "তাফছীরুল কোরআন"। যাহোক, এটির প্রথম খণ্ডে সুরা ফাতিহা থেকে সুরা নেছার ৪২ আয়াত পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয়, আর এর পৃষ্ঠা

সংখ্যা হয় ৭০০। এ খণ্ডটি হিজরি ১৩৭৮ সালের রমজান মাসে অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। সুরা নেছার ৪৩ আয়াত থেকে সুরা তাওবার ১২৯ আয়াত পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয় দ্বিতীয় খণ্ডে। ৮০০ পৃষ্ঠার এ খণ্ডটি হিজরি ১৩৭৮ সালের জিলহজ্ব অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে প্রকাশ লাভ করে। তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৩৭৯ হিজরির সফর অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে। সুরা ইউনুস থেকে সুরা আম্বিয়ার ১১২ আয়াত পর্যন্ত বিধৃত এ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৭৭০। সুরা হজ্ব থেকে সুরা ছাদের ৮৮ আয়াত পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয় চতুর্থ খণ্ডে। এ খণ্ডটি ১৩৭৯ হিজরির জমাদিউল আখের অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। পঞ্চম অথচ শেষ খণ্ডের প্রকাশকাল হলো ১৩৭৯ হিজরির সাবান মাস অর্থাৎ ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি। এ খণ্ডের বিষয়বস্তু হলো সুরা জুমা থেকে সুরা নাস, আর এর পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৮৩৮। প্রতিটি খণ্ডই মোহাম্মদ বদরুল আনাম খাঁ ও মোহাম্মদ কামরুল আনাম খাঁ প্রকাশ করেন। প্রথম তিন খণ্ড তৈয়েবুর রহমানের তমদ্দুন প্রেস আর বাকি দু' খণ্ড মওলানার আজাদ প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।

মওলানা আকরম খাঁ–র সমাপ্তকৃত প্রতিটি অনুবাদের খণ্ডই ২,৫০০ কপি করে মুদ্রিত হয়। এর প্রতি খণ্ডের মূল্য ছিল ১৭.৫০ টাকা এবং সর্বমোট ৮৫.৫০ টাকা। এটি ১৯৬৮–৬৯ সাল পর্যন্ত বাজারে পাওয়া যেতো। এরপর এটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠে। ফলে ঝিনুক পুস্তিকার স্বত্বাধিকারী রুহুল আমিন নিজামী এর একটি পুনর্মুদ্রণ প্রকাশে আগ্রহী হন। প্রতি খণ্ড সাড়ে বার টাকা মূল্যে সুলভ মূলের নিউজপ্রিন্টে পুনরায় পাঁচ খণ্ডে এটি প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। এর প্রথম খণ্ডটি ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রথম খণ্ডের পর সম্ভবত আর কোনো খণ্ড প্রকাশিত হয় নি।

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ–র তরজমা ও তফসির প্রকাশিত হলে তাঁরই এক সহকর্মী ও ভক্ত মুজীবুর রহমান খাঁ দীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী এক সমালোচনা লেখেন। মুজীবুর রহমান খাঁ ছিলেন মওলানার দীর্ঘকালের সঙ্গী। তাই তিনি মওলানার জীবন ও কর্মপদ্ধতির আলোকে এ তফসিরের মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে মওলানা "যথাসাধ্য বিশ্বস্ততার সাথে মূলের যেমন রক্ষা করছেন, তেমনি বাংলা ভাষার সাহিত্যরীতির সাথেও সঙ্গতি রেখে অগ্রসর হয়েছেন। ফলে তাঁর অনুবাদে সহজ ও সরলতা অক্ষুণ্ন রয়েছে। ... [তিনি] যুক্তি ও অকাট্য ঐতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে তাঁর টীকা ব্যাখ্যাকে সব ক্ষেত্রেই নির্ভুল করে তুলেছেন"[১৪]। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক কবি আবদুল কাদির মওলানা আকরম খাঁ–র অনুবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'এ অনুবাদে অনাবশ্যক বন্ধনীর বাহুল্য নাই ; ভাষা বলিষ্ঠ ও ব্যঞ্জনাময় ; ফলে ভাবের আবেদন হইয়াছে অন্তরস্পর্শী" [১৫]।

মওলানা আকরম খাঁ তাঁর তরজমা ও তফসিরে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। কারো অন্ধ অনুকরণ না করে সত্য উদ্ধার করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। আর লক্ষ্যে পৌছতে তাঁকে অনেক প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক উপস্থিত করে স্বীয় মত ব্যক্ত করতে হয়েছে। ফলে স্বভাবতই তাঁর তরজমা ও তফসির এদেশের আলেম সমাজের মনঃপূত

হয় নি। এ–বিষয়ে সর্বপ্রথম সমালোচনা করে আকরম খাঁ–র মতসমূহের খণ্ডন করেন মওলানা রুহুল আমিন[১০৬]। ১৯৫৯–৬০ সালে পূর্ণাঙ্গ তফসির প্রকাশিত হলে মওলানা আবদুস সাত্তার "তফসীরের নামে সত্যের অপলাপ[১০৭] নামক পুস্তক এবং মওলানা আযীযুল হক তাঁর "পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা[১০৮] নামক পুস্তকে মওলানা আকরম খাঁ–র মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এজন্যই সম্ভবত মওলানা আকরম খাঁ–র তরজমা ও তফসির যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিংবা বিশ্বস্ত হোক না কেন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি।

ফজলুর রহিম চৌধুরী

ফজলুর রহিম চৌধুরী[১০৯] ছিলেন বরিশালের উলানিয়ার জমিদার এসহাক চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল সৈয়দা সামসুন্নেছা খানম। স্বগ্রামের মধ্য–ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে ফজলুর রহিম বরিশাল জেলা স্কুলে ভর্তি হন। জেলা স্কুল থেকে ঐচ্ছিক বিষয় আরবি সহ তিনি ১৯১২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ সালে বি. এ. এবং ১৯১৯ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আরবি–তে এম. এ. পাশ করেন। অতঃপর তিনি এক্সাইজ সুপারিন্টেনডেন্ট –এর চাকরিতে যোগদান করেন।

ফজলুর রহিম চৌধুরী ১৯২৬ সালে শেরে–বাংলা এ.কে. ফজলুর হকের কন্যা রইসী বেগমকে বিয়ে করেন। ৩৩ বছর বয়সে ১৯২৯ সালের ১০ই এপ্রিল পিত্তাশয়ের পাথর অপসারণার্থে অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্বেই ফজলুর রহিম চৌধুরী সমগ্র কুরআন অনুবাদ করেন। সর্বপ্রথম তিনি "কোরআনের সুবর্ণ কুঞ্জিকা" নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। এটি ১৯২৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই প্রকাশিত হয়। কুরআনের সম্পূর্ণ অনুবাদটিকে তিনি প্রথমভাগে প্রথম পনের এবং শেষের বা দ্বিতীয় শেষের পনের পারা এই হিসেবে দু'ভাগে ভাগ করেন। যথারীতি প্রেস কপি তৈরি করে মুদ্রণের সব ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ তখনই তিনি জান্নাতবাসী হন। মৃত্যুর পর তাঁর বড় ভাই ফজলুল করিম চৌধুরী উলানিয়ার 'এসহাক মঞ্জিল' থেকে ১৯৩০ সালের জুন মাসে অনুবাদখানি প্রকাশ করেন। মূল আরবি ছাড়া এ অনুবাদের প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৪৫২ এবং এর মূল্য রাখা হয় তিন টাকা। আর দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৫০০।

অনুবাদটি খায়রুল আনাম খাঁ–র কলকাতাস্থ মোহাম্মদী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এটি কলকাতারই মোহাম্মদী বুক এজেন্সীতে বিক্রির জন্য মজুত ছিল[১১০]। অনুবাদের প্রথম খণ্ডে সুরা ফাতিহা থেকে সুরা বনি ইসরাঈল স্থান লাভ করে। প্রকাশকের নিবেদন, নিবেদন, সূচীপত্র ইত্যাদি সমেত প্রাথমিক ২২ পৃষ্ঠা ছাড়াও অনুবাদটির পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৪৫২। প্রাথমিক পৃষ্ঠাগুলোতে মুদ্রিত নিবেদন দু'টির প্রথমটি ছিল প্রকাশকের আর দ্বিতীয়টি ছিল অনুবাদকের শ্বশুর শেরে–বাংলা ফজলুল হকের।

মোহাম্মদ নকীবউদ্দীন খাঁ

পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার সরিষা ডাকঘরের অন্তর্গত মাদপুর গ্রামে[১১১] ১৮৯৪ সালের ১৪ই এপ্রিল মোহাম্মদ নকীবউদ্দীন খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ মালোয়ার খাঁ এবং মাতার নাম হামিদা বানু। পারিবারিক অসচ্ছলতার দরুনই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক নকীবউদ্দীন স্থানীয় মক্তবের পাঠ সমাপনান্তেই জীবিকার অন্বেষণে কলকাতা চলে যান[১১২]।

কলকাতায় গিয়েই নকীবউদ্দীন প্রেসের কাজে যোগদান করেন। তিনি মওলানা আব্বাছ আলি পরিচালিত আলতাফী প্রেসে প্রথমে কম্পোজিটর ও পরে মুদ্রাকরের কাজে নিযুক্ত হন। মওলানা আব্বাছ আলি প্রেসের কাজ থেকে অবসরগ্রহণের পর স্বগ্রামে চণ্ডীপুরে মাদ্রাসার শিক্ষকতা শুরু করলে হয়তো নকীবউদ্দীনই এর সার্বিক দায়িত্বগ্রহণ করেন[১১৩]। অতঃপর তিনি নিজেই মিনার কোম্পানির নামে একটি প্রকাশনা সংস্থার প্রতিষ্ঠা করে ইসলামি পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রয়ের ব্যবসায় ব্রতী হন।

পুস্তক ব্যবসার শুরুতে নকীবউদ্দীন মওলানা আব্বাছ আলি অনূদিত কুরআন ও অন্যান্য পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন[১১৪]। এতদ্‌সঙ্গে তিনি 'কোরআনের দোয়া ও আমালিয়াত (১৯২৫), মসলা বিধান (১৯২৬), আল্লাহর নাম-মাহাত্ম (১৯২৬) ও বঙ্গানুবাদ দোয়া গঞ্জল আরশ ও দরুদ আকবর (১৯২৮), বঙ্গানুবাদ পাঞ্জেছুরা (১৯২৮) ও বাঙ্গালা মেশকাত শরীফ (১ম ও ২য় ভাগ একত্রে) প্রকাশ করেন[১১৫] ।

পুস্তক প্রকাশনা ও ব্যবসার অভিজ্ঞতার আলোকে নকীবউদ্দীন 'ইসলামের মূলগ্রন্থ কুরআন শরীফের তেলাওয়াৎ ও উহার মর্ম অবগত হওয়ার' মাধ্যমে 'কুরআনের শিক্ষা প্রচারের আবশ্যকতা' অনুধাবন করেন। অতঃপর তিনি 'এহেন অসাধ্য সাধনে অগ্রসর' হন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন :[১১৬]।

> ইত্যাগ্রে কোরআনের দু'-একখানি পূর্ণ অপূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলেও দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে উহার ক্রয় বাস্তবিকই সহজসাধ্য নহে। তাহা ছাড়া বাংলায় আরবী কোরআনের "উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয়" আমাদের অনূবাদিত কোরআন ভিন্ন আর কোনটীতেই নাই ; ইহা আবাহমানকালে যে একটি গুরু অভাবের পূরণ, এ কথাকে কে অস্বীকার করিবে ?

প্রথমে নকীবউদ্দীন কুরআনের ত্রিশ সংখ্যক পারা 'আমপারা' অনুবাদে মনোনিবেশ করেন। অনুবাদটি ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হলে তা ঐ বছরেরই ১৩ই জুন রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্স-এ জমা দেয়া হয়[১১৭]। এ সংস্করণটি আমরা দেখি নি। কিন্তু ১৩৪৬ বাংলা সালের অগ্রহায়ণ মাসে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত এর একটি দ্বিতীয় সংস্করণ বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত আছে। এতে দেখা যায় যে, এক বছরের মধ্যেই আমপারাটির সমুদয় কপি শেষ হয়ে গেছে ; এবং ইতিমধ্যেই নকীবউদ্দীন খাঁ অনুবাদের "৮ম পারা পর্যন্ত বাহির" করে ফেলেছেন এবং ৯ম পারা ছেপে যাচ্ছেন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তাঁর অনুবাদটি ছিল "বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পীর মোহাম্মদ আবুবকর কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রশংসিত"

এবং প্রত্যেক পারা পৃথক পৃথক ছাপা হয়ে সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ ত্রিশ পারা ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত হওয়ার কথা। এতে "প্রথমে মূল আরবি, আরবির নিম্নে বাংলায় উচ্চারণ ও উহার নিম্নে সরল বাংলায় সুস্পষ্ট অনুবাদ এবং পৃষ্ঠার নিম্নেই 'শানে-নজুল ও তফসীর দেওয়া" হয়। ফলে, "আরবী না জানিলেও বাংলার সাহায্যে সহজে আল্লাহ বাণী কোরআন শরীফ তেলাওয়াৎ ও উহার মর্ম অবগত" হওয়া সহজ হবে বলে অনুবাদক আশা প্রকাশ করেন। ক্রয়ের সুবিধার জন্য 'প্রত্যেক পারা পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশ' করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। রয়েল ৮ পেজি সাইজে "উৎকৃষ্ট গ্লেজ কাগজে ছাপা প্রত্যেক পারার হাদিয়া" ছিল মাত্র ছয় আনা। অনুবাদটি ডাকযোগে ক্রয়েরও ব্যবস্থা ছিল। এতে মূল্যের অতিরিক্ত ডাকখরচ বাবদ অতিরিক্ত এক আনা কিন্তু গ্রাহক হয়ে আগাম 'মনিঅর্ডার যোগে দশ টাকা পাঠালে বিনাডাক খরচেই 'সম্পূর্ণ ত্রিশ পারা পাওয়ারও ব্যবস্থা ছিল।[১১৮]

মনে হয় অনুবাদটি তৎকালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সম্ভবত এর দু'টি কারণ ছিল। প্রথমত অনুবাদের আরবি মূলের বাংলা উচ্চারণ। তৎকালে একমাত্র নকীবউদ্দীন খাঁ-র বাংলা তরজমার সঙ্গেই কুরআন শরিফের বাংলা উচ্চারণ পাওয় যেতো। এর পূর্বে মুন্‌শী করিম বখ্‌শ[১১৯] সর্বপ্রথম বাংলা উচ্চারণ সহ কুরআনের তরজমা করেন কিন্তু এ অনুবাদটি ছিল অসম্পূর্ণ, বিস্মৃত ও দুষ্প্রাপ্য। অনুবাদটির জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণ হলো প্রচারণা। তৎকালে মুসলমানদের প্রকাশিত প্রতিটি সাময়িকী এবং পঞ্জিকাতে মিনার কোম্পানির বইয়ের তথা নকীবউদ্দীন খাঁ-র বাংলা তরজমার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো। এ বিজ্ঞাপন প্রকাশেও নকীবউদ্দীন খাঁ-র ব্যবসায় বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তিনি মিনার কোম্পানির বিজ্ঞাপনটি বিপুল সংখ্যায় মুদ্রিত করতেন। মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি সাময়িকী ও পঞ্জিকা প্রকাশকদের সরবরাহ করা হতো। প্রকাশকগণ শুধু বাঁধাইর সময় এ বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাগুলো সংযুক্ত করে বাঁধাই করে দিতেন। এভাবে প্রচারণার আধিক্যের দরুনই সম্ভবত তাঁর তরজমাটির বিপুল সংখ্যক কপি বিক্রি হতো। অনুবাদককে এটি পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত করে গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে হয়েছিল। অনুবাদটির চাহিদা কত বেশি ছিল তা এ অনুবাদের মুদ্রণ ও প্রকাশের ইতিহাস থেকেই বের করে নেয়া যায়। অনুবাদটির প্রথম পারা প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন ২২ পারা প্রকাশিত হয় এবং ২৩ পারা যন্ত্রস্থ তখনি অনুবাদটির প্রথম পারা আলিফ-লাম-মিম এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল[১২০]। এতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিবছরেই এ অনুবাদটির একটি করে সংস্করণ বের হতো।

এভাবে ১৯৪৯ সালের মধ্যে নকীবউদ্দীন খাঁ তাঁর অনুবাদ সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন। ধারাবাহিক পৃষ্ঠাক্রম অব্যাহত রাখার দরুন ত্রিশ সংখ্যক পারার মুদ্রণ যখন সমাপ্ত হয়, তখন এর শেষ পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ১৫৪৪। সম্পূর্ণ অনুবাদ মুদ্রণের পর প্রতি পারার মূল্য নির্ধারিত হয় বার আনা, সম্পূর্ণ ৩০ পারা ২২ টাকা ৮ আনা 'পাকা বাঁধাইকৃত' বালামের মূল্য হয় ২৬ টাকা[১২১]। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নকীবউদ্দীনের অনুবাদটি ধারাবাহিক পৃষ্ঠাঙ্কসহ প্রকাশিত হলেও মুদ্রণ শেষে বাঁধাইর কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল

বলে মনে হয় না। কারণ প্রতিটি পারার প্রারম্ভেই দু'পৃষ্ঠা করে সূচিপত্র মুদ্রিত হয়। এতে প্রত্যেক পারার প্রাথমিক দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠাঙ্ক দেয়া হয় [২]। কাজেই দপ্তরিগণ ত্রিশ পারার পৃষ্ঠা মিলিয়ে বাঁধাইর সময় যথারীতি প্রারম্ভিক ষাটটি পৃষ্ঠা প্রথমে সংস্থাপন করে বাঁধাই করেন। কোনো ব্যক্তি যদি এভাবে বাঁধাই সমগ্র কোরানের একটি কপি পরীক্ষা করেন এবং তাঁর যদি এ গ্রন্থের মুদ্রণেতিহাস ও পদ্ধতি জানা না থাকে তবে মুজীবুর রহমানের মতোই ভুল করবেন যে, "এই ত্রিশ পারা বঙ্গানুবাদের শুরুতে ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী" সূচিপত্রে "কোন ক্রমিক সংখ্যা না দিয়ে" প্রতি দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়ই [দুই আনা] সংখ্যা দেয়া হয়েছে।[১২২]

নকীবউদ্দীন খাঁ-র তর্জমাটি তাঁর নিজের না অন্যের এ-বিষয়ে একটি মারাত্মক প্রশ্ন তুলেছেন মুজীবুর রহমান। তিনি মনে করেন যে নকীবউদ্দীন খাঁ ছিলেন "স্বল্পশিক্ষিত।" "উচ্চ শিক্ষা" বলতে তিনি যদি মক্তব-মাদ্রাসার ধারাবাহিক পাঠের ফলে সনদের অধিকারী বুঝিয়ে থাকেন তা হলে হয়তো তা নকীবউদ্দীন-এর ছিল না। আর তা ছিল না বলেই যে তিনি কুরআন অনুবাদ করতে পারবেন না, তা কি করে বলা যায়? "স্বল্প শিক্ষা"-র দোহাই দিয়ে জনাব রহমান লেখেন যে, তাঁর "ভাষ্য ও তরজমা সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি মোহাম্মদ মুছাকে দিয়ে প্রথম ১৮ এবং মওলবী রফিকুল হাসানকে দিয়ে শেষের ১২ পারার তরজমা করিয়ে নেন।"[১২৩] প্রথমোক্ত ব্যক্তির অনুবাদ আহলে হাদীস পত্রিকায় এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির তরজমা মাসিক কুরআন প্রচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আমরা আহলে হাদীস পত্রিকায়[১২৪] প্রথমোক্ত ব্যক্তির তরজমার সঙ্গে নকীবউদ্দীন এর তরজমা মিলিয়ে দেখেছি। এ তরজমা দু'টির মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। রফিকুল হাসান অনূদিত ১৯ থেকে ৩০ পারা অবধি অনুবাদ আমরা দেখতে পাই নি।[১২৫] তবে কুরআনের ত্রিশ সংখ্যক পারাটি আমপারা হিসেবে নকীবউদ্দীন প্রথম পারা অনুবাদের পূর্বেই প্রকাশ করেন। এতে সুরা ফাতিহা অন্তর্ভুক্ত হয়। আমরা রফিকুল হাসান অনূদিত সুরা ফাতিহার তরজমার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। কিন্তু, দু'য়ের মধ্যেও কোনো সাদৃশ্য দেখতে পাই নি। যা হোক, এ বিষয়ে ১৯৬৭ সালে নকীবউদ্দীন খাঁ নিজে তদনূদিত ১৬শ পারা— 'ক্বালা আলাম'-এর পুনর্মুদ্রণ প্রকাশের 'আত্মকথা'-য় বলেন "কয়েকজন আলেম ছাহেবানের আনুকূল্যে অনুবাদিত হইল তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম"। "অবশ্য এ কয়েকজন 'আলেমের মধ্যে মুহম্মদ মুসা ও রফিকুল হাসানও ছিলেন। প্রথম সংস্করণের কোনো কোনো পারার ভূমিকায় মুহম্মদ মুসা কিংবা রফিকুল হাসান তাঁকে "এই অনুবাদ কার্য্যে কঠোর পরিশ্রমদ্বারা সাহায্য করিয়াছেন" বলে লিখেছেন, তবে, তাঁদের দ্বারা "তরজমা করিয়ে নেন"— এ কথা বলেন নি।" স্বকীয় অনুবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নকীবউদ্দীন খাঁ বলেন :

> হিন্দুস্থানের গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ ও মোফাচ্ছেরগণের বিশেষত... আশরাফ আলী থানবী এবং ... নজীর আহমদ ছাহেবের তরজমার এবং প্রায় সকল ছুরারই তফছীরে "তফছীরে ফাৎহোল আজীজের" সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

অনুবাদে 'ভুল-ভ্রান্তি' স্বাভাবিক। এ বিষয়েও অনুবাদক নকীবউদ্দীন ছিলেন সচেতন। তিনি বলেন :

> মানুষের ত্রুটি ও বিচ্যুতি অস্বাভাবিক নহে। অতএব, কোন সূক্ষ্মদর্শী হৃদয়বান বিবেচক ভ্রাতার চক্ষে উচ্চারণ, অর্থ বা টীকার কোনও কিছু ভুল ত্রুটি বা বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ বাধিত ও সংশোধনের পক্ষে সচেষ্ট হইব।

ডক্টর মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা

মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা[১২৩] ভারত উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ইসলাম ও কুরআনি সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ না হয়েও তিনি এ-বিষয়ে বাংলা ভাষায় যে অবদান রেখে গেছেন তা সর্বকালের জন্য অনবদ্য হয়ে থাকবে।

ডক্টর কুদরাত-এ-খুদা বাংলা ১৩০৮ সালের (ইং ১৯০১) বৈশাখ মাসে বীরভূম জেলার মারগ্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শাহ্ আবদুল মুকিত ও মাতা ফসিদা খাতুন তৎকালে অভিজাত বংশের প্রথানুসারে তাঁদের একমাত্র পুত্রকে একজন হক্কানী 'আলিম' তৈরি করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাত্র ছ'বছর বয়সে স্থানীয় হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। তিনি দু'বছরের মধ্যেই সাত পারা কুরআন মুখস্ত করে ফেলেন। সম্ভবত তাঁর কুরআনি শিক্ষা সমাপ্তির পূর্বেই তাঁকে স্থানীয় এক মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়া হয়। পরে তিনি কলকাতার মীর্জাপুর স্ট্রিটস্থ উডবার্ণ মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে চলে আসেন। প্রথমোক্ত স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা ; পরবর্তী স্কুলের মাধ্যম ছিল উর্দু। তথাপি কুদরাত-এ-খুদা মধ্য ইংরেজি বৃত্তি পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কলকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে তিনি বাংলার মাধ্যমে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি নেন। এখান থেকেই তিনি ১৯১৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। অতঃপর তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করে ১৯২৪ সালে রসায়ন শাস্ত্রে এম. এস. সি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিলাত যান এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস. সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

ড. কুদরাত-এ-খুদা ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপন করেন। দেশবিভাগের পর ঢাকায় চলে এসে তিনি ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জনশিক্ষা পরিচালক নিযুক্ত হন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও বিজ্ঞান পরিষদের পরিচালক হিসেবে তিনি ১৯৬৭ সালে অবসরগ্রহণ করেন। বাংলাদেশোত্তর কালে তিনি জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং ১৯৭৪ সালে তাঁর রিপোর্ট পেশ করে। ১৯৭৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর তিনি এন্তেকাল করেন।

কুদরাত-এ-খুদা সাহিত্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ে বহুসংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। দুর্ভাগ্যবশত এগুলি কোনো গ্রন্থাগারেই সংরক্ষিত করতে সক্ষম হয় নি। অধ্যাপক আলী আহমদ তাঁর গ্রন্থপঞ্জিতে মাত্র দশটি পুস্তক অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন।

কুদরাত-এ-খুদা ছিলেন কুরআনে হাফিজ। কুরআন নিয়েই তাঁর বাল্যশিক্ষার সূচনা হয়। পরে একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী হিসেবে কুরআনের চিরন্তন বাণীকে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ করার প্রয়াস পান। এ সময় তিনি কুরআনের একটি "পূর্ণতর ও প্রকৃষ্টতর ও সুন্দরতর স্বাভাবিক ব্যাখ্যা"-র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি মনে করেন, এ জাতীয় একটি ব্যাখ্যার অভাবেই মুসলমান সমাজ পারমার্থিক চিন্তাকেই ইহা জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলে গ্রহণ করায়, উন্নতির উচ্চতম স্তর থেকে হীনতার নিম্নতম স্তরে নেমে এসেছে। এ সমাজের হৃত গৌরবকে ফিরে পেতে হলে কুরআনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে। এ কাজের জন্য কুরআনের বাণী বুঝে নেয়া প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু অনুরূপ দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের একটি ব্যাখ্যা-ভাষ্য তখনও পর্যন্ত তৈরি হয় নি। অথচ মুসলমানদের "অতীত গৌরব পুনরায়" ফিরে পেতে হলে কুরআনের শিক্ষাকে তাঁদের পূর্বতন পুরুষের ন্যায় সামনে রেখে শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হয়। অতএব এ কাজের জন্য কুরআনের বাণী বুঝে নেয়া প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিজ্ঞানী কুদরাত-এ-খুদা বাংলা ভাষায় আরবি কথার ব্যাখ্যা করে সহজভাবে পবিত্র কুরআনের কথা বাংলা ভাষাভাষীর সম্মুখে উপস্থাপিত করার প্রয়াস পান। কিন্তু, আরবি ভাষায় তাঁর "জ্ঞানের দীনতাহেতু এই ভাষান্তর" কাজটি সহজ ছিল না। এ বিষয়ে তিনি "প্রেসিডেন্সী কলেজের আরবির সুযোগ্য অধ্যাপক হাফেজ আবদুল হাই"-এর সাহায্য নেন। তদুপরি তিনি "বিভিন্ন ইংরেজী ও উর্দ্দু অনুবাদের"ও সাহায্য গ্রহণ করেন।

কুরআনের ভাষান্তর ও ব্যাখ্যা-ভাষ্যে কুদরাত-এ-খুদা "নিজ কল্পিত ব্যাখ্যা প্রয়োগ" করেন নি বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন :

> যে সমস্ত ব্যাপারে অর্থ বর্ত্তমানের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া প্রচার করা প্রয়োজন মনে হইয়াছে তাহার টীকা আলাদাভাবেই দিয়াছি। আশা করি ইহার দ্বারা আমার বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ... টীকায় যে মত ব্যক্ত হইয়াছে তাহার দায়িত্ব আমার নিজে, পূর্ববর্ত্তী সুবিজ্ঞ তফসিরকারকদিগের প্রভাব হইতে দুভার্গ্যবশত: বঞ্চিত রহিয়া গিয়াছি।

প্রতিটি পারাকে খণ্ড, সুরাকে অধ্যায় এবং রুকুকে পরিচ্ছেদ হিসেবে তিনি তার অনুবাদের বিভাজন করেছেন। প্রতিটি আয়াতের সংখ্যা দেয়ায় আরবি মূল সঙ্গে না থাকা সত্ত্বেও অনুবাদটি মূল আরবি পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া সহজ হয়েছে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণ অনুবাদটি এক সঙ্গে প্রচার করতে পারেন নি। তিনি বলেন :

> সম্পূর্ণ গ্রন্থ এক সঙ্গে প্রচার করা সম্ভব হইল না। সর্বপ্রথম কয়েকটি প্রাথমিক কথার সহযোগে পবিত্র গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ক্রমে বক্রীঅংশও মুদ্রিত হইতেছে। পবিত্র কোরাণের বিভাগ পারা অনুযায়ী তিরিশটি হয়। মনে হয় দশ ভাগে এই তিরিশ পারা প্রচার করা সম্ভব হইবে।

উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী "প্রাথমিক কথায়" আল্লাহ, সৃষ্টিরহস্য ও প্রেরিত পুরুষ সম্বন্ধে পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি বিশদ আলোচনার পর তিনি অনুবাদের সূচনা করেন। প্রথম খণ্ডে সুরা ফাতিহা ও আলিফ-লাম-মিম ও সায়্যাকুল পারা মুদ্রিত হয়। এটি মুহম্মদ মাহবুব-এ-খুদা কর্তৃক কলকাতার ইউনাইটেড পাবলিশার্স থেকে ১৯৪৬ (বাংলা ১৩৫২) সালে প্রকাশিত হয়। কলকাতারই নিউ মহামায়া প্রেস থেকে গৌরচন্দ্র পাল পুস্তকটির মুদ্রণ কাজ সমাধা করেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশের একবছর পরে, ১৯৪৭ সালে অনুবাদটির দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ভাগ "তিলকার রোসল হইতে আল মুহসিনাত পর্যন্ত"— তিন থেকে পাঁচ পারা পর্যন্ত স্থানলাভ করে। এ ভাগটি মুহম্মদ মাহবুব-এ-খুদাই তার চট্টগ্রামস্থ ইউনাইটেড পাবলিশার্স—এই নামে প্রকাশ করেন। এ খণ্ডটিও কলকাতার নিউ মহামায়া প্রেস থেকে গৌরচন্দ্রপাল কর্তৃক মুদ্রিত হয়। এ দু'ভাগে কুদরাত-এ-খুদা অনূদিত কুরআনের মাত্র ৫ পারা প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত অনুবাদটি এরপরে আর অগ্রসর হয় নি।

ওষমান গণী

ব্রিটিশ যুগের সর্বশেষ কুরআন অনুবাদক হলেন আল্লামা ওষমান গণী[২৭]। তাঁর অনূদিত 'পবিত্র কোরান' দুসরা যিল্-হজ্জ, ১৩৬৬ হিজরি, ১৭ই অক্টোবর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে আশ্বিন, ১৩৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২+১২৭৪+৬। অনুবাদটির আখ্যাপত্রে আছে—

রচয়িতা —আল্লাহ্
প্রকাশক—জিবরীল্
হক্-কার-মুহম্মদ (স:) মক্কা, আরব।

ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ওসমান গণী পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার সলদা আঝাপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা আবদুল বারী (মৃত্যু ১৯০৭) একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন।

বাল্যে স্থানীয় মাদ্রাসায় পড়াশুনার পর তিনি কলকাতার আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯১১ সালে শিক্ষা সমাপ্তির পর থেকেই তিনি বিভিন্ন স্কুল-মাদ্রাসায় শিক্ষাকতা করার পর ১৯২৮ সালে অবসর নেন।

ওসমান গণী সর্বপ্রথম 'কোরআনের দোয়া' নামক একটি পুস্তক রচনা করেন। তাঁর 'পঞ্চমণি' কুরআনের পাঁচটি সুরার পদ্যানুবাদ। এটি প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে।

ওসমান গণীর সর্বপ্রধান কাজ হলো সমগ্র কুরআন-এর অনুবাদ। সম্ভবত মাদ্রাসার পড়াশুনা সমাপ্তির পরপরই তিনি অনুবাদের কাজ শুরু করেন। তা' শেষ করেন ১৯১৮ সালে।

ওসমান গণী অনুবাদ ছাড়াও অনুবাদের সঙ্গে কুরআনের আরবি মূল পাঠ এবং এর একটি বাংলা প্রতিবর্ণায়িত পাঠ অন্তর্ভুক্ত করতে মনস্থ করেন। এ কাজ করতে যেয়েই

তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। ওসমান গণী যখন বঙ্গাক্ষরে কুরআন পাঠের "অনুলিপি" তৈরি করতে শুরু করেন তখন সবেমাত্র মুনশী করিম বখ্‌শ তাঁর অনুবাদে বাংলা অনুলিপি দিতে শুরু করেছেন। করিম বখ্‌শ ১৯১৬ ও ১৯১৮ সালের মধ্যে কুরআনের কেবল 'আমপারা' ও প্রথম পারাই প্রকাশ করেন। এ তথ্যটির বিষয়ে ওসমান গণী অবহিত ছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। পরবর্তীকালে নকীবউদ্দীন খাঁ তদ্‌প্রকাশিত অনুবাদের সঙ্গে বঙ্গাক্ষরে কুরআনের একটি পাঠ সংযুক্ত করেন। নকীবউদ্দীন –এর অনুবাদটি ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

সম্ভবত ওসমান গণী নিজেই একটি অনুলিপি পদ্ধতি তৈরি করেন। বাংলা বর্ণমালায় আরবি বর্ণমালার চেয়েও অনেক বেশি বর্ণ বিদ্যমান। তবুও আরবির বাংলা প্রতিবর্ণায়নে বাংলা বর্ণে 'সংকুলান' হয়ে উঠে নি তাঁর এ কাজে। দীর্ঘ সতের বছর কাজ করার পর তিনি এ কাজটি ১৯৩৫ সালের শেষের দিকে করতে সমর্থ হন। এতকাল কষ্ট করার পরও তিনি যে কৃতকার্য্য হয়েছিলেন তা বলা যায় না। বিষয়টির গভীরে না যেয়ে একমাত্র তাঁর অনুবাদের আখ্যাপৃষ্ঠায় চোখ বুলালেই বিষয়টি ধরা পড়বে। স্বীয় নাম লিখতে যেয়ে তিনি নামের বানান লিখেছেন 'ওষমান' । বাঙালিরা সাধারণত নামটি 'ছ' অথবা 'স' দিয়া লেখে। এতে হয় 'ওছমান' অথবা 'ওসমান'। আরবরা শব্দটিকে উচ্চারণ করে 'উথমান' বলে। আরবির চতুর্থ বর্ণটি এভাবেই উচ্চারিত হয়। কিন্তু ওসমান গণী আরবি বর্ণমালার চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ দিয়েছেন 'ষ'। এ উচ্চারণে যদি কেউ কুরআন পড়ে তা হলে নিশ্চয়ই শুদ্ধ পড়বে না।

অনুবাদকের নিজের কোনো ছাপাখানা ছিল না। তাই এটি ছাপাতেও লাগে দীর্ঘকাল। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট অনুবাদটির মুদ্রণ শেষ হয়। আমাদের সৌভাগ্য, ১৯৪৬–৪৭–এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুদ্রাকর পাণ্ডুপিলিটি হারিয়ে ফেলেন নি।

উপসংহার

অমুসলিম ব্রাহ্ম গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৮৬ সালে কুরআন অনুবাদ সমাপ্ত করলে তাঁর অনুবাদ মুসলমান সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং তার ফলে মুসলমানেরা নিজেরাই এগিয়ে আসেন বাংলা ভাষায় কুরআনের তরজমা ও তফসির নিয়ে। বর্তমান অধ্যায়ে ১৮৮৭ সাল থেকে ১৯৪৭ এই ষাট বছরের কুরআন অনুবাদ ও অনুবাদকের সমীক্ষা তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

আলোচ্য সময়ে নইমূদ্দীন (১৮৮৭–১৯০৮), আব্বাছ আলি (১৯০৫–১৯০৯), খান বাহাদুর তসলীমউদ্দীন আহমদ (১৯০৭–১৯২৫), রেভারেন্ড উইলিয়ম গোল্‌ড্‌স্যাক (১৯০৮–১৯২০), খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম (১৯১৪–১৯৩০), মুনশী করিম বখ্‌শ (১৯১৬–১৯১৮), মোহাম্মদ রুহল আমিন (১৯১৭–১৯৩০), দিদার বখ্‌শ মোল্লা (১৯২৯), আবদুল হাকিম ও আলি হাসান (১৯২২–১৯৩৮), মোহাম্মাদ আকরম খাঁ

(১৯২২-১৯৬০), ফজলুর রহিম চৌধুরী (১৯৩০) এ ডক্টর মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা (১৯৪৫-১৯৪৭) — এই ১২ জন পবিত্র কুরআন তর্জমা করেন। এঁদের মধ্যে অনুবাদক গোল্ড্স্যাক ছিলেন খ্রিস্টান পাদরি ; বাকি ১১জন মুসলমান। এ ১১জনের মধ্যে নইমূদ্দীন, মুন্শী করিম বখ্শ, মোহাম্মদ রুহুল আমিন, দিদার বখ্শ মোল্লা ও ডক্টর মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা তাঁদের অনুবাদ সমাপ্ত করতে পারে নি কিংবা করেন নি। মওলবী নইমূদ্দীন সর্বপ্রথম সমগ্র কুরআন অনুবাদে হাত দেন। কিন্তু তাঁর পূর্বে তিনি মাত্র তেইশ পারা ও আমপারা অনুবাদ করতে সক্ষম হন। মুন্শী করিম বখ্শ আমপারার এবং প্রথম পারা অনুবাদ করার পর আর অগ্রসর হয়েছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। মোহম্মাদ রুহুল আমিন প্রথম তিন পারা ও আমপারা অনুবাদ করে আর অগ্রসর হতে পারেন নি। ডক্টর কুদরাত-এ-খুদা মাত্র পাঁচ পারা অনুবাদ করেন।

আলোচ্য অনুবাদকদের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশ আমলে অনুবাদে হাত দিলেও তাঁদের অনুবাদের কাজ শেষ হয় পাকিস্তান আমলে। মোহাম্মদ আকরম খাঁ-র আমপারা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। কিন্তু ৫ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর "সরল বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তাফছীর সহ কোরআন শরীফ"-এর সর্বশেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। নকীবউদ্দীন খাঁ-র অনূদিত প্রথম পারা প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে ; কিন্তু তাঁর সর্বশেষ পারার অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। কুদরাত-এ-খুদার অনুবাদের প্রথম ভাগে প্রথম দুই পারা ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হলেও তার দ্বিতীয় ভাগের তিন পারা ১৯৪৭ সালে, সম্ভবত পাকিস্তান অর্জনের পরে প্রকাশিত হয়। আল্লামা ওছ্মান গণী কখন অনুবাদ শুরু করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই কিন্তু তাঁর অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালের ১৭ই অক্টোবর অর্থাৎ দেশবিভাগের পর।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. মুন্শী শেখ আবদুর রহিম, "বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ", **মাসিক মোহাম্মদী**, ২ : ১১ (ভাদ্র ১৩৩৬)।
২. ঐ।
৩. জোব্দাতল্ মসায়েল, প্রথম খণ্ড। ১ম সং। কলিকাতা : বি. পি. এম. প্রেস, ১৮৭৩। পৃ. ২৩৪।
৪. ঐ, **'আভাষ'**।
৫. ঐ।
৬. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, "মওলানা মোহাম্মদ নঈমুদ্দিন" **মাসিক মোহাম্মদী**, ২৬ : ১০ (শ্রাবণ ১৩৬২), পৃ. ৬১৪।
৭. ইব্রাহীম খাঁ, "মৌলভী নইমূদ্দীন", **মাহে-নও**, ১০ : ১২ (চৈত্র ১৩৬৫), পৃষ্ঠা ৭৪-৭৮।
৮. প্রেসটি ১২৯১ (বাং) সালের ৮ চৈত্র "খোলা" হয়। **আখবারে এসলামিয়া**, ২ : ২ (৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২), পৃষ্ঠা ১০৪।
৯. **আম-পারা** (করটীয়া : ১৮৭২), **"আভাষ"**

১০. **আদেল্লায় হানিফিয়া**, ২য় সং। (করটীয়া : ১৯০৪), কভারের শেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন।

১১. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, **বাংলো ভাষায় কুরআন-চর্চা**, (ঢাকা ; ১৯৮৬), পৃ. ৭৭-১০২ সংখ্যক পাদটীকা

১২. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, "মুহম্মদ নইমুদ্দিন, **"দিলরুবা"**, ৫ : ২ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০)

১৩. সিদ্দিকী, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৬১৫।

১৪. **উক্ত**, পৃ. ৬১৫।

১৫. খাঁ, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৭৮।

১৬. রহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ৭৯। ১০৪ সংখ্যক পাদটীকা।

১৭. মুহম্মদ হুসেই আদ্-দাহবী, **আত্-তাফসির ওয়া মুফাস্সিরুন** (বৈরুত : ১৯৮৭), পৃ. ৩৩২-৩৩৭।

১৮. রহমান, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৭৯-৮০

১৯. **প্রভাকর**, ২ : ১ (১৯১৩), শেষ মলাটের আভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন।

২০. **কোরান শরিফ**, ২য় খণ্ড, 'আভাষ'।

২১. মোহাম্মদ তাহের, **আল কুরআন** (কলিকাতা : ১৯৭০), পৃ. ১০।

২২. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও আলি হাসান, **কোরান শরিফ**, (কলিকাতা : ১৯৩৮), পৃ. [১]

২৩. রহমান, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৭০-৭১।

২৪. **উক্ত**, পৃ. ৭০।

২৫. **জোব্দাতল্ মসায়েল**, ১ম খণ্ড, 'আভাষ'।

২৬. মোহাম্মদ রুহল আমিন, **কোরআন শরিফ ... পারা আ'ম**, ৩য় সং। (কলিকাতা ১৩৩২), "ভূমিকা" পৃ. [১]

২৭. আকরম খাঁ, "আলোচনা" **মাসিক মোহাম্মদী**, (আষাঢ় ১৩৪০), পৃ. ৬৪৭।
আদমুদ্দীন, **সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ**, (ঢাকা ; ১৯৬৫), পৃ. ১২৫-১২৬।

২৮. Bengal Library Catalogue (BLC). 1884 : 4, pp. 26-27.

২৯. ড. মুজীবুর রহমান-এর **বাংলো ভাষায় কুরআন-চর্চা** গ্রন্থে (১৪৯ পৃ.) ৮৭ সংখ্যক পাদটীকার তথ্যে ১৯২০ সাল না হয়ে ১৯০২ সাল হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। কারণ, ১৯০৯ সালে আব্বাছ আলি-র 'কোরান শরিফ'-এর প্রথম সংস্করণ মুদ্রণের কাজ আলতাফী প্রেসে শেষ হয়। তখনই প্রেসটি ৩৩ বেনেপুকুর রোডে অবস্থিত ছিল।

৩০. আকরম খাঁ (১৩৪০) **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৬৪৭ ; BLC : 1903 : 4 ; 1904 : 1 দ্রষ্টব্য।

৩১. আব্বাছ আলি, **কোরান শরিফ** (কলিকাতা : ১৩১৬) : [ভূমিকা]।

৩২. BLC : 1906 : 1 (March 1906), p. 51.
এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরে আলোচিত আকরম খাঁ দ্রষ্টব্য।

৩৩. BCL : 1907 : 1 (March 1907). p. 60 entry No. 1.

৩৪. BCI : 1908 : 1 (March 1908) ; কিন্তু ইসলাম প্রচারক ৭ : ১০ (মাঘ ১৩১২/ফেব্রুয়ারি ১৯০৬) "গ" পৃষ্ঠায় "মুহম্মদীয় বুক এজেন্সী"-র বিজ্ঞাপন অনুযায়ী-এর তিন খণ্ড ইতিমধ্যেই "বাহির হইয়াছে"।

৩৫. BLC : 1908 : II (June 1908). pp. 66, entry No. 4.

৩৬. BLC : 1908 : II (June 1908), pp. 66, entry No. 5.

৩৭. BLC : 1909 : VI (December (1909)

৩৮. মুজীবুর রহমান (১৯৮৬ : **প্রাগুক্ত,** পৃ. ১৫১) তাঁর ৯৭–সংখ্যক পাদটীকায় পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬০ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ তথ্য কোথা থেকে পেলেন তা বলেন নি। আমরা বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ হতে যে তথ্য পেয়েছি তাতে পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় (২২২+৭৫৪) = ৯৭৬। তা ছাড়া প্রথম সংস্করণের একটি কপি আমাদের সামনে রয়েছে এটির পৃষ্ঠা সংখ্যাও ৯৭৬। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের সঙ্গে এটি মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, প্রথম ২ পারা ২২২ পৃ. আর ৮ম থেকে ৩০ পারা ২২৩–৯৭৬ পৃ. অর্থাৎ ৭৫৪ পৃষ্ঠা হয়। কাজেই এতে অনুমানের অবকাশ নেই।

৩৮ক. আব্বাছ আলির তরজমার প্রথম খণ্ড থেকেই শাহ্‌ রফিউদ্দীন দেহ্‌লভীর উর্দু তরজমা সংযুক্ত আছে। এ জন্য অনেক উর্দু লেখক মনে করেন যে আব্বাছ আলি এটি রফিউদ্দীন–এর উর্দু থেকে বঙ্গানুবাদ করেন। কাসমী, আলী ও রিজভি (প্রাগুক্ত) তাঁদের গ্রন্থের ১৪৬ পৃষ্ঠায় বলেন যে রফিউদ্দীনের অনুবাদটির বঙ্গানুবাদ হয় ১৯৩০ সালে। ইকমেলেদ দীন ইহ্‌সানুগলু তাঁর "World bibliography of translation of ... the Quran (Istanbul : 1986), উক্ত উক্তিটিকেও ছাড়িয়ে গিয়ে সাইযারা ডাইজেস্ট এর বরাত দিয়ে বলেন যে '১৯৩০ সালে আব্বাছ আলি রফিউদ্দীনের একটি বঙ্গানুবাদ করেন। এ তথ্যটি সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন।

৩৯. "মিনার কোম্পানি"–র বিজ্ঞাপন, পৃ. ২–৩ ; **সুন্নত অল-জামায়াত,** ৩ : ৫ (বৈশাখ ১৩৪৩)।

৪০. উপর্যুক্ত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

৪১. আলী আহমদ, "বাঙলা ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ", **সাপ্তাহিক আরাফাত,** ১১ : বিশেষ কুরআন সংখ্যা (৬ ফাল্গুন ১৩৭৪ বাং) পৃ. ৬৫–৬৬।

৪২. মুজীবুর রহমান (১৯৮৬), **প্রাগুক্ত,** পৃ. ১২৩।

৪৩. উপর্যুক্ত।

৪৪. আলী আহমদ, **মুসলিম বাংলা গ্রন্থপঞ্জী,** (ঢাকা : ১৯৮৫), পৃ. ৪৪১।
মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, **বাংলা ভাষায় কুরআন-চর্চা,** (ঢাকা : ১৯৮৬), পৃ. ১৫৭-১৭৫।
মোতাহার হোসেন সুফী, "সাহিত্যসেবী তসলিমউদ্দীন আহমদ", **"বাংলা উন্নয়ন-বোর্ড পত্রিকা",** ২ : ১ (বসন্ত ১৯৭০), পৃ. ১২৭।

৪৫. রহমান, **উপর্যুক্ত,** পৃ. ১৬১।

৪৬. **কোর-আন ... আম নামক পারা** (কলিকাতা : ১৩১৫ বাং) ভূমিকা।

৪৭. মোতাহার হোসেন সুফী, **প্রাগুক্ত,** পৃ. ১৩৫।

৪৮. এই মতামতগুলো অনুবাদটির দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে "অনুবাদ সম্বন্ধে মত"—নামক শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে।

৪৯. দ্বিতীয় খণ্ডের "অনুবাদকের নিবেদন"।

৫০. উপর্যুক্ত।

৫১. তৃতীয় খণ্ডে "অনুবাদকের নিবেদন"—এ উদ্ধৃত।

৫২. প্রথম খণ্ডে "অনুবাদকের নিবেদন"।

৫৩. তৃতীয় খণ্ডে, "অনুবাদকের নিবেদন"।

৫৪. ABC Directory for the year 1910 (1909). Mufussil section, p. 405 ; Thacker Directory for the year 1911 (Calcutta : 1910), Mufussil section p. 415.
গোল্ডস্যাক সম্পর্কে বলতে যেয়ে মুজীবুর রহমান, **প্রাগুক্ত,** পৃ. ১৭৫ বলেন সে দেশে [অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ায়] ব্যাপকভাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পর ভারতে এসে তিনি [গোলডস্যাক] শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনে যোগ দেন ...]। এই তথ্যটি ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে গোল্ডস্যাক যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন তখন শ্রীরামপুর মিশনের অস্তিত্ব লুপ্ত। উইলিয়ম কেরী বঙ্গদেশে আগমনের পর ১০ জানুয়ারি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন স্থাপিত হয়। এটি ছিল বিলাতে প্রতিষ্ঠিত ব্যাপ্টিস্ট

মিশনারী সোসাইটির অধীনে একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন ও বিলাতের প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে মতদ্বৈধতা শুরু হয়। পরে ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর বিলাতের মূল মিশন থেকে আলাদা হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে বিলাতের মিশন কর্তৃক তাদের অধীনে কলকাতাতে অন্য একটি ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এক আপোষ নিষ্পত্তি অনুসারে জসুয়া মার্শম্যান এর মৃত্যুর পর ১০ এপ্রিল ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীরামপুরের সমস্ত দায়-দায়িত্ব কলকাতার ব্যাপ্টিস্ট মিশনে হস্তান্তরিত হয়। কাজেই দেখা যায় যে, গোল্ডস্যাকের জন্মের আগে থেকেই "শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন"-এর অস্তিত্ব ছিল না। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য বিলাতের ব্যাপ্টিস্ট মিশনের যেমন কলকাতাতে কার্যালয় ছিল তেমনি অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিস্ট মিশনেরও কার্যালয় ছিল ফরিদপুরে। গোল্ডস্যাক সেখানেই কাজ করতেন।

৫৫. রহমান (১৯৬৮), পৃ. ২০৩-২১৮।

আবদুল হাকিম, **বাংলো বিশ্বকোষ,** ১ম খণ্ড (ঢাকা : ১৯৭২), পৃ. ১৭৪।

৫৬. আবদুল করিম তাঁর **সিলসিলাতুল কুরআন,** (কলিকাতা : ১৯৩৪) পুস্তকে গ্রামের নাম 'সেহড়াতৈল' লিখেছেন।

৫৭. আবদুল করিম, **আল-কোরআন,** ২য় সং (কলিকাতা : ১৩৪৬)।

৫৮. আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, **বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত** (আধুনিক যুগ) ২য় সং। (চট্টগ্রাম : ১৩৮১ বাং), পৃ. ১৪৩।

৫৯. **আহলে হাদীস,** ১৯৩১ বিজ্ঞাপন।

৬০. **বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী** (১৯৮৬), পৃ. ৩৪৮-৩৫০।

৬১. মোহাম্মদ করিম বখশ, চরিত্রামৃত ... (কলিকাতা : ১৩১৭) , ভণিতা, বিজ্ঞাপন ও উদ্ধৃতি দ্র.। পৃ. [৯৭-৯৮]।

৬২. অনুবাদটি আমরা দেখি নি। মুজীবুর রহমান (১৯৮৬) পৃ. ২৩০-২৩৩ পৃ. এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

৬৩. রহমান, **উপর্যুক্ত,** আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৬৪. Shipley. **op. cit,** p. 591.

৬৫. মোহাম্মদ মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী, **কর্মবীর মাওলানা রুহুল আমিন,** (বয়ানঘাটা, ২৪ পরগনা : মোহাম্মদ উম্মেদ আলী, (১৩৫৫ বাং) পৃ. ২৮৮।

৬৬. **উপর্যুক্ত,** পৃ. ১১৫-১২০।

৬৭. **উপর্যুক্ত,** উদ্ধৃতি, পৃ. ১১২।

৬৮. রুহুল আমিন, **কোর-আন শরিফ .. পারা আ'ম**। ৩য় সং। (টাকা : ১৩৩২ বাং) ভূমিকা, পৃ.[১]

৬৮ক. মুজীবুর রহমান তাঁর **বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা-র** ২৮৩ পৃষ্ঠায় মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাকের বাংলা ভাষায় ইসলামী পুস্তকের তালিকার ৯৯ পৃষ্ঠার বরাত দিয়ে লেখেন, "আলোচ্য বছরে [অর্থাৎ ১৯২৫ সালে] 'কোরআন শরীফ' নাম দিয়ে আরও একটি তফসীর গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি আলিফ, লাম, মীম পারার বিস্তারিত ভাষ্য। ভাষ্যকারের নাম মওলানা আবু বাকর। প্রকাশনায় : রুহুল আমীন, কলকাতা, ১৯২৫ খ্রি.। "প্রথমত: গ্রন্থপঞ্জিকার আবদুর রাজ্জাক আখ্যা পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিবরণটি পড়তে ভুল করেছেন : এতে লেখা আছে "... সপ্রসিদ্ধ পীর . . . মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত ... রুহল আমিন কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।" মুজীবুর রহমান-এর কর্তব্য ছিল পুস্তকটি আবুবকর সম্বন্ধে এবং রুহল আমিন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। কারণ, তিনি এই অনুবাদকেরই আমপারার বর্ণনা দিতে গিয়ে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন (পৃ. ২৩৬)। আরও দেখুন গ্রন্থপঞ্জি অংশ।

৬৯. **শরিয়ত**, ২ : ১ (বৈশাখ ১৩৩২) শেষে "শরিয়ত বিজ্ঞাপনী", পৃ. ১-৩।

৭০. আলী আহমদ (১৯৮৬), **প্রাগুক্ত**, পৃ. ১৪৭-১৫০। আ. ন. ম. আবদুস সোবহান, **ফরিদপুরের কবি সাহিত্যিক**, (ফরিদপুর : ১৩৭৬), পৃ. ৪০-৪৩।

৭১. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, "সমাজ কর্মী সাহিত্যিক আবদুল হাকিম", **পাক সমাচার**, ১৭ : ২৭ (২৫ জুলাই, ১৯৬৯), পৃ. ৬।

৭২. ইজাবউদ্দীন আহমদ, দৈনিক **ইত্তেফাক** ২১ জুলাই, উদ্ধৃতি, **উপর্যুক্ত**, মনসুর উদ্দীন।

৭৩. উদ্ধৃতির জন্য : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও মোহাম্মদ আলি হাসান, **কোরান শরিফ** প্রথম পারা (কলিকাতা : ১৯৩৮), "নিবেদন" [১]-২ পৃ. দ্রষ্টব্য।

৭৪. উপর্যুক্ত [২]

৭৫. উপর্যুক্ত — প্রশংসা পত্রগুলো উক্ত প্রথম পারার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৭৬. উপর্যুক্ত।

৭৭. মোহাম্মদ আবু-বকর "কোরান-শরিফের বাঙ্গলা তরজমা ও তফসীর", **ইসলাম-দর্শন**, ৪ : ৪ (কার্তিক ১৩৩১), পৃ. ১২৫।

৭৮. খোন্দকার আন্‌ওয়ার আলি, "কোরান-শরিফের বঙ্গানুবাদ ও তফসীর", **ইসলাম-দর্শন**, ৪ : ২ (ভাদ্র ১৩৩১), পৃ. ৭৩।

৭৯. মোহাম্মদ মোয়েজদ্দিন হামিদী, "কোরান-শরিফ সম্বন্ধে অভিমত", **ইসলাম-দর্শন**, ৪ : ৪ (কার্তিক ১৩৩১), পৃ. ১২৭।

৮০. আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ১৪৩।

৮১. আলী আহমদ (১৯৬৮), **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৫৮।

৮২. হাকিম ও হাসান, "নিবেদন" পৃ. [১]।

৮৩. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-র জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে আজও কোনো পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয় নি। তাঁর সম্বন্ধে মাল-মসলা সংগ্রহ করতে যেয়ে তাঁর সম্বন্ধে লেখা সব কয়টি জীবনী দেখে বঙ্গদর্শনের সেই কৌতুকের কথাই মনে করে দিয়েছে আমাকে। ("নব বার্ষিকী, গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ" বঙ্গদর্শন, ৫ (১২৮৪) পুনর্মুদ্রিত সং। (কলিকাতা : ১৩৪৬), পৃ. ২৭৬-২৮২)। মওলানা আকরম খাঁ সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা প্রয়োজন। যথাশীঘ্র সম্ভব এটি করা যায় জাতির জন্য ততই মঙ্গলজনক। কারণ, এ জাতীয় গবেষণার জন্য যে সব প্রাথমিক উপাদানের প্রয়োজন পড়ে, তা দিন দিনই লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

৮৪. গিরিশচন্দ্র সেন, **কোরান শরিফ**, ৪র্থ সংস্করণ (কলিকাতা : ১৯৩৬), "শ্রদ্ধা নিবেদন" দ্রষ্টব্য।

৮৫. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, "মোহাম্মদী নাম পরিবর্তন", **মাসিক মোহাম্মদী**, ৫ : ১১ (ভাদ্র : ১৩৩৯), পৃ. ৮০৩।

৮৬. আবুল কাসেম, **বাঙ্গালার প্রতিভা**, (কলিকাতা : ১৩৪৭), পৃ. ১৮।

৮৭. সংশ্লিষ্ট বছরের Bengal Library Catalogue দ্রষ্টব্য।

৮৮. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, "মোহাম্মদীর নাম পরিবর্তন," **মাসিক মোহাম্মদী** ৫ : ১১ (ভাদ্র ১৩৩৯), পৃ. ৮০৩।

৮৯. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, "কোরানের তফসির", **আল-এসলাম** ২ : ৭ (কার্তিক ১৩২৩), পৃ. ৩৯৭-৪১০।

৯০. মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, "নিবেদন" আকরম খাঁ, কোরআন-শরিফ : আমপারা, (কলিকাতা : ১৯২২) পৃ. [১]-২।

৯১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, "কোরআনের দুইটি আদর্শ", **আল-এসলাম**, ১ : ১ (বৈশাখ ১৩২২), পৃ. ১৭-২৪।

৯২. আকরম খাঁ, "সুরা ফাতেহা (বঙ্গানুবাদ)" **আল-এসলাম**, ৪ : ২ (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫), পৃ. [১০৮]

৯৩. মোহাম্মদ আব্বাছ আলি, **কোরাণ শরিফ**, (কলিকাতা ১৩১৬), পৃ. ১

৯৪. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, **আমপারা**, (কলিকাতা : ১৯২২), পৃ. ৮

৯৫. **উপর্যুক্ত, ভূমিকা।**

৯৬. **মাসিক মোহাম্মদী**, ৩ : ১২ (আশ্বিন ১৩৩৭), বিজ্ঞাপন।

৯৭. আলী আহমদ (১৯৮৬), **প্রাগুক্ত**, পৃ. ১৪

৯৮. **Bengal Library Catalogue,** 1906 : 1 : 1, p. 51.

৯৯. **Ibid :** 1930 : 1, p. 35, Entry No. 955.

১০০. **Ibid** : 1938 : 4, p. 74. Entry No. 765.

১০১. **মাসিক মোহাম্মদী**, ২১ : ১ (কার্তিক ১৩৫৬), পৃ. ১।

১০২. কালানুক্রমিক গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

১০৩. আবুল কালাম শামসুদ্দিন, **অতীত দিনের স্মৃতি** (ঢাকা : ১৯৬৮), পৃ. ৫৫৯।

১০৪. মুজীবুর রহমান খাঁ, "তাফছীরুল কোরআন", **মাসিক মোহাম্মদী**, ৩০ : ৮ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬), পৃ. ৫৮১-৫৮৬।

"এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা," **মাসিক মোহাম্মদী**, ৩৯ : ৯ (আষাঢ়, ১৩৭৫), পৃ. ৫৭৬-৫৮০

১০৫. আবদুল কাদির, "কুরআন মজীদের বাংলা অনুবাদ", **ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা**, ১ : ১ (এপ্রিল-জুন ১৯৬১), পৃ. ১৩০।

১০৬. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, "খাঁ সাহেবের তফসিরের প্রতিবাদ", **ছুন্নত আল-জমায়াত**, ৭ : ৫ (বৈশাখ ১৩৪৭), পৃ. ২৫৬-২৬৪ ; ৭ : ৭ (আষাঢ় ১৩৪৭), পৃ. ৩৫৩—৩৫৬ ; ৭ : ৯ (ভাদ্র ১৩৪৭), পৃ. ৪৫৩-৪৫৬ ; ৭ : ১০ (আশ্বিন ১৩৪৭), পৃ. ৫০১-৫০৪ ; ৭ : ১২ (অগ্রহায়ণ ১৩৪৭), পৃ. ৫৯৭-৬০০ ; ৮ : ১ (পৌষ ১৩৪৭), পৃ. ২৯-৩২।

১০৭. আবদুছ ছাত্তার, **তফসিরের নামে সত্যের অপলাপ**, (ফরিদপুর : ১৯৬০)

১০৮. আজিজুল হক, **পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা**, (ঢাকা : ১৯৬০)

১০৮. মুজাফ্ফর আহমদ, **উলানিয়া কাহিনী** (বরিশাল : ১৯৪৬), পৃ. ৩১-৩৭।

রহমান, (১৯৮৬) **প্রাগুক্ত**, পৃ. ২৮৪-২৯০, এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১১০. ক. প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপন : **মাসিক মোহাম্মদী**, ৫ : ৫ (ফাল্গুন ১৩৩৯), **বিজ্ঞাপন।**

খ. দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপন : **মাসিক মোহাম্মদী**, ৬ : ১ (কার্তিক ১৩৩৯), **বিজ্ঞাপন।**

১১১. মুজীবুর রহমান, (১৯৮৬) **প্রাগুক্ত**, ২৭৪ পৃষ্ঠার 'বাদপুর' নিশ্চয়ই মুদ্রণ-প্রমাদ। কারণ, অনুবাদকের "২য় পারা-ছায়্যাকূল"-এর "আত্ম-কথা"-য় "মাদপুর, পোঃ সরিষা, ২৪ পরগণা" লেখা রয়েছে।

১১২. উপর্যুক্ত, পৃ. ২৭৪-৭৫। জনাব রহমান তাঁর গবেষণাকালে মাদপুর বসবাসরত নকীবুদ্দীন খাঁর দুই পুত্র আবদুস সালাম ও আবদুস সামাদ-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে এই তথ্য অবগত হন।

১১৩. **আহলে হাদিস**, ১ : ৩০ (১২ জুলাই ১৯২৮), পৃ. ৬।

১১৪. "মিনার কোম্পানি"-র বিজ্ঞাপন, পৃ. ২-৩ ; **সুন্নত আল-জামায়াত**, ৩ : ৫ (বৈশাখ ১৩৪৩)

১১৫. বঙ্গানুবাদ আমপারা। ২য় সং। (কলিকাতা ১৩৪৬), মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় মূল্য সহ পুস্তকগুলো বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

১১৬. **আমপারা**। ২য় সং। (কলিকাতা ১৩৪৬), বিজ্ঞাপন।

১১৭. Bengal Library Catalogue : 1938 : Qtr. 3.

১১৮. বিভিন্ন পারায় বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

১১৯. পূর্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১২০. **বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ**, ১ম পারা আলিফ-লাম-মীম (কলিকাতা : ফাল্গুন, ১৩৫১), মলাটের শেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞপ্তি।

১২১. **কোরান-প্রচার**, ২ : ১ (কার্তিক ১৩৫৬ বাং), প্রচ্ছদের শেষ আভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন।

১২২. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯। প্রকৃতপক্ষে এ পৃষ্ঠাঙ্ক "প্রত্যেক পৃষ্ঠায়" নয়, প্রতি দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বা এক পৃষ্ঠা অন্তর অন্তর হবে। উদাহরণ স্বরূপ "৩য় পারা — তেলকার্রোছোল" শিরোনাম যুক্ত পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠাঙ্ক নেই কিন্তু পরবর্তী পৃষ্ঠার পৃষ্ঠাঙ্ক [দুই আনা] ; অনুরূপভাবে "৪র্থ পারা লান্‌তালা"-তে কোনো পৃষ্ঠাঙ্ক নেই কিন্তু তদ্‌পরবর্তী পৃষ্ঠাঙ্ক [দুই আনা]। ডক্টর মুজীবুর রহমান তাঁর গ্রন্থের সর্বত্র এ জাতীয় ভুল করেছেন। এ জাতীয় ভুল পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে বাধ্য।

প্রকৃতপক্ষে [দুই আনা] — কোনো চিহ্ন নয়। ইহা বাংলা টাকা-আনার দুই আনা লেখার অঙ্ক। বাংলায় মুদ্রাক্ষর প্রবর্তনের শুরু থেকে পুস্তকের প্রারম্ভিক পৃষ্ঠাগুলোতে [এক আনা] [দুই আনা] ইত্যাদি পৃষ্ঠাঙ্ক দেয়া হতো। এভাবে পৃষ্ঠাঙ্ক যদি ষোল হতো তবে ১ (এক টাকা) এর তদূর্ধ্বে এক টাকা এক আনা, এক টাকা দুই আনা ইত্যাদি পৃষ্ঠাঙ্ক দেয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু বাংলা মুদ্রায় দশমিক পদ্ধতি প্রবর্তনের পর হতে বাংলা মুদ্রাক্ষরে [এক আনা, দুই আনা] ইত্যাদি সংখ্যা উঠে যাওয়ায় এখন ১, ২, ক, খ কিংবা ইংরেজির মতো রোমান (i, ii) ইত্যাদি সংখ্যাতে প্রাথমিক পৃষ্ঠাগুলো চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

১২৩. রহমান, **উপর্যুক্ত**, পৃ. ২৮১।

১২৪. মোহাম্মদ মুছা, সহকারী সম্পাদক "কোরাণের বঙ্গানুবাদ", **আহলে হাদীস** (মাসিক) ৪ : ৫ (মাঘ ১৩২৫), ৯ : ১-৭ (আশ্বিন-চৈত্র ১৩৩০) দ্রষ্টব্য।

১২৫. **কোরানপ্রচার**১ : ১ (কার্তিক ১৩৫৫), পৃ. ১।

১২৬. আলী আহমদ (১৯৮৬), **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৩৬৩-৩৬৪ ; আবদুল গণি মাহমুদ "ড. কুদরাত-ই-খুদা" **দৈনিক ইত্তেফাক**, (৪ নভেম্বর, ১৯৭৭), পৃ. ১, ৫, ৮।

মুজীবুর রহমান (১৯৮৬), **প্রাগুক্ত**, ৪৬৯ পৃষ্ঠায় বলেন যে "কুদরাত-ই-খুদা তাঁর এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় আরবি শব্দমালাকে বাংলা উচ্চারণ করতে গিয়ে বাংলা অনুলিপির যে রীতি অবলম্বন করেছেন তা তিনি ব্যক্ত করেছেন এই ভূমিকার মধ্যে। অবশ্য এতে তাঁর দু-একটা ভুলও যে না হয়েছে এমন কথাও নয়। যেমন আরবি বর্ণমালার চতুর্থ অক্ষর 'সে'। একে তিনি সব সময় 'থ' দ্বারা লিখেছেন"। দুর্ভাগ্যের কথা হলো এ বিষয়ে মুজীবুর রহমান নিজেই ভুল করেছেন। আমরা সব সময়ই আরবদের আরবি বর্ণমালার চতুর্থ অক্ষরটিক 'থ'এর মতই উচ্চারণ করতে দেখতে পাচ্ছি। অক্ষরটির উচ্চারণ এমন যে ইংরেজি th দিয়ে এর প্রতিবর্ণায়ন করা হয়। বাংলা 'থ'ই হল এর শুদ্ধ রূপে বাংলা প্রতি বর্ণায়ন। যেমন হাদিস, উথমান, থুম্মা, কাওথার, থানি ইত্যাদি। কুদরাত-এ-খুদা ছিলেন কুরআনে হাফিজ। তার প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি দেখে মনে হয় তাঁর কুরআন পাঠ ছিল নিখুঁত।

১২৭. আব্দুল কাদির (১৯৬১), **প্রাগুক্ত**, পৃ. ১২৭।

পাকিস্তান যুগে কুরআন বঙ্গানুবাদের অগ্রগতি

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে বঙ্গদেশ দু'ভাবে ভাগ হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত একটি রাজ্যে পরিণত হয় ; আর পূর্ববঙ্গ আসামের সিলেট জেলা নিয়ে পাকিস্তানের পূর্বাংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়। এর ফলে বাঙালি মুসলমানদের রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে "ইসলামিক আযাদী"ও অর্জিত হয়। মাত্র এক শতাব্দী পূর্বে তিতুমীরের অধিনায়কত্বে কিংবা দুদু মিঞার নেতৃত্বে যে জাতি 'শাহাদাত' বরণ করছিল তাঁদেরই বংশধরগণ ইসলামের নামে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো।[১] ইসলামের সঞ্জীবনী শক্তি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা–দীক্ষা, ধর্ম–কর্ম, সংস্কৃতি–সভ্যতা এবং ভাষা–সাহিত্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল।

বাঙালি মুসলমানগণ এতদিন তাঁদের সাহিত্যকর্ম, পুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিপণনে কলকাতার উপর নির্ভরশীল ছিল। সামগ্রিকভাবে সকল সাহিত্যকর্মই ছিল কলকাতা–কেন্দ্রিক। আমরা দেখেছি নইমুদ্দীন ও আবদুল করিম স্ব স্ব কর্মক্ষেত্র ছেড়ে কুরআন অনুবাদের জন্য কলকাতায় বসতিস্থাপন করেছেন। ভারতবিভাগের পর অচিরেই ঢাকা কলকাতার স্থলাভিষিক্ত হয়। ইসলামি ভাবধারায় সাহিত্য সৃষ্টি ও ইসলামি সাহিত্য প্রকাশনার সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে নতুন করে কুরআন, হাদিস, তফসির ইত্যাদি গ্রন্থের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। চাহিদা পূরণে আর কলকাতার উপর নির্ভরশীল না হয়ে ঢাকা তথা পূর্ব পাকিস্তানই এ–বিষয়ে কর্মতৎপর হয়ে উঠে।

তফসীরে আশারাফী

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানদের কুরআনের বঙ্গানুবাদের এ চাহিদা পূরণে এগিয়ে আসে ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান এমদাদিয়া লাইব্রেরি। কিন্তু তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে কুরআনের একটি বঙ্গানুবাদ করতে না যেয়ে মওলানা আশরাফ আলী থানবী কৃত 'বয়ান আল–কুরআনে'র বঙ্গানুবাদ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, এ উপমহাদেশে ইংরেজি, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় ইতিমধ্যে যে ক'টি তরজমা ও তফসির প্রকাশিত হয়েছে তন্মধ্যে 'বয়ান আল–কুরআন' অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত। এ অনুবাদ ও তফসিরের বৈশিষ্ট্য[২] হলো :

১. কুরআনের বিষয়াবলীর বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ;
২. পূর্বাপর সম্বন্ধে সংবলিত প্রতিটি সূরা ও আয়াতের আলোচনা ;

৩. একই বিষয়ে বিভিন্ন আয়াত কিংবা সম্পর্কযুক্ত শব্দাবলী একটি নির্দিষ্ট শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত করে সবগুলো আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা, ভাবার্থ ও টীকা-টিপ্পনী ;

৪. বিশুদ্ধ বর্ণনার উপর ভিত্তি করে রচিত তফসির ;

৫. হুবহু অনুবাদ ;

৬. কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিভিন্ন প্রশ্নের মীমাংসা ;

৭. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মোফাস্‌সিরদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত মতের সংকলন।

ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম মওলানা আশরাফ আলী থানবী[3] যুক্ত প্রদেশের মুজাফ্‌ফর নগর জেলার থানা ভবন শহরে ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে তাঁর দেহাবসান হয়। মওলানা থানবী বাল্যকালেই কুরআনে হাফিজ হন এবং বিশ বছর বয়সে দেওবন্দ দারুল-উলুম-এর পাঠ সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি দীর্ঘ ১৪ বৎসর কানপুর জামিউল-উলুম-এ অধ্যাপনা করেন। এ সময়েই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পরে। আঠার বছর বয়ঃক্রম থেকেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। ইসলাম সম্পর্কিত এমন কোনো বিভাগ নেই, যে বিষয়ে তিনি কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। বলা হয় যে, তিনি আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় প্রায় এক সহস্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রায় শতাধিক গ্রন্থ ইংরেজি, বাংলা, ফারসি, সিন্ধি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

তাঁর অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে 'বয়ান আল-কুরআন' সমগ্র উপমহাদেশে বিখ্যাত। এমদাদিয়া লাইব্রেরির মালিকগণ এ বিখ্যাত গ্রন্থেরই বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার জন্যে একটি অনুবাদক ও সম্পাদনা পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত বয়ান আল-কুরআন 'তফসিরে আশরাফী' নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রতি পারা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে।

অনুবাদটির প্রথম পারার প্রথম সংস্করণ আমরা দেখতে পাই নি। তবে এর ছয় খণ্ডে প্রকাশিত অনুবাদের প্রথম দিকে "অনুবাদক ও সম্পাদনা বিভাগের কর্মীবৃন্দ" লিখিত "আমাদের দৃষ্টিকোণ" নামক ভূমিকার তারিখ ২৬ মহররম, জুমআ, ১৩৬৯ হিজরি। অতএব দেখা যায়, অনুবাদটির প্রথম পারা প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। অনুবাদটির ২৯ ও ৩০ পারার প্রথম সংস্করণ আমরা দেখেছি। এ দু'টি পারা ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়। আমরা সম্ভাব্য প্রতিটি সংগ্রহশালার সংরক্ষিত প্রত্যেকটি পারার গ্রন্থবিবরণী সংগ্রহ করেছি ; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে প্রথম সংস্করণের একটি গ্রন্থের গ্রন্থবিবরণী তৈরি করা সম্ভব হয় নি। তবে অনুবাদটি যে ১৯৪৯ সালে প্রকাশ শুরু হয়ে ১২ বছর পর ১৯৬১ সালে শেষ হয়েছে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি। অনুবাদটির প্রথম মুদ্রণ শেষ হলেই সমগ্র অনুবাদ ৬ বালামে বাঁধাই করে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। তফসিরে আশরাফীর প্রতিটি পারায় স্বতন্ত্র পৃষ্ঠা সংখ্যা দেয়া থাকে। অনুবাদটির প্রতিটি পারা আলাদা এবং সংযুক্তভাবে ৬ বালামে পাওয়া যায়।

কুরআনেরই একজন বঙ্গানুবাদক এমদাদিয়া লাইব্রেরি প্রকাশিত "তফসীরে আশরাফী"-কে বাংলা ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত তফসিরগুলোর মধ্যে "সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য"[৪] বলে প্রশংসা করেছেন। আলোচ্য 'তফসীরে আশরাফী' ছাড়াও এমদাদিয়া লাইব্রেরি মওলানা থানবী-র উর্দু ভাষ্যের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণও প্রকাশ করে আসছেন। এটি অনুবাদ করেন মওলানা নূরুর রহমান। "বঙ্গানুবাদিত নূরানী কোরআন শরীফ" নামে আখ্যায়িত এ অনুবাদটির ৪র্থ মুদ্রণ ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়।

আশরাফ আলী থানবী-র বয়ান আল-কুরআনের অন্য একটি অনুবাদ করেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার বাঁখুড়িয়া গ্রামের (ডাকঘর বড় আলুন্দা) শেখ আবদুল ওয়াহীদ। এ অনুবাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শেখ আবদুল ওয়াহীদ বলেন :

> বাঙলা ভাষায় যে দুই একটি অনুবাদ বাহির হইয়াছে তাহার ভাষা স্বল্প শিক্ষিত মুসলমানদের নিকট সহজবোধ্য নয়। তদূপরি তাহার হাদিয়াও এত অধিক যে দরিদ্র মুসলমান ভাইগণের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্ট সাধ্য। স্বল্প-শিক্ষিত ও দরিদ্র বাঙালী মুসলমানগণের এই অসুবিধার কথা উপলব্ধি করিয়া একটি সহজবোধ্য ও সুলভ বঙ্গানুবাদ বাহির করিবার সঙ্কল্প বহুদিন হইতে মনের মধ্যে পোষণ করিতেছিলাম। এক্ষণে আলাহ্ তায়ালার অপার করুণায় আমার সেই স্বপ্ন সার্থক হইল। অনুবাদ যথাসাধ্য সরল ও সহজ বোধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হাদিয়া যথাসম্ভব কম করিবার বাসনায় বিস্তারিত তফসির দেওয়া সম্ভব হয় নাই। অবশ্য পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রয়োজন মত সংক্ষিপ্ত টীকা সংযোজিত করিয়াছি।

শেখ আবদুল ওয়াহীদ কর্তৃক অনূদিত আশরাফ আলী থানবীর বয়ান আল-কুরআনের এ অনুবাদটি খান বাহাদুর মোহাম্মদ জান, এম. এল. সি-র অর্থ ব্যয়ে কলকাতার দারুল এশায়াত ইসলামিয়া কর্তৃক ১৯৬২ সালে (মহররম ১৩৮৪ হি:) প্রকাশিত হয়। প্রকাশক আতাউর রহমান কুদসী তাঁহার 'নিবেদন'-এ জানান যে "অনুবাদটি দশগুণ সমন্বিত"। বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহের যথযথ উত্তর, আয়াত সুরা সমূহের পরস্পারের সম্বন্ধ, অনুবাদে ভাষা মাধুর্য্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে মূল আরবি শব্দের প্রতিশব্দ বয়ান, সহি হাদিসের ভিত্তিতে অনুবাদ ভাব ব্যক্ত করণ, অনাবশ্যক আলোচনা পরিহার, ফেকাহ্র মসলার যথাযথ উপস্থাপন, 'মোতাকাদ্দেমীন ও মোতাখ্খেরীন"-দের মত গ্রহণ, চারি ইমামের মতবিরোধী মসলা সমূহে একমাত্র ইমাম আবু হানিফর মত গ্রহণ, প্রয়োজনে আয়াতের অর্থ অথবা ঘটনাকে সরলভাবে বোঝার জন্য পাদটীকা এবং সহজ ও সরল ভাষা — এই দশটি গুণ এ "অনুবাদের বৈশিষ্ট্য" বলে দাবি করেন।

ডান দিকের পৃষ্ঠায় আরবি এবং বাম দিকের পৃষ্ঠায় বঙ্গানুবাদ এবং বঙ্গানুবাদের পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত পাদটীকা দেয়া হয়েছে। অনুবাদটির একটি কপি আমরা জেদ্দার কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে দেখেছি। এর অন্য কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানা যায় নি।

খানবাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ

আলহাজ খানবাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ৫ ১৮৮৭ সালে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার ভাণ্ডারীকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০৮ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে এন্টান্স পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯১৩ সালে তিনি গণিতে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করে ১৯১৪ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপকরূপে প্রথম চাকরিতে যোগদান করেন। শিক্ষা বিভাগেই তিনি কর্মজীবন অতিবাহিত করে ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা পরিদফ্তরের সহকারী পরিচালক পদে থাকাকালে অবসরগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ ও পরে রেক্টর পদে দায়িত্ব পালন করেন। খানবাহাদুর ১৯৬৪ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ৭৬ বৎসর বয়সে জান্নাতবাসী হন।

আবদুর রহমান খাঁ অনেক পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছেন। এগুলো তৎকালে শিক্ষার মান প্রতিষ্ঠায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তদুপরি তিনি ইসলাম সম্বন্ধীয় বেশ কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

অবসরজীবনে তিনি পবিত্র কুরআন অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। সর্বপ্রথম তিনি কুরআনের পাঁচটি সুরা— "পাঁচ সুরাশরীফ" আখ্যায় প্রকাশ করেন। এটি ১৯৪৮ সালে কাজী মুহম্মদ বশীর কর্তৃক ঢাকার প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়।

পাঁচ সুরা প্রকাশের পরপরই তিনি কুরআনের ত্রিশ সংখ্যক পারা 'আমপারা'-র অনুবাদে মনোনিবেশ করেন। অনূদিত 'আমপারা'টি ১৯৫০ সালে পুনরায় কাজী মুহম্মদ বশীর কর্তৃক প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়।

তাঁর অনূদিত সমগ্র 'কুরআন' তিন খণ্ডে প্রকাশ লাভ করে। এর প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড ১৯৫২ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দশ পারা করে। অনুবাদটির প্রারম্ভে ভূমিকা হিসেবে ৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি "ইসলাম পরিচিত"ও আছে। এই "ইসলাম পরিচিতি"ই আলাদা পুস্তক হিসেবে কুরআনের অনুবাদ প্রকাশের পূর্বেই ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়।

তিন-তিন খণ্ডে প্রকাশ ছাড়াও আবদুর রহমান খাঁর অনুবাদ পারা হিসেবে আলাদা ভাবে প্রচারিত হয়। আমরা এর কয়েকটি পারা সংরক্ষিত অবস্থায় দেখেছি। তদুপরি 'জওয়াহিরুল কুর-আন' নামে তিনি কুরআনের নির্বাচিত আয়াত সমূহের অনুবাদসহ একটি সংকলনও প্রকাশ করেন ১৯৬২ সালে। কুরআন অনুবাদের পর তিনি তিন খণ্ডে হাদিস শরিফের অনুবাদও প্রকাশ করেন।

আবদুর রহমান খাঁ অনূদিত কুরআনের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। পুনরায় এটি ১৯৭৯ সালে প্রকাশ লাভ করে। উভয় মুদ্রণে অনুবাদকের ভূমিকার তারিখ ছিল ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩। সম্ভবত অনুবাদকের মৃত্যুজনিত কারণে আর কোনো সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

আবদুর রহমান খাঁ অনূদিত কুরআনের কোনো বিস্তারিত সমালোচনা আমরা দেখতে পাই নি। অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে "খানবাহাদুরের আরবী জ্ঞান নির্ভরযোগ্য ছিল না বলিয়া অনুবাদের ও টীকা-টিপ্পনীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না।"[৬] তবে, কুরআনেরই অন্য একজন অনুবাদক মওলানা মোহাম্মদ তাহের একে "সমধিক নির্ভরযোগ্য"[৭] বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কবি গোলাম মোস্তফা

কবি গোলাম মোস্তফা[৮] যশোরের মনোহরপুর গ্রামে ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গোলাম রব্বানী ছিলেন একজন স্বভাব কবি। পিতামহ কাজী গোলাম সরওয়ার আরবি– ফারসি শিক্ষিত আলেম হিসেবে একজন নামকরা ব্যক্তি ছিলেন।

কলকাতার রিপন কলেজ থেকে কবি গোলাম মোস্তফা ১৯১৮ সালে বি. এ. পাশ করেন। ১৯২০ সালে বারাকপুর সরকারি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। দীর্ঘ বিশ বছর শিক্ষা বিভাগে চাকরি করার পর তিনি ১৯৫০ সালে অবসরগ্রহণ করেন এবং ঢাকায় বসবাস করতে থাকেন। ১৯৬৪ সালের ১৩ই অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

কবি গোলাম মোস্তফা সর্বমোট ২৬টি গ্রন্থের প্রণেতা। গ্রন্থগুলোর মধ্যে আছে ১৬টি কাব্য ৫টি জীবনী, একটি ইতিহাস, ২টি রাজনীতি বিষয়ক, ১টি প্রবন্ধ সংকলন ও কুরআনের অনুবাদ। এগুলো ছাড়াও তিনি অনেক পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'বিশ্বনবী' অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়।

কবি গোলাম মোস্তফা আরবি-ফারসি অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন না, তথাপি কেন কুরআন অনুবাদে ব্রতী হলেন তাঁর একটি ব্যাখ্যা তিনি নিজেই তদনূদিত "আল-কুরআন্ বাংলা তর্জমায়" দিয়েছেন। কবির মতে, পূর্ববর্তী তফসিরকারদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা থেকে তাঁর অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় অনেক স্থানে পার্থক্য ঘটেছে বলে বিব্রত হওয়ার কারণ নেই। কারণ, আরবি, উর্দু, ইংরেজি, বাংলা যতগুলি তফসির তিনি দেখেছেন, তাদের মধ্যে কারো সঙ্গে কারো হুবহু মিল নেই। অনেক ক্ষেত্রেই এক একজন এক একরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন:

> কুরআনকে যদি নিঃশেষে কেহ বুঝিয়া ফেলিত, তবে আর তার তেমন মূল্য থাকিত না। এই জন্যেই প্রত্যেক যুগের আলেমগণ কুরআনের ব্যাখ্যা পরীক্ষা করিলে ক্ষতিও কিছু হয়ই না বরং কুরআন বিশ্ব সত্যের উৎস মূল বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। [অতএব] নূতন বাখ্যার প্রয়োজন আছে। বলা বহুল্য, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে সে চেষ্টা আমি করিয়াছি। অবশ্য নিজের মনগড়া কোন উক্তি বা মতবাদ দেই নাই; বহু তফসির আলোচনা করিবার পরই নিজের মতটি দিতে সাহস করিয়াছি।

কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী "মোট ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ" করতে মনস্থ করেন। এর প্রথম খণ্ডে সুরা ফাতিহা ও সুরা বাকারা স্থান লাভ করে। "অবশিষ্টাংশ" তিনি "সুবিধামত ভাগ" করে নিতে মনস্থ করেন। কবি মওলানা আবদুল আলী, মওলানা সাখাওয়াতুল্লাহ্ ও মওলানা আমিনুল ইসলাম প্রমুখ আলেমের সাহায্যে— "কাব্য, সাহিত্য ও দর্শন-বিজ্ঞানের আলোকে" এ অনুবাদ করেন। এতে আছে মূল আরবি আয়াতের পাশে বঙ্গানুবাদ আর পাদটীকায় ব্যাখ্যা ও ভাষ্য। আকরম খাঁ অনূদিত কুরআন শরীফ থেকে সুরা ফাতিহা আর ইউসুফ আলীর ইংরেজি অনুবাদ থেকে সুরা বাকারার আরবি মূলের চিত্রলিপির ব্লক তৈরি করে নিজ অনুবাদের আরবি অংশ মুদ্রিত করেন। "প্রথম খণ্ড যদি সার্থক হয় এবং পাঠক সমাজ যদি উৎসাহ দেন, তবেই পরের খণ্ডগুলি ত্বরান্বিত হইবে" বলে অনুবাদক আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সম্ভবত পাঠক সমাজের উৎসাহের অভাবেই আর পরবর্তী খণ্ডগুলো প্রকাশ লাভ করে নি। তিনি বলেন :

> কুরআন-শরীফ . . . এক অতল সমুদ্র বিশেষ। শুধু আলেম সমাজের চোখ দিয়া দেখিলেই এর সবদিক দেখা হয় না। সব জিনিস সকলে দেখেও না বা একই রকম দেখে না। একজন আলেম ধর্মের চোখে একটি জিনিসকে যেরূপ দেখেন, একজন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তাহাকে অন্যরূপে দেখেন, পক্ষান্তরে একজন কবির চোখে তাহা আর এক নূতন রূপে প্রতিভাত হয়। কাজেই কুরআন-শরীফকে বহু দৃষ্টি-কোণ হইতে দেখার প্রয়োজন রহিয়াছে। এমন কি বিধর্মীরা কুরআনকে কী চোখে দেখে তাহাও আমাদের জানা উচিত। একদেশদর্শিতার দ্বারা কুরআনের মহিমাকে বরং ক্ষুণ্ন করাই হয়।

তিনি আরো বলেন :

> জ্ঞান, চিন্তা ও ধারণা ক্রমবিবর্তনশীল। এক যুগে যাহা বুঝা যায় না, পরবর্তী যুগে নূতন চিন্তা ও গবেষণার ফলে তাহা বুঝা সহজ হয়। পক্ষান্তরে এমনও হইতে পারে ; আলেম-সমাজের কাছে যাহা দুর্বোধ্য থাকে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের কাছে তাহার সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আজ জগতে যে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব বা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, তার মূলে আছে পাক্-কুরআনের প্রেরণা। আলেম সমাজ নিজেদের ব্যাখ্যা লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন, অথচ বিধর্মীরা সেই কুরআনের মধ্যেই নূতন সত্যের ইংগিত পাইয়া নব নব অবিষ্কারে জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করিতেছেন।

অতএব, "বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে মহাগ্রন্থ কুরআন-পাকের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য দিবার আজ প্রয়োজন ঘটিয়াছে। চিরাচরিত একঘেয়ে ব্যাখ্যায় কুরআন-শরীফের মহিমা ক্ষুণ্ণ হইতেছে"। সুতরাং, কবি "আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোকে [কুরআনের] ব্যাখ্যা

দিতে চেষ্টা করেছেন" অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি "অমিল অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ভাবানুবাদ" করেন।[৯]

কবি গোলাম মোস্তফার আল-কুরআন্ (বাংলা তরজমা) ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে ঢাকার "মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে বেগম মাহফুজা খাতুন কর্তৃক প্রকাশিত" হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এতে সুরা ফাতিহার ও সুরা বাকারা স্থান লাভ করে। সম্ভবত কবির অনূদিত কুরআনের আর কোনো 'খণ্ড প্রকাশিত হয় নি। তবে তিনি যে ধারাবাহিকভাবে সমগ্র কুরআন অনুবাদ করে যাচ্ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক ওয়ালী আহমদ, বেগম মাহফুজা খাতুন সম্পাদিত 'নওবাহার পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা সংরক্ষণ করে গেছেন কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ড-এ (বর্তমান বাংলা একাডেমী)। পত্রিকাটিতে কবি গোলাম মোস্তফা অনূদিত কুরআন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। পত্রিকাটির ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় সুরা নিসার অনুবাদের ১০ আয়াত পর্যন্ত[১০] প্রকাশিত হয়। এ সংখ্যাটির পর নওবাহার কিংবা কবির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানা যায় নি।

এ. কে. আহমদ খান

১৯৫৮ সালে এ. কে. আহমদ খান এম. এ. কুরআনের প্রথম পারার বাংলা অনুবাদ করেন। অনুবাদটি ঢাকার তেজগাঁ থেকে নুরুন্নাহার খানম কর্তৃক ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। ঢাকার সিটি প্রেস থেকে এ খণ্ডটির ৫০০০ কপি ছাপা হয়। বাম স্তম্ভে বঙ্গানুবাদ আর ডান স্তম্ভে আরবি সংবলিত এ অনুবাদটির একটি মাত্র কপি আমরা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র সংগ্রহে দেখেছি। সম্ভবত অনুবাদটির আর কোনো খণ্ড ছাপা হয় নি।

আবুল আ'লা মওদূদী

মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী[১১] (১৯০৩-১৯৭৯) ইসলামি জগতে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ছয় খণ্ডে অনূদিত তাঁর বিখ্যাত উর্দু তরজমা 'তাফহিম আল-কুরআন' ১৯৪৯ থেকে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। এ অনুবাদটি ইংরেজি, হিন্দী, গুজরাটি , মালয়ালাম ইত্যাদি বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় এ অনুবাদটি সর্বপ্রথম ভাষান্তরিত করেন মওলানা আবদুর রহীম। এর প্রথম পারার প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯ সালে ঢাকাস্থ কাওসার পাবলিকেশনস্ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এর দ্বিতীয় পারা থেকে ৩০ পারা ইসলামি পাবলিকেশন্স প্রকাশ করে। মওলানা মওদূদীর উর্দু ভাষ্যের অন্য একটি বঙ্গানুবাদ করেন আবদুল মান্নান তালিব। এ অনুবাদটি সম্পাদনা করেন আব্বাস আলী খান। এ অনুবাদটি ১৯ খণ্ডে ১৯৮০-১৯৮৭ সালে আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।।

এ অনুবাদটিরই একটি সংস্করণ কলকাতার বাংলা ইসলামী ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পুনরায় এটি ঢাকাস্থ ফালা-ই আম ট্রাস্ট কর্তৃক ১৯৮২ সালে পুনর্মুদ্রিত হয়। রাজনৈতিক দল 'জামায়াত ইসলামী' নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমও মওদূদীর তাফহিম-এর সারসংক্ষেপ বঙ্গানুবাদ শুরু করেছেন। তিনি প্রথম ১৯৮২ সালে ' আম পারা'-র অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। মে, ১৯৯২ পর্যন্ত আমপারা থেকে শুরু করে ২৬ পারা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। বাকি অংশগুলো অনূদিত হচ্ছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে।

হাকীম আবদুল মান্নান

হাকীম আবদুল মান্নান কথ্য ভাষায় সরল সহজ একটি বাংলা অনুবাদের প্রয়োজন অনুভব করেন ; কারণ তাঁর মতে " পবিত্র কোরানের মূল ভাষা কথ্য"। কাজেই তিনি কথ্য ভাষায় একটি অনুবাদে হাত দেন। তিনি মুসলিম জাহানের "প্রায় একুশ জন বুজুর্গ মনীষীর অনুসরণ"[১২] এ অনুবাদটি সম্পন্ন করেন। তাঁর "এই তরজমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য : এতে কোন ব্যাখ্যা, পাদ-টীকা ও বন্ধনী নেই।" তাঁর মতে "এতে বিব্রত হওয়ার কোন কারণও নেই। কোনও আয়াত বুঝতে না পারলে বা বুঝে না আসলে তার কতখানি ঠিক হল এ কথা জানা খুবই দরকার। কিন্তু এই প্রয়োজন মেটাবার উপায় হচ্ছে দ্বীনদার বুজুর্গ উলামাগণের সঙ্গে সাহচর্য্য ও তাঁদের সাথে আলাপ আলোচনা"।[১৩]

হাকীম আবদুল মান্নানের অনুবাদের সঙ্গে মূল আরবি অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। তবে মূল আরবির সাথে মিলিয়ে দেখার জন্য কুরআনের আয়াত ও রুকুর সংখ্যা ও সুরার নাম লেখা রয়েছে এ অনুবাদে। হাকীম সাহেব সর্বপ্রথম পকেট সাইজে আলাদা আলাদাভাবে পারা হিসেবে অনুবাদটি প্রকাশ করতে থাকেন। সর্বপ্রথম ১৯৬২-৬৩ সালে প্রথম চার পারা প্রকাশিত হয়। পকেট সাইজের প্রতিপারার 'হাদিয়া' ছিল পঁচিশ পয়সা।" এক টাকার ডাক টিকেট পাঠালে কিংবা মনিঅর্ডার করলে বিনা খরচে"[১৪] এটি সরবারহ করা হতো। পকেট সাইজের এ সংস্কণটির পরিবেশক ছিলেন "সাহিত্যসেবক,[১৫] দক্ষিণ মৈশন্ডী, ঢাকা"[১৫] কিন্তু বিজ্ঞপ্তিতে পত্রাদি লিখবার ঠিকানা ছিল "হাকীম আবদুল মান্নান, ১৫/১ আরামবাগ, রমনা, ঢাকা-২"।[১৬] এ সংস্কণের প্রতিটি পারার প্রচ্ছদের আভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত শ্লোগান ছাপা থাকত—[১৭]

কোরান শরীফ
পড়লে পাবেন ছওয়াব
বুঝলে পাবেন বরকত
মানলে পাবেন নাজাত
নিজে পড়ুন : আপনজনকেও পড়তে দিন

সম্ভবত পারা হিসেবে অনুবাদটির প্রকাশনা আর অগ্রসর হয় নি।

কুরআনের প্রকাশক হিসেবে দি তাজ কোম্পানি ভারত–উপমহাদেশে সুপরিচিত। পাকিস্তানে এ কোম্পানি মূল আরবি সহ ইংরেজি ও উর্দুতে কুরআনের বিভিন্ন অনুবাদ প্রকাশ করে আসছিল। কিন্তু নানা অসুবিধার দরুন বাঙালি মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান অর্জনের দীর্ঘ বিশ বছরের মধ্যেও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করতে সক্ষম হয় নি। সম্ভবত হাকীম আবদুল মান্নান পারা হিসেবে স্বয়ং তাঁর অনুবাদ প্রকাশে অগ্রসর হতে না পারার কারণে তাজ কোম্পানিকেই তাঁর অনুবাদটি প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন।[১৮] তাজ কোম্পানি এ সুযোগ গ্রহণ করে ১৯৬৯ সালে এটি প্রকাশ করেন।

আবদুল মান্নানের এ অনুবাদের প্রথমে একটি 'সূচীপত্র' ছাড়াও অনুবাদ শেষে "সাজদাসমূহের সূচী ও একটি সুদীর্ঘ বিষয়সূচী" "সূরাসমূহের সূচী" ও "পারাসমূহের সূচী" অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইসলামিক একাডেমী

১৯৬১ সালের জুন মাসে **ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা**-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ সংখ্যায় বিখ্যাত ছান্দসিক , কবি ও সাহিত্য সমালোচক আবদুল কাদির "কুরআন মজীদের বাংলা অনুবাদ" নামে একটি প্রবন্ধের সূচনায় মন্তব্য করেন যে, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অনুবাদগুলি পাঠক সমাজে সমাদৃত হলেও সুপ্রচলিত হয়েছে কিনা এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না।" কবি কাদির বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিভিন্ন অনুবাদের একটি তুলনামূলক আলোচনাতে প্রচলিত বঙ্গানুবাদে বলিষ্ঠ ও ব্যঞ্জনাময় এবং অন্তস্পর্শী আবেদনযুক্ত বাংলা তরজমার অভাব লক্ষ্য করেন। তাঁর মতে "কুরআনের ভাষার ছন্দস্পন্দন (rythm) ও গীতধ্বনি ভাবের গতি ও প্রভাব সৃষ্টির প্রধান হেতু। সুতরাং কুরআনের সুগভীর ভাবের যোগ্য বাহন হইতে হইলে তাহার অনুবাদের ভাষা সুঠাম ও সুরেলা হওয়া আবশ্যক।" অতএব তিনি "সহজবোধ্য আধুনিক গদ্যে কুরআন মজীদের একটি Bengali authorized Version প্রকাশ" করার সুপারিশ করেন। তিনি এ বিষয়ে "ঢাকার নবগঠিত ইসলামিক একাডেমীকে এ মহান কাজের দায়িত্ব গ্রহণের বিষয় বিবেচনা" করতে অনুরোধ করেন। তাঁর মতে "এরূপ একটি 'তরজমা আমাদের জ্ঞানের পরিধিই শুধু প্রসারিত করিবে না, বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্ট করিবে। [কারণ] বহু ইংরেজ লেখকের বিষয়কল্পনা ও ভাষাভঙ্গীতে ইংরেজি বাইবেলের প্রভাব প্রচুর ; কুরআনের অনবদ্য বাংলা অনুবাদ হইলে কুরআনের কাহিনী, উপমা অলংকার প্রভৃতির প্রভাব বাঙলা ভাষায় অনিবার্য্য হইবে, ফলে আমাদের প্রসারতা স্বত:সিদ্ধ"।[১৯]

কবি কাদিরের উক্ত সুপারিশের ফলেই হোক কিংবা স্বত:প্রবৃত্ত হয়েই হোক ইসলামিক একাডেমী ইতিপূর্বে প্রকাশিত কুরআনের বঙ্গানুবাদগুলো পরীক্ষা করে নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় :

> প্রথমত : কুরআনুল করীমের ভাষায় যে গতিস্বাচ্ছন্দ্য, ধ্বনিগাম্ভীর্য্য ও ব্যঞ্জনা রহিয়াছে বাঙলা তফসীর ও তর্জমাগুলিতে তাহা পাওয়া যায় না ; মূলের

> ভাবোদ্দীপনা তর্জমায় রক্ষিত না হওয়ায় কুরআনুল করীমের অনন্য মাহাত্ম্য সম্পর্কে পাঠক–পাঠিকাদের কোনো ধারণাই জন্মে না। দ্বিতীয়ত : মামুলি রচনা রীতি তথা ভাষার দুর্বলতা ও আড়ষ্ঠতার দরুন বহু ক্ষেত্রেই কুরআনুল করীমের আয়াতসমূহের নিগূঢ় তাৎপর্য ও অর্থ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। তৃতীয়ত: কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা দলগত সংস্কার ও বিশ্বাসের দ্বারা এইসব তর্জমা তফসীর প্রভাবিত হওয়ায় কুরআনুল করীমের মর্ম গ্রহণে বিভ্রান্তির অবকাশ ঘটিয়াছে। এসব কারণে বাঙলা ভাষায় এখনো মূলানুগত অথচ সুখপাঠ্য এবং ব্যক্তি ও দলগত মতবাদের প্রভাবমুক্ত একখানি সার্থক তর্জমার অভাব রহিয়াছে।

উক্ত অভাব পূরণার্থে ইসলামিক একাডেমী কুরআনুল করীমের একখানি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক তরজমা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এতদুদ্দেশ্যে একটি পাঁচশালা পরিকল্পনা গ্রহণ করলে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আরবি অভিধান এবং আরবি–ফারসি, ইংরেজি, বাংলা, উর্দু তফসির ও অন্যান্য পুস্তক সংগ্রহ করা হয়। মূল তরজমার জন্য এ. এইচ. এম. আবদুল কুদ্দুস, মওলানা মীর আবদুস সালাম ও মওলানা এমদাদউল্লাহকে নিযুক্ত করা হয়। একাডেমীর এসব স্থায়ী কর্মচারী ছাড়াও একাডেমীর পরিচালক আবুল হাশিমের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও সভাপতিত্বে শামসুল ওলামা বেলায়েত হোসেন, শামসুল ওলামা মুহম্মদ আমীন আব্বাসী, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক মওলানা আবদুর রহমান কাশগড়ী, বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামি বিষয়সমূহের অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ সিরাজুল হক, মেশকাত শরীফের অনুবাদক মওলানা ফজলুল করীম, আল–আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত মওলানা আলাউদ্দিন আল–আজহারী, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ এবং অধ্যাপক শাহেদ আলীকে নিয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। ঢাকায় নিযুক্ত মিশরের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি মুহম্মদ মাহমুদ মুস্তাফা সা'বান ছিলেন একজন খ্যাতনামা আরবি সাহিত্যিক ও ভাষা–বিশেষজ্ঞ। কুরআনে ব্যবহৃত বিশেষ আরবি বাগ্‌ধারা, অলঙ্কার ও প্রবচনাদির মর্মোদ্ধারে তাঁর পরামর্শ নেয়া হয়। এদিকে তরজমার ভাষা যাতে বাংলা বাক্‌রীতি সম্মত, প্রাঞ্জল ও সাহিত্যগুণ সম্পন্ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ ও অধ্যাপক শাহেদ আলীকে সম্পাদনা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তরজমা কিয়দ্দূর অগ্রসর হলে এ. এইচ. এম. আবদুল কুদ্দুস তরজমার কাজ থেকে অবসর নেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রথম তিন পারার তরজমার পর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করার অক্ষমতা প্রকাশ করেন। প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁও প্রথম পারা অনুবাদটির পরই অবসর নেন। ভাষা–বিজ্ঞানী ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হন। অনুবাদটির দ্বিতীয় খণ্ড অনুবাদের সময় এ. এফ. এম. আবদুল হক ফরিদী এবং তৃতীয় খণ্ড অনুবাদের সময় ড: সৈয়দ

মোয়াজ্জম হোসেন ও হাফেজ মুহম্মদ মইনুল ইসলাম সম্পাদনা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৭০–৭১ সালে আবুল হাশিম অবসরগ্রহণ করলে আহমদ হোসাইন একাডেমীর পরিচালক নিযুক্ত হলে তাঁকে সম্পাদনা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

একাডেমীর পরিচালক আবুল হাশিমের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং সম্পাদনা পরিষদের সক্রিয় সহযোগিতায় এ তরজমার কাজ চলতে থাকে। পরিচালকের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে সারা সপ্তাহব্যাপী কুরআনের যে অংশটুকু অনূদিত হতো এ-ই প্রতি শুক্রবার সম্পাদনা পরিষদের সামনে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হতো ; পরিষদ কর্তৃক তা সম্পাদনা ও অনুমোদনের পর অনুবাদের চূড়ান্ত পাঠ গৃহীত হতো।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, অনুবাদটির প্রত্যেক পারা পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশ করার কথা ছিল। এভাবে সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশের পর 'কুরআনুল করিম' দু'খণ্ডে প্রকাশ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুবাদের প্রথম পারা ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। এভাবে আরো দুই পারা, সর্বমোট তিন পারা প্রকাশের পর পূর্ববর্তী পরিকল্পনায় রদবদল করা হয়। এতে প্রতি দশ পারার এক একটি খণ্ড প্রকাশিত হবে এবং দু'খণ্ডের পরিবর্তে মোট তিন খণ্ডে সমগ্র কুরআন প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত হয়।

আমপারা কুরআনের সর্বশেষ পারা। একাডেমীর পরিকল্পনা অনুযায়ী এ পারাটির তরজমা সর্বশেষ হওয়ার কথা ছিল। অনুবাদটির তিন–তিনটি পারা প্রকাশের পর পাঠক সাধারণ আমপারা তরজমা সর্বাগ্রে প্রকাশ করার জন্য একাডেমীকে অনুরোধ করেন। পাঠক–পাঠিকাদের এ অনুরোধ রক্ষার জন্য একাডেমী দ্বাদশ পারা অনুবাদের পর পরবর্তী পারার অনুবাদ স্থগিত রেখে আমপারা তরজমার কাজে হাত দেয় এবং প্রথম খণ্ড প্রকাশ করার আগেই আমপারা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরিবর্তিত পরিকল্পনার ফলে 'কুরআনুল করিম'–এর প্রথম খণ্ড ১৯৬৭ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬৯ সালে এবং তৃতীয় খণ্ড ১৯৭১ সালে ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

অনুবাদটির প্রথম খণ্ডের ৬টি (১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭৬, ১৯৭৭ ১৯৮০), দ্বিতীয় খণ্ডের চারটি (১৯৬৯, ১৯৭৫, ১৯৭৮, ১৯৭৯) এবং তৃতীয় খণ্ডের তিনটি মুদ্রণ (১৯৭১, ১৯৭৬, ১৯৭৯) প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ইসলামিক একাডেমী ও বায়তুলমুকাররম সোসাইটিকে একীভূত করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন করা হয়। অতএব, অনুবাদের প্রথম খণ্ডের ৩য়, ৪র্থ, ও ৫ম ; দ্বিতীয় খণ্ডের ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং তৃতীয় খণ্ডের ২য় ও ৩য় মুদ্রণ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নামে প্রকাশিত হয়।

হিজরি ১৪০০ সালে,(অর্থাৎ ১৯৭৯–৮০ সালে) অনুবাদটির সপ্তম মুদ্রণের প্রয়োজন হলে এর পুন:নিরীক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এজন্য এ. এফ. এম. আবদুল হক ফরিদীর সভাপতিত্বে আহমদ হোসাইন, ড. এ. কে আইউব আলী, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'মওলানা ফরিউদ্‌দীন মাসউদ ও এ. টি. এম. মুসলেহউদ্দিন সমন্বয়ে গঠিত একটি সম্পাদনা পরিষদের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

উক্ত পরিষদ অনুবাদটির পুনঃনিরীক্ষণ কালে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন আনয়ন করেন। নীতি হিসেবে এ পরিষদ অনুবাদটিকে সহজবোধ্য ও মূলানুগ করে টীকা ও শানে নুযুল সংক্ষিপ্ত করে এবং আরবি শব্দ লেখার বেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রবর্তিত ও বাংলা প্রতিবর্ণায়ন নীতি–অনুসরণ করে।[২২] এ জাতীয় সংশোধন, পরিবর্তন পরিমার্জনের পর এক বালামে অনুবাদটির ২য় সংস্করণ বা সপ্তম মুদ্রণ ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। এর সর্বশেষ বা একাদশ মুদ্রণ ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ লাভ করে।

দাবি অনুযায়ী ইসলামিক একাডেমী 'কুরআনুল করীম'–এর এ তরজমাটিতে মূলকে অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলা ভাষার প্রকৃতিকে সাধ্যমতো রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। এ জন্য কোনো বন্ধনীর ব্যবহার না করে ভাষার স্বাভাবিক গতিকে অব্যাহত রাখা হয়েছে। শব্দ অনুবাদে কুরআনে ব্যবহৃত বিশেষ আরবি বাগ্ধারা, অলংকার ও প্রবচনগুলোর অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট হয় না ; এজন্য এ তরজমাটিতে যথাসম্ভব এসব বাগ্ধারা, অলংকার ও প্রবচনের সমার্থবোধক বাংলা বাগ্ধারা ও অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে সমার্থবোধক বাংলা বাগ্ধারা ও অংলকার পাওয়া যায় নি, সেসব ক্ষেত্রে তরজমায় সমার্থ দেয়া হয়েছে এবং টীকায় মূল আরবি অর্থের বিকৃতি না ঘটে, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখা হয়েছে।

আবদুর রহমান

অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্সপেক্টর আবদুর রহমান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র কুরআনের তরজমা না করে প্রত্যেক সুরা থেকে বেছে বেছে এমন সব আয়াতের অনুবাদ ও আলোচনা করেছেন, যা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাতে পারে। কারণ, তিনি মনে করেন :

> জীবন সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান চাপে মানুষের অবসরের অবকাশ ও অভিনিবেশের পরিধি অত্যন্ত সংকোচক হয়ে পড়েছে। অতএব, সাধারণ স্বল্প শিক্ষিত ও স্বল্প–অবকাশী নর–নারীর পক্ষে যথোচিত অভিনিবেশ সহকারে কুরআন মজিদ আদ্যন্ত অধ্যয়ন করে তন্নিহিত নিগূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করা বিশেষ কষ্ট সাধ্য। এতদুপরি সাধারণ বাঙ্গলা ও ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের পক্ষে সহজ লভ্য অনুবাদ–তফসিরগুলির দৈর্ঘ্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকাটিপ্পনী এমনই সম্ভ্রমের ভাব উদ্রেগ করে যে আরবী কুরআনের মত ঐগুলিরও সংগ্রহ করে, আলমারীর উচ্চতম তাকে পরম যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে সাজিয়ে রেখে দেয়া হয়। এর ফলে সমাজের শিক্ষিত স্তরেও পবিত্র কুরআনের সংগে প্রত্যক্ষ পরিচিতির সুযোগ ঘটে উঠে নাই। সুতরাং সম্যক ও সঠিক জ্ঞানের অভাবে আমাদের চিন্তা ও কর্মজীবনে, সাহিত্য ও নাটক–নভেলে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠানে ইসলামিক দর্শনের প্রকৃত প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় না।[২৩]

এই শ্রেণীর সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য অনুবাদক যেসব আয়াতে ইসলামের মৌলিক দর্শন, বিশ্বাস ও আদর্শ, আল্লাহ্‌র একত্ব ও মহত্ব, মানুষের ভ্রাতৃত্ব, ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, সেসব আয়াতের সরল বাংলা অনুবাদ করেন। আয়াতের ক্রমিক সংখ্যার ব্যাপারে আল্লামা ইউসুফ আলীকে অনুসরণ করে এ অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে আয়াতগুলোর অর্থবোধের সহায়তার জন্য কিছু কিছু আলোচনাও যোগ করা হয়। এ আলোচনার মধ্যে বর্তমান জীবনের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য কুরআন মজিদ থেকে কি আলোক পাওয়া যেতে পারে তাও দেখানো হয়েছে।

আবদুর রহমানের আনুবাদটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে ১ থেকে ৭, দ্বিতীয় খণ্ডে ৮ থেকে ৩৯ এবং তৃতীয় খণ্ডে ৪০ থেকে ১১৪ সুরা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত ও নির্বাচিত এ অনুবাদটির প্রথম খণ্ড ১৯৬০, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। এভাবে তিন খণ্ডের অনুবাদ ছাড়াও আবদুর রহমান বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে আমপারাও অনুবাদ করেন। তাঁর আমপারার অনুবাদটির প্রথম সংস্করণ ১৯৬২ এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

আবদুর রহমান কর্তৃক অনুবাদটি প্রকাশিত হলে কবি গোলাম মোস্তফা[২৪] এটি মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনের সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আবুল ফজলের মতে[২৫] অনুবাদক তাঁর অনুবাদে "অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে যুগ জীবনের সঙ্গে ঐক্য বিধানের চেষ্টা" করেছেন। তালিম হোসেন[২৬] এ অনুবাদ এবং এর "সন্ধানী আলোচনায় . . . পাঠককে কোরআনের মর্মোপলব্ধিতে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে" বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সৈয়দ আলী আহসানের মতে এটি "কোরআন শরীফের একটি স্বচ্ছ, যৌক্তিক ও সজীব অনুবাদ"।

কাজী আবদুল ওদুদ

কাজী আবদুল ওদুদ[২৭] ১৮৯৬ সালের ২৬শে এপ্রিল ফরিদপুরের পাংশা থানায় বাগমারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী সৈয়দ হোসেন ওরফে ছগির। তিনি ১৯১৩ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯১৭ সালে প্রেসিডেন্সী কজেল থেকে বি. এ. ও ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাস করেন। ১৯২০ সালে তিনি ঢাকা কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। কাজী আবদুল ওদুদ বহু বছর ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার পর কলকাতায় টেক্সট-বুক কমিটির সম্পাদক রূপে বদলি হন। এই পদে থাকা কালেই তিনি অবসরগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর কলকাতার বাড়িতেই ১৯৭০ সালের ১৯শে মে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কাজী আবদুল ওদুদ একজন নামজাদা সাহিত্যিক। অধ্যাপক আলী আহমদ কাজী ওদুদ প্রণীত ২৬টি পুস্তক তাঁর 'মুসলিম বাংলা গ্রন্থপঞ্জীতে' অন্তর্ভুক্ত করেন। এর মধ্যে

পবিত্র কোরআন-এর প্রথম খণ্ড অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সম্ভবত এর দ্বিতীয় খণ্ডের সংবাদ তিনি পান নি। যা হোক, কাজী আবদুল ওদুদ অনূদিত 'পবিত্র কোরআন'-এর প্রথম খণ্ড ১৯৬৬ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। উভয় খণ্ডেরই প্রকাশক ছিলেন অনুবাদক নিজে এবং কলকাতার ভারতী লাইব্রেরি ছিল এর পরিবেশক। তাঁর অনুবাদ সম্বন্ধে কুরআনেরই অন্য একজন অনুবাদক মওলানা আবু তাহের বলেন :[২৮]

> কুরআন শরীফের বাংলা তরজমা তফসীরের মধ্যে আমার দেখা মতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, অনধিকার চর্চা এবং তফসীর বিষয়ের জঘন্যতম দৃষ্টান্ত প্রখ্যাত সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের বাংলা তরজমা। তরজমাটি কুরআন শরীফের পরিবর্তে কাজী সাহেবের নিজের ভাবধারার তর্জমা বলিলে অসত্য হয় না।

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

পবিত্র কুরআন অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম[২৯] জনগণের কাছে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। ১৯৫৪ সাল থেকে শুরু করে দীর্ঘ ত্রিশ বছরেরও অধিককাল যাবৎ মওলানা আমিনুল ইসলাম ঢাকা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে "কুরআনে হাকিম ও আমাদের জিন্দেগী" শিরোনামে আল্লাহর বাণীর তরজমা ও তফসির পরিবেশন করে আসছেন। তদুপরি এই পবিত্র গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে ইতিমধ্যেই তিনি ত্রিশটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এ গ্রন্থরাজির মধ্যে "বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কুরআনের অবদান" মওলানা ইসলামের একটি বহুল প্রচারিত গ্রন্থ। তাঁর এ গ্রন্থটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। এ পর্যন্ত এটির পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং তিন তিনটি জাতীয় পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছে।

কুরআনের পঠন-পাঠন এবং কুরআনের উপর গবেষণায় হাত দিয়েই মওলানা আমিনুল ইসলাম বাংলা ভাষায় কুরআনি সাহিত্যের দৈন্য অনুভব করলেন। দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছরের মধ্যে বাংলা ভাষায় যে কোনো মৌলিক, প্রামাণ্য ও বিস্তারিত তফসির গ্রন্থ রচিত হয় নি, তা তার মতে একটি "নির্মম সত্য" । এতএব তাঁর আকাঙ্ক্ষা হলো বাংলা ভাষায় এমন একটি তফসির প্রণয়ন করা, যা হবে 'মৌলিক,প্রামাণ্য, বিস্তারিত'। শুধু তাই নয়, এটি হতে হবে 'অন্যান্য ভাষায় রচিত মূল্যবান তফসির গ্রন্থসমূহের নির্যাস'। এ আশা পূরণার্থে বিগত ১৯৬৬ সালে সর্বপ্রথম তিনি পবিত্র কুরআন তরজমায় হাত দেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে তাঁর অনূদিত কুরআনের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এ খণ্ডটি ছিল কুরআনের প্রথম ছয় পারার অনুবাদ। বাম দিকের পৃষ্ঠায় মূল আরবি আর ডান দিকের পৃষ্ঠায় বঙ্গানুবাদ সংবলিত এ খণ্ডটি ঝিনুক পুস্তিকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অনুবাদটি এতই জনপ্রিয় হয় যে "অতি অল্প সময়ের মধ্যে এর ৫ হাজার কপি নিঃশেষ হয়ে যায়"।

তাঁর এ তরজমার জনপ্রিয়তা দৃষ্টে মওলানা ইসলাম খুবই উৎসাহিত হন। অচিরেই তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ তফসির রচনায় হাত দেন। কিন্তু বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকার দরুন তাঁর কর্মব্যস্ততা বৃদ্ধি পায়। ফলে, তফসিরের কাজ বিলম্বিত হতে থাকে। ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে তিনি মাসিক **'আল-বালাগ'** পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। শুরু থেকেই মওলানা স্বীয় সম্পাদিত এই পত্রিকায় তাঁর তফসিরটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। এ কাজটি অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। তফসিরটির প্রকাশ শুরু হলে পাঠকবৃন্দের উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁদেরই উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে মওলানা ইসলাম ১৯৮৩ সালের শেষার্ধ থেকে "তফসিরে নূরুলী কোরআন" নামকরণ করে এর প্রথম খণ্ড ছাপা আরম্ভ করেন। প্রায় এক বছরে ১৯৮৪ সালের মে মাসে তাঁর রচিত এ তফসিরটির মুদ্রণ ও প্রকাশের কাজ শেষ হয়। ইতিমধ্যে (১৯৮৮) প্রতি খণ্ডে এক পারা এই হিসেবে অনুবাদ ও তফসিরটির চার পারা প্রকাশিত হয়েছে।[৩০]

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ১৯৩২ সালে কুমিল্লার বরুরা থানার বাঘমারা মিয়া বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আলী মিঞা। স্থানীয় রহমতগঞ্জ মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন। ১৯৫৫ সালে সম্মিলিত মেধার তালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে তিনি কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর সরকারি বৃত্তি লাভ করে দু'বছর হাদিস শাস্ত্রে গবেষণা করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে হজ্ব করেন। ১৯৭৯ সালে মালয়েশিয়া এবং ১৯৮৩ সালে তিনি সোভিয়েত রাশিয়া সফর করেন। তা ছাড়া তিনি মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ব্যাপকভাবে সফর করেন। চল্লিশটি পুস্তকের গ্রন্থকার মওলানা ইসলাম ঢাকা রেডিও ছাড়াও প্রতি শনিবার ঢাকায় আবদুল হাদী লেনের মসজিদ এবং রোববার সাতরওজার মসজিদে কুরআনের তফসির বয়ান করেন। তিনি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রশাসক সংঘেরও সদস্য। এখানে পুনরুল্লেখ করা যায় যে, তিনি লালবাগ শাহী মসজিদের খতীব এবং মাসিক 'আল-বালাগ' পত্রিকার সম্পাদক।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় তফসির পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রায় সবগ্রন্থেই একটি 'মুকাদ্দিমাহ্' বা উপক্রমণিকা দেয়া থাকে। এতে সাধারণত আগেকার তফসিরগুলো সম্বন্ধে কিংবা কুরআন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা থাকে। মওলানা শফি, মওলানা মওদূদী, মওলানা হক্কানী প্রমুখ তফসিরকার 'মুকাদ্দিমা' অংশে অনেক গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সম্ভবত, এঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মওলানা ইসলামও তাঁর তফসিরের প্রারম্ভে অর্থাৎ প্রথম পারার প্রারম্ভে ১৮২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি অবতরণিকা জুড়ে দিয়েছেন। এ অংশ কুরআন তেলাওয়াতের নিয়মাবলী, কুরআনের ফজিলত, তফসির,পবিত্র কুরআনে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির কারণ, রসুলুল্লাহ্‌র সঙ্গীদের বৃত্তান্ত,

নবীদের বিবরণ, প্রথম যুগের তফসিরকারকদের পরিচিতি, এ উপমহাদেশে পবিত্র কুরআন প্রচার, পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

সাধারণত অবতরণিকা বা মুকাদ্দিমাহ্ থাকে যে কোনো গ্রন্থের প্রারম্ভে কিন্তু এটি লেখা হয় কাজটি সমাপ্তির পর। কিন্তু আমাদের জানা নেই, মওলানা ইসলাম ইতিমধ্যে তাঁর তফসির রচনার কাজ সমাপ্ত করে ফেলেছেন কিনা কিংবা তিনি তাঁর তফসিরটির ভূমিকা দিয়েই শুরু করেছেন। আমরা তাঁর ভূমিকাটি পর্যালোচনা করেছি। এতে দেখা যায় যে, তাঁর এক কাজটি মোটেই গবেষণা প্রসূত নয়। এ অংশে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন তরজমা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কতকগুলো মারাত্মক ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর প্রদত্ত মার্টিন লুথার জার্মান ভাষায়, পিটর্স ল্যাটিন ভাষায়, এমদ্রিস ওভায়ের ফ্রেঞ্চ ভাষায় কিংবা ১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দের রুশ ভাষায় কুরআন তরজমা বিষয়ক তথ্যগুলো সর্বৈ ভ্রান্ত। এগুলো তিনি কোথা থেকে পেলেন তা তিনিই জানেন। বাংলা ভাষায় কৃত তরজমাগুলো সম্বন্ধেও তিনি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। কুরআনের বঙ্গানুবাদক গোলাম আকবর আলী ও মোহাম্মদ আব্বাছ আলি-র মধ্যে কেউ 'খান' নন। আবদুল হাকিম-এর সাথে যিনি কুরআন তরজমা করেন তাঁর নাম 'আলী আহসান' নয়, 'আলি হাসান'। গ্রন্থপঞ্জি অংশে তিনি তাঁর তফসির রচনায় যে যে গ্রন্থ ব্যবহার করেছেন, তার সংখ্যা ২২টি বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ সংখ্যা ২২ নয় ; কারণ, তিনি ১৮ ক্রমিক সংখ্যায় "এতদ্ব্যতীত বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ সহ হাদীসের অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ" বলে শেষ করে দিয়েছেন। এভাবে গ্রন্থপঞ্জি পরিবেশন অতীব ত্রুটিপূর্ণ। প্রতিটিগ্রন্থের নামের সঙ্গে প্রকাশকাল, প্রকাশ স্থল, সংস্করণ ও প্রকাশের তারিখ উল্লেখ থাকলে পাঠকগণ পরিবেশিত তথ্য সঠিক কিনা তা যাচাই করে নিতে পারতেন। অনুরূপভাবে যদি সমগ্র তফসিরটিই রচিত হয়ে থাকে তবে তা কতটুকু নির্ভরযোগ্য হবে তা বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারবেন।

আলী হায়দার চৌধুরী

আলী হায়দার চৌধুরী[৩১] নোয়াখালী জেলার নন্দনপুর (দুলাল বাজার) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর বাসস্থান হলো নোয়াখালী জেলার রায়পুর থানার চরপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব কেরামুতউল্লাহ (মৃত্যু ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২)।

আলী হায়দার চৌধুরীর মায়ের ইচ্ছা ছিল তাঁর ছেলে আরবি তথা ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত হন। কিন্তু মায়ের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছেলে মাদ্রাসার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন। কিন্তু মাতৃভক্ত চৌধুরী বরাবর আরবি শিক্ষার প্রতি মনোযোগী থাকেন। ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বি. এ. ক্লাশে তিনি আরবি ভাষা অধ্যয়ন করেন।

ছাত্রজীবন থেকে আলী হায়দার মাতৃভাষা বাংলার সাহায্যে সহজে পড়ার ও বোঝার উপযোগী পবিত্র কুরআনের একটি অনুবাদের অভাব অনুভব করে আসছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ ও বাইবেলের অনুমোদিত পাঠ (authorized version) পড়ে তাঁর এ অনুভূতি আরো প্রবল হয়। এ জন্য তিনি বহু যোগ্য ব্যক্তিকে অনুরূপ একটি অনুবাদ প্রস্তুতের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত কেউ এ ব্যাপারে অগ্রণী না হওয়ায় তিনি নিজেই একটি 'সরল ও সুলভ অনুবাদ 'উপস্থিত করতে প্রয়াস পান।

দীর্ঘকাল পরিশ্রমের ফলে আলী হায়দার তাঁর অনুবাদ শেষ করেন। তাঁর কাজটি ১৯৫৭ সালের আগেই শেষ হয়। অনুবাদ সমাপ্ত হলে তিনি তা কুমিল্লার একটি মুদ্রাকরের হাতে অর্পণ করেন। ঐ মুদ্রাকর এর চার পারা পর্যন্ত মুদ্রণ সমাপ্ত করে ভোটার তালিকা মুদ্রণে ব্যাপৃত হন। ফলে চৌধুরী অনূদিত কুরআনের মুদ্রণ স্থগিত হয়ে যায়।

ঘটনাটি ঘটে আজ থেকে সাইত্রিশ বছর আগে। তৎকালে এ দেশে এখনকার মতো আলোক চিত্র বা জিরক্স এর ব্যবস্থার সুযোগ ছিল না। তাই সম্ভবত অনুবাদক তাঁর অনুবাদটির কোনো প্রতিলিপি হাতে বা রেখে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিই মুদ্রাকরের কাছে দিয়ে দেন। দুর্ভাগ্যবশত মুদ্রাকর মুদ্রণের কাজ করা তো দূরের কথা, পাণ্ডুলিপিই হারিয়ে ফেলেন। ফলে আলী হায়দারকে পুনরায় নতুন করে অনুবাদ কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হয়। দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলে তিনি কুরআনের অনুবাদ পুনরায় সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। এবার তিনি অনুবাদটি প্রকাশের জন্য ঝিনুক পুস্তিকার স্বত্বাধিকারী রুহুল আমিন নিজামীর শরণাপন্ন হন। নিজামী সাহেব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তা ১৯৬৭ সালে মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন।

আলী হায়দার তাঁর অনুবাদে গিরিশচন্দ্র সেন, মওলানা আব্বাছ আলি, আবদুর রহমান খান, আবদুল হাকিম ও আলি হাসানের বঙ্গনুবাদ এবং জে. এম. রডওয়েল, মুহম্মদ পিকথল, আল্লামা ইউসুফ আলী ও মোহাম্মদ আলী-র ইংরেজি অনুবাদের সাহায্য নেন। "যাঁহারা আরবী পড়িতে পারেন না তাহারাও যাহাতে পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী হৃদয়াঙ্গম করিতে পারেন, কোরআনের এই অনুবাদ বিশেষ করিয়া তাঁহাদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে"।[৩২]

অনুবাদটি প্রকাশিত হলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এর সমালোচনাও বেরোয়। অনুবাদটি পড়ে কবি জসীমউদ্‌দীন মনে করেন, "অনুবাদকের নিষ্ঠা ও হৃদয়ানুভূতি বইখানার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"। অধ্যাপক মনসুরউদ্‌দীন মনে করেন,"অনুবাদের ভাষা সরল হওয়াতে এটি জনগণের মন:পূত হয়েছে"। সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্‌দীন এটির বিশেষত্ব নির্দেশ করতে গিয়ে এর স্বল্প মূল্য, সহজ সরল ভাষা ও "বিষয়সূচীর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। 'অবজারভার' পত্রিকার সম্পাদক আবদুস সালাম বলেন, "সহজ সরল, সুস্পষ্ট, সাবলীল ও প্রাণবন্ত বাংলা ভাষায় . . . এই অনুবাদ আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছে।" মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, "ইহা মূলের টীকা-টিপ্পনী বিরল টানা-অনুবাদ। তবে ইহাতে "সুরা', 'রুকু' ও 'পারা'-র নির্দেশ সহ 'আয়াতের' সংখ্যাও দেওয়া আছে। এই অনুবাদে মূল আরবি নাই। অধিকন্তু, নিউজ প্রিন্ট কাগজে মুদ্রিত

(১৯৬৭) হাওয়ায় অনুবাদক ও প্রকাশকের ধর্মীয় প্রেরণার পরিবর্তে ব্যবসা—বুদ্ধিই প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। মূল্যের পরিবর্তে 'হাদীয়া' লিখিয়াও শাক দিয়া মাছ ঢাকা সম্ভবপর হয় নাই। কেবল ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদের সহায়তায় এই অনুবাদ করা হইয়াছে বলিয়া অনুবাদক আমাদিগকে ভূমিকায় জানাইয়া দিয়েছেন। সুতরাং ইহা কতখানি নির্ভরযোগ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়"।[৩৪]

ছৈয়দ মারজুকউল্লা

ছৈয়দ মারজুকউল্লা নোয়াখালী জেলার মন্দারী গ্রামে ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে কুরআন শরীফের প্রথম পাঁচ পারার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। অনুবাদটির আখ্যা হলো "আল–কোরান, শুধু বাংলা, ১–৫ পারা।" অনুবাদক কেন অনুবাদটিতে আরবি মূল সংযোজিত করেন নি তার কৈফিয়তে বলেন :

> কোরানের বাণীগুলি মানুষকে সুপথে চালিত করার জন্য। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই আরবী ভাষা না বুঝার দরুন কোরান শরীফ পাঠে তত উৎসুক হয় না। কোরন শরীফ পাঠ করিতে অজু করার প্রয়োজন হয় বিধায় যখন তখন কোরান শরীফ পড়াও সম্ভব হয় না। অমুসলমানেরা কোরান শরীফ স্পর্শই করে না। ফলে তাদের কাছে কোরানের বাণী পৌছতেই পারে না। মুসলমানদের মধ্যে যারা কোরন শরীফ পাঠ করে তারা সাধারণত: বৃদ্ধবয়সেই পাঠ করে। এর মধ্যে অনেকেই ইংরেজী ও বাংলার সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করে। আর বেশির ভাগ লোক শুধু তেলওয়াতের পুণ্যের জন্যেই পাঠ করে। ফলে ইহকালে পরকালে মানুষের মঙ্গলের পথ প্রদর্শনকারী খোদার বাণীগুলি মানুষ তার পার্থিব জীবনে বিশেষ কোন কাজেই লাগাইতে পারে না। আমার বিশ্বাস খোদার বাণীগুলি শুধু মাত্র বাংলাতে পাইলে যে কোন লেখা পড়া জানা লোক, যে কোন অবসর সময়, এবং গাঁয়ের লোকেরা রাত্রে পুঁথি শুনার মত সময়ে পড়িতে ও শুনিতে পারিবে এবং জীবনের কাজে লাগাইতে পারিবে। এক সময় মোহাম্মদ [আলী] সাহেবের কোরানের ইংরেজী অনুবাদের শুধু ইংরেজীর একটা কপি আমার একজন হিন্দু বন্ধুকে দেই। কয়েক দিন পরে তিনি আমাকে বলেন, এতদিন ইসলাম সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল আপনার দেওয়া কোরানের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া আমার সেই ধারণা সম্পূর্ণ বদলিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কারণে আমি শুধু বাংলা অনুবাদ ছাপিতে ইচ্ছা করিয়াছি। পরে আরবী সহ ছাপিতে আশা করি।

পরে আরবিসহ এ অনুবাদ কিংবা কুরআনের বাকি পঁচিশ পারা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা জানা যায় নি।

মোহাম্মদ ছায়ীদ ইব্রাহীমপুরী

আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী আলেম মোহাম্মদ ছায়ীদ ইব্রাহীমপুরী[৩৭] (১৮৭২-১৯৫২) সরল ও সহজ ভাষায় পবিত্র কুরআনের একটি অনুবাদ ও তফসিরের অভাব অনুভব করেন। নিম্নশিক্ষিত সামান্য কিছু বাংলা জানা মুসলমানদের জন্য কি ধরনের ভাষা ব্যবহার করা উচিত তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে ইব্রাহীমপুরী বাংলা বনেদীছন্দ পয়ার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। এ ভাষায়ই তিনি রসুলুল্লাহ্র জীবনচরিত রচনা করলে তা খুবই জনপ্রিয় হয়। এতে উৎসাহিত হয়ে একান্তই সরল সহজ ও স্বভাবি অথচ আধুনিক বাংলায় দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরের পরিশ্রমের ফলে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, ১৯৫২ সালে, তিনি আবশ্যকীয় তফসির ও যাবতীয় শানে-নুযুল সহ পবিত্র কুরআন অনুবাদ শেষ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটি মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশ করে যেতে পারেন নি।

মৃত্যুর দীর্ঘ ষোল বছর পরে, ১৯৬৮ সালে মওলানার আত্মীয়-স্বজনের চেষ্টায় এর প্রথম 'মঞ্জিল' প্রকাশিত হয়। গতানুগতিক টীকা টিপ্পনীর পদ্ধতি বাদ দিয়ে তিনি আয়াতগুলোর শান-ই-নুযুল বন্ধনীর মধ্যে বর্ণনা করে, অনুবাদ করার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এতে আয়াতগুলোর বক্তব্য বুঝতে সাধারণ পাঠকদের খুবই সুবিধা হবে বলে অনুবাদকের স্থির বিশ্বাস ছিল।

'কুরআনের মুক্তাহার' নামে আখ্যায়িত এই তরজমাতে মওলানা ইব্রাহীমপুরী 'তফসীরে কাদেরী', তফসীরে হুসেইনী', 'তফসীরে আশরাফী,' 'হামায়েল শরীফ' ব্যবহার করায় তাঁর ভাষ্য নির্ভরযোগ্য হওয়ার কথা।

মওলানা ইব্রাহীমপুরীর অনুবাদের উদাহরণস্বরূপ সুরা বাকারার ২৫৫ আয়াত নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

বন্দেগীর উপযুক্ত একা পরোয়ার।
তিনি ভিন্ন উপাস্য না আছে কেহ আর॥
চিরজীবী, চিরস্থায়ী বড় রক্ষী তিনি।
নিদ্রায় তন্দ্রায় তাঁরে ধরে না কখনি॥

মওলানা সাহেবের অনূদিত মোট সাত মঞ্জিলের মধ্যে প্রথম মঞ্জিল মাত্র প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। এতে এক থেকে ছয় পারা: সুরা ফাতেহা, বাকারাহ, আলে-এমরান ও নেছা অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইব্রাহীমপুরীর অনুবাদটি ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী একটি বিস্তারিত আলোচনা ও মূল্যায়নসহ প্রকাশিত হয়। ডক্টর হক এটিকে "আমাদের ধর্মশাস্ত্রীয় সাহিত্যের এক মূল্যবান, অতিমূল্যবান সংযোজন" হিসেবে অভিনন্দিত করেন।

গ্রন্থারম্ভে অনুবাদক 'অবতরণিকা'য় তাঁর অনুবাদের কারণ ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন :

শুধু তাঁহারই অসীম কৃপায় অদ্য সাড়ে তিন বৎসরের অশেষ চেষ্টায় ত্রিশ পারার বঙ্গানুবাদ ও আবশ্যকীয় তফসীর, যাবতীয় শানে নুজুল সহ লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বাঙলা ভাষায় আমার বিশেষ জ্ঞান না থাকায় যদিও এইরূপ সুকঠিন কার্যে দুঃসাহস করা আমার পক্ষে অসঙ্গত ছিল, তবুও একমাত্র সাধারণ মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের দীনী উপকারের দিকে লক্ষ্য করিয়া এই মহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিয়াছি। যে সকল নিম্নশিক্ষিত মুসলমান সামান্য কিছু বাঙলা জানেন, তাঁহাদের পাঠযোগ্য কোনও সরল বাঙলা তফসীর শানে নুজুলসহ অদ্যাবধি কেহ লিখিয়াছেন বলিয়া দেখা যাইতেছে না ; অথচ তাঁহাদেরও কোরআন শরীফের অর্থ বুঝিয়া লওয়া একান্ত দরকার। পবিত্র কোরআনের মত এইরূপ সত্য ও সুন্দর ওয়াজ নছিহতের অন্য কোন কেতাব নাই বরং থাকাও সম্ভবপর নহে। সুতরাং তাহার সমুদয় বিষয় অবগত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত আবশ্যক। আবার সাধারণ মুসলমান ভাইগণ পদ্যে লিখিত কেতাব পাঠ করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন ; তজ্জন্য এই খাকছার "তাওয়ারিখে মোহাম্মদীর" ন্যায় কোরআন শরীফের তফসীরও পদ্যে লিখিতে বাধ্য হইয়াছে। পদ্যের কসাকসিতে যেই সকল অতিরিক্তি শব্দ বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে তাহাদের দুইদিকে উদ্ধার-চিহ্ন (" ") দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে যাহাতে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন যে, ঐ সকল শব্দ কোরআন মজিদের তরজমার অন্তর্গত ও অন্তর্ভুক্ত নহে। তফসীর ও শানে নুজুলগুলিকে কোরআন শরীফ হইতে পৃথকভাবে বুঝিয়া লুইবার নিমিত্ত বন্ধনী চিহ্ন ( ) দ্বারা কটিবন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দুই প্রকার চিহ্নিত পদ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সমস্তই কালামে পাকের বঙ্গানুবাদ মাত্র। প্রত্যেক ছুরার রুকু, আয়াত, কলেমা ও হরফের সংখ্যা রীতিমত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং রুকুর ক্রমিক সংখ্যা প্রতি রুকুর প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে। তফসীরে কাদেরী মুতারজাম, তফসীরে হুছাইনী ও জনাব মাওলানা আশেকে এলাহী ছাহেবের হামায়েল শরীফ হইতে শানে নুজুল সমূহ নকল করত মুজাদ্দেদে জমান মুফাচ্ছেরে দাওয়ান চেরাগে খানদান হজরত মুর্শেদুনা মাওলানা মোহাম্মদ আশরাফ আলী থানবী মরহুম ছাহেবের সুপ্রসিদ্ধ তফসীরে বয়ানুল কোরআনের সাথে ইহার যাবতীয় তরজমা সমঞ্জস ও সমীচীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সমুদয় কেতাবের হাওয়লাবলীও উক্ত গ্রন্থসমূহ হইতে গৃহীত হইয়াছে। যেই সকল স্থানে কেতাবের নাম উল্লেখ না করিয়া শুধু 'তফসীরে লিখিয়াছে' বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সেই সকল স্থানে তফসীরে হুছাইনী বা তফসীরে কাদেরী বুঝিতে হইবে।

অনুবাদকের মৃত্যুর দীর্ঘ ষোল বৎসরাধিকাল পরে মরহুম মওলানার আত্মীয়-স্বজনের প্রচেষ্টায় এর প্রথম মঞ্জিল ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক তাঁদের ভূমিকায়

"পরবর্তী মনজিলগুলিও যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশ করা হইবে" বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কিন্তু এর পরে পরবর্তী মঞ্জিলগুলি প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

মওলানা ইব্রাহীমপুরী চাঁদপুর জেলার নরসিংপুর ডাকঘরের অধীন ইব্রাহীমপুর গ্রামে ১২৭৯ (১৮৭২ ইং) সালের ৭ই বৈশাখ জন্মগ্রহণ করে। তাঁর পিতার নাম দেওয়ান গোলাম আলী। জন্মের পর পিতা–মাতা তাঁর নাম রাখেন ছৈয়দ গোলাম আলী। কিন্তু তাঁর ওস্তাদগণ মোহাম্মদ ছায়ীদ নামে তাঁকে ডাকতেন ও খাতাপত্রে লিখতেন। ফলে, "ছৈয়দ আলী" মোহাম্মদ ছায়ীদ নামেই পরিচিত হন। বাল্যে তিনি সর্বদাই রোগাক্রান্ত থাকতেন। এ জন্য তাঁরপক্ষে মক্তবে যাওয়া সম্ভব হতো না। পিতা–মাতা বাড়িতে ওস্তাদ রেখে তাঁর পড়াশুনার ব্যবস্থা করেন। তিনি স্থানীয় প্রাইমারী স্কুল থেকে নিম্ন প্রাইমারী পাস করার পর চাঁদপুর মাদ্রাসায় ভর্তি হন। চাঁদপুরে থাকতে ভালো না লাগায় তিনি গ্রামের মাদ্রাসায়ই ভর্তি হন। এখানে এক বছর পড়াশুনার পর পিতা–মাতার অমতে চট্টগ্রামে চলে যায়। সেখান থেকে পরে কুমিল্লার মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং মাদ্রাসা পাঠ সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি ঢাকার হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় এক বছর কাল মোদাররসি করেন। এ সময় তিনি ঢাকার নওয়াব বাড়িতে থাকতেন এবং একজন আলেমের কাছে হাদিস বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। অবশেষে মাদারীপুর জুনিয়র মাদ্রাসার হেড মৌলবীর পদপ্রাপ্ত হলে সেখানেই দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। সম্ভবত মাদারীপুর জুনিয়র মাদ্রাসার হেড মৌলবী থাকাকালীন ১৯১০ সালের মার্চ থেকে (১৪ই রবিউস–সানি ১৩২৮ হিজরি) শুরু করে ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাস (৭ই জিলকাদ ১৩৩৩ হিজরি) পর্যন্ত ৫ বছর ৬ মাস ২৮ দিন ব্যয় করে তিনি পয়ার ছন্দে " তাওয়ারিখে মোহাম্মদী" অর্থাৎ হজরত মহম্মদ (দঃ) এর জীবনী রচনা করেন। এটি খুবই জনপ্রিয় হয়। তদ্‌রচিত 'তাওয়ারিখে মোহাম্মদী–র জনপ্রিয়তা দৃষ্টে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মোহাম্মদ ছায়াদী "সাড়ে তিন বৎসরের চেষ্টায়" কাব্যের ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদ করনে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য অনুবাদটির বাকি চব্বিশ পারা আজও অপ্রকাশিত রয়ে গেল।

শাহ্ কমরুজ্জমান

মৌলবী শাহ্ কমরুজ্জমান[৩৮] বাংলা ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ শেরপুর জেলার নিলক্ষিয়া গ্রামে তাঁর নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে। তাঁর পিতার নাম আবুল ওয়াহেদ খোন্দকার ওরফে বছ মিঞা আর মাতার নাম ছকীনা বিবি। বাল্যে বাড়িতে মাতামহের নিকট কুরআন, উর্দু ও ফারসি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শাহ্ কমরুজ্জমান স্কুলে বাংলা ও ইংরেজি পড়া শুরু করেন। তৎপর গ্রামের বাইরে তিনি বিভিন্ন স্কুলে পড়াশুনা করেন। অর্থাভাব হেতু স্কুলে পড়াশুনা চলাকালীন সময়ই তাঁকে মাইনর স্কুলে শিক্ষকতা করতে হয়। এহেন অবস্থায় প্রথমে তাঁর মাতামহ ও পরে তাঁর পিতা এন্তেকাল করেন।

ইত্যবসরে খাজনা বাকির দায়ে কমরুজ্জমানের পৈতৃক সম্পত্তি নিলামে উঠে। তিনি তাঁর মাতামহীর নির্দেশে যথা সাধ্য খাজনা শোধ দিতে সচেষ্ট হন। বাংলা ১৩২৪ সালে

যখন তার বয়স উনিশ, তখন তিনি ডুবারচর বা কামারচর গ্রামের আবদুর রহমান মাস্টারের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আবদুর রহমান মাস্টার তাঁকে ঘর-জামাই হিসেবে গ্রহণ করেন। শর্ত ছিল কন্যার পিতা আরবি পড়ার খরচ দেবেন আর তাঁর অবাধ্য হয়ে দেশত্যাগী হলে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

বিয়ের শর্তানুযায়ী অনুবাদক কমরুজ্জমানের আর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়া হলো না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্বশুরের আদেশে তিনি সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে অচিরেই ফাইনাল মাদ্রাসা পাস করেন। অত:পর তিনি হিন্দুস্তানে গিয়ে পড়াশুনা চালাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্বশুর তাহাকে হিন্দুস্তানে যেতে দিতে নারাজ। অনন্যোপায় হয়ে মরা গরুর চামড়া উঠিয়ে এর বিক্রয়লব্ধ অর্থে তিনি হিন্দুস্তানে চলে যান পড়াশুনার উদ্দেশ্যে। সেখানে তিনি দারসে নিযামী সহি সেত্তাহ পড়েন। তিনি বিভিন্ন ওস্তাদের নিকট পড়াশুনা করেন। প্রত্যেক ওস্তাদ-ই তাঁকে ভালোবাসতেন এবং তাঁদের মাদ্রাসার শিক্ষকতা করতে বলতেন।

ইতিমধ্যে শ্বশুর পীড়িত হয়ে পড়লে কমরুজ্জমানকে তাঁর ওস্তাদের অমতেই স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। দেশে ফেরার পর তিনি শেরপুর হাই মাদ্রাসায় দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন।

একদিন ঝড়-তুফানের কবলে পড়ে শেরপুরের জমিদারের জনৈক হিন্দু নায়েব কমরুজ্জমানের ঘরে আশ্রয় নেন। ঝড় অনেকক্ষণ স্থায়ী থাকায় উক্ত নায়েব কুরআনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অনেক "নতুন তথ্য বিবৃত করেন"। এতে কমরুজ্জমান সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করায় উক্ত নায়েব বলেন, "বাংলা তফছীরে যাহা পাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলাম"। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যা শ্রবণে শাহ সাহেবের "অন্তরে আঘাত লাগে"। "মনের আবেগে অনুতপ্ত হৃদয়ে . . . এই জটিল সমস্যার সমাধানে ব্রতী" হয়ে ইংরেজি ১৯৪০ সালে তিনি কুরআনের অনুবাদ ও ভাষ্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইতিমধ্যে দু'জন এতিম বালকের দত্তক গ্রহণ ও তাদের শিক্ষকতার কাজে ব্যস্ত থাকায় "দীর্ঘ ৭/৮ বৎসর অনুবাদ লেখা বন্ধ থাকে"। অবশেষে ১৯৬৭ সালে, বিশ বছরের পরিশ্রমের ফলে "খুলাসাতুল কুরান নামে কুরানের মর্ম ছোট সাইজে বার হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়"।

অনুবাদের কাজ শেষ হলে এর প্রকাশের সমস্যা দেখা দেয়। অনুবাদকের নিজের কোনো আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা নেই। এদিকে কোনো প্রকাশক ঝুঁকি নেন না। এভাবে আরো দীর্ঘ তিনটি বছরের চেষ্টার পর ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে অনুবাদকের প্রথম খণ্ড অর্থাৎ প্রথম পারা প্রকাশিত হয়। অনুবাদকের মতে "ইহার অবশিষ্ট ঊনত্রিশ খণ্ড ছাপাইতে প্রায় লক্ষ টাকার প্রয়োজন, জোগাড় করার কোন উপায় নাই"। তাই প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি এই ব্যয়ভার বহনের জন্য "সাদাশয় কর্তৃপক্ষ"-এর নিকট আবেদন করেন।

উক্ত আবেদনে সাড়া মিলেছিল কিনা আমাদের জানা নেই। তবে অনুবাদটির "দ্বিতীয় পারা ছায়াকুল" প্রথম পারা প্রকাশের পাঁচ বছর পর ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। কমরুজ্জমান তাঁর অনুবাদ ও ভাষ্য রচনায় " দীর্ঘকাল বহু কষ্ট সহ্য" করেছেন। পারিবারিক অশান্তি কিংবা আর্থিক অনটন কোনো কিছুই তাঁর এ সাধনা থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তফসিরটি প্রণয়ন করতে কমরুজ্জমান যেসব গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন তার একটি তালিকাও তিনি সরবরাহ করেছেন। তাঁর তালিকায় তিনি সর্বমোট ৪৪টি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে তরজমা শায়খ আল হিন্দু, আশরাফ আলী থানবী, তফসির সুদ্‌হিল কুরআন, তফসির হক্কানী প্রভৃতি উর্দু এবং জালালাইন, ইবনে আব্বাস, ইতক্কান প্রভৃতি বিখ্যাত আরবি তফসিরও আছে। এসব পুস্তক ছাড়াও অনুবাদকের আরো পুস্তক সংগ্রহে আছে। এক সময় তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারটি তাঁর শ্বশুরালয় কামারের চর থেকে শেরপুর টাউনে স্থানান্তর করতে হয়। সৌভাগ্যবশত শেরপুরের খানবাহাদুর ফজলুর রহমান ও আফতাব উদ্দীন উকিল তাঁদের বাড়িতে অনুবাদকের গ্রন্থাগার স্থানান্তরের অনুমতি দেন। ফলে তাঁর মূল্যবান গ্রন্থগারটি রক্ষা পায়।

বিখ্যাত বিখ্যাত কুরআন ভাষ্যকারদের মতোই কমরুজ্জমান ৫৯ পৃষ্ঠাব্যাপী "কুরান পরিচায়িকা" নামক এক উপক্রমণিকায় নিজের আত্মজীবনী, তাঁর কুরআন আনুবাদের পটভূমি সহ ২৮টি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, তন্মধ্যে আসবাবে নজুল থেকে অনুবাদ সমস্যা পর্যন্ত কোনোটিই বাদ পড়ে নি। এই ভূমিকাটি কুরআন পঠন-পাঠন বিষয়ে এক অমূল্য সংযোজন।

"অনুবাদ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়" সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনুবাদক তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিও ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আল্লাহর সর্বনামে "আপনি" ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য অনুবাদকদের অনুসরণ না করে কমরুজ্জমান যে সব আরবি শব্দ বাংলাতে প্রচলিত তা আরবি রেখে ও যথোপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করে বাংলা গদ্যরীতি অনুযায়ী অনুবাদ করে গেছেন। "হরফ আল-মুক্বাত্তা'আত" গুলির অর্থ বা ব্যাখ্যা না দিয়ে তিনি এগুলির শুধু বাংলা উচ্চারণ লিখেই ক্ষান্ত হয়েছেন। সহজবোধ্য মনে করে কোনো কোনো স্থলে গ্রাম্য বা চলিত শব্দের ব্যবহার করলেও "গাম্ভীর্য্য প্রকাশ"-এর খাতিরে তিনি তাঁর অনুবাদে "পুরাতন বাংলা ভাষা ব্যবহার"-এর প্রয়াস পেয়েছেন। বন্ধনীর ব্যবহার থাকলেও মূল অনুবাদেই বক্তব্য প্রকাশ, "শব্দের দ্বিত্ব বিশেষ না করা, প্রয়োজনে একটি আরবী বাক্যকে বঙ্গানুবাদে একাধিক বাক্যে পরিণত করা,সঠিক আয়াত সংখ্যা এবং সংশয় ভঞ্জনের জন্য কিছু আরবী টীকা সংযোজন" হলো তাঁর অনুবাদের বৈশিষ্ট্য।

আনুবাদে সুরার ফজিলত, আরবি আয়াত-এর নিচে বঙ্গানুবাদ, বিষয় আলোচনা ও টীকা-টিপ্পনী আছে। এ নিয়মে প্রথম পারা ২২৬ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় পারা ২৪৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়।

১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় পারা প্রকাশের পর অনুবাদটির প্রকাশ বিলম্বিত হয়। সম্ভবত আর্থিক অসুবিধাই এর কারণ। অতঃপর ১৯৮১ সালে short revised edition' হিসেবে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এ সংস্করণে মূল আরবি বাদ দেয়া হয়। অনুরূপভাবে ২য়

খণ্ড (১৯৮৩), তৃতীয় খণ্ড (১৯৮৬) ও চতুর্থ খণ্ড (১৯৮৭) — এ চার খণ্ডে সমগ্র কুরআনের অনুবাদটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

চতুর্থ খণ্ডটি প্রকাশের পর অনুবাদক নিজেই ঢাকায় এসে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে তা সরবরাহ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে আমি তাঁর কাছ থেকে দু'টি কপি নগদ মূল্যে ১১০ টাকায় কিনে নেই। এতে তিনি অবাক হন। সবাই নাকি বিনা মূল্যেই তাঁর কাছ থেকে অনুবাদটি নিয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত আমি সেদিন কোনো সভা উপলক্ষে ব্যস্ত ছিলাম। অন্যথায় তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর অনুবাদকর্মের সুখ-দুঃখের ইতিহাস আরো সংগ্রহ করে রাখতে পারতাম।

মুহম্মদ আবদুল বারি

বাংলা ভাষায় কুরআ্যানের ত্রিশ সংখ্যক পারা আমপারার বেশ কয়েকটি কাব্যানুবাদ প্রচলিত। এ বিষয়ে গোলাম আকবর আলী-র অনুবাদ সর্বপ্রাচীন। আমিরুদ্দীন বশুনিয়াও কাব্যানুবাদ করেন। পরে আবুল ফজল আবুদল করিম ও কবি কাজী নজরুল ইসলাম এরূপ অনুবাদে ব্রতী হন। কিন্তু এঁদের কেউ সমগ্র কুরআনের কাব্যানুবাদ করে যান নি। মুহম্মদ ছায়ীদ ইব্রাহীমপুরী সমগ্র কুরআন কাব্যানুবাদ করেন। কিন্তু এর শুধুমাত্র প্রথম মঞ্জিলটিই প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলায় ভাষা কুরআনের কাব্যানুবাদের অভাব দৃষ্টে ফরিদপুর জেলার পূর্ব খাবাশপুরের বাসিন্দা এবং ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুহম্মদ আবদুল বারী[৩৯] অনুরূপ একটি অনুবাদে হাত দেন। কিন্তু আরবি ভাষায় তেমন অধিকার না থাকায় তিনি বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রচলিত বিভিন্ন অনুবাদের সাহায্যে তিনি এরূপ অনুবাদে ব্রতী হন।

শাব্দিক অনুবাদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই ভাবানুবাদের আশ্রয় নেন। তিনি এ অনুবাদের আরবি ভাষা মুদ্রিত না করে প্রতি আয়াতে সংখ্যা নির্দেশ করেছেন যাতে আরবি মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায়।

অনুবাদটির প্রথম খণ্ডে দশ পারা ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ ১২ বছর বিরতির পর বাকি বিশ পারা প্রকাশের সময় সমগ্র অনুবাদটি এক বালামে ১৯৮২ সালে প্রকাশ লাভ করে।

মোহাম্মদ তাহের

পশ্চিমবঙ্গের "স্বনামধন্য সাহিত্যিক, কলিকাতা মাদ্রাসার হাদীস তফসীর শাস্ত্রের সিনিয়র অধ্যাপক" মওলানা মোহাম্মদ তাহের[৪০] পাঁচ খণ্ডে "আল-কুরআন : তরজমা ও তফসীর" প্রকাশ করেন। অনুবাদটির প্রথম খণ্ড ১৯৭০, দ্বিতীয় খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ড ১৯৭১

এবং চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। কলকাতার মদীনী মিশন কর্তৃক প্রকাশিত এ গ্রন্থে দীর্ঘ ষোল পৃষ্ঠাব্যাপী একটি অতীব মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে।

উপসংহার

আমাদের পাকিস্তানোত্তর সমীক্ষায় কুরআন–আল–করীমের ১৬টি অনুবাদ দেখতে পেয়েছি। এ অনুবাদগুলোর মধ্যে দুটি অনুবাদ পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত আরো একটি অনুবাদ কোরাণ প্রচার পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ রফিকুল হাসান তাঁর পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ·ছাড়াও অনুবাদটির কয়েকটি খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু খণ্ডগুলো আমরা দেখি নি।

পূর্ব পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত ১৪টি অনুবাদের মধ্যে ৮টি অনুবাদ সম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে। মওলানা ছায়ীদ–এর অনুবাদটি সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু অনুবাদকের মৃত্যু হলে তাঁর বংশধরগণ মাত্র এক মঞ্জিল প্রকাশ করতে সক্ষম হন। গোলাম মোস্তফা–র অনুবাদের মাত্র সুরা বাকারা, এ. কে. আহম্মদ প্রথম পারা, সৈয়দ মারজুকউল্লা পাঁচ পারা পর্যন্ত প্রকাশ করতে সক্ষম হন। আবদুর রহমান সমগ্র কুরআন অনুবাদ করেন নি কিন্তু প্রতিটি সুরা থেকে তিনি কেবল নির্বাচিত আয়াতের অনুবাদ প্রকাশ করেন। মওলানা আমিনুল ইসলাম ছয় পারার অনুবাদ প্রকাশ করে পুনরায় বিস্তারিত তফসির প্রণয়নে মনোনিবেশ করায় এ পর্যন্ত মাত্র চার পারা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. মুহম্মদ এনামুল হক, **পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম**, (ঢাকা : ১৯৪৮), পৃ. ১৪৩–১৫৮।

২. তফসীরে আশরাফী, (ঢাকা : ১৯৪৯), ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩. **উপর্যুক্ত**।

৪. তাহের, **প্রাগুক্ত**, "ভূমিকা", পৃ. ১০।

৫. আলী আহমদ (১৯৮৬), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭–৫৮; আবদুস সোবহান, **প্রাগুক্ত**।

৬. এনামুল হক (১৯৬৮) **প্রাগুক্ত**।

৭. তাহের (১৯৭০), **প্রাগুক্ত**, "ভূমিকা" পৃ. ১০।

৮. ফিরোজা খাতুন, **কবি গোলাম মোস্তফা** (ঢাকা : ১৯৬৭), আবদুল হাকিম "গোলাম মোস্তফা", **বাংলো বিশ্বকোষ** ২য় খণ্ড, (ঢাকা : ১৯৭৪) পৃ. ৩৬৩–৬৪।

৯. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, **গোলাম মোস্তাফা**, (ঢাকা : ১৯৮৭), পৃ. ৪৩।

১০. **নওবাহার**, ৪ : ৬ (১৩৫৯ বাং), পৃ. ২৪৭–২৪৯।

১১. মওদূদী সম্পর্কে ইংরেজি ও উর্দুতে অনেক পুস্তক আছে। মওদূদীর তফহিম আল -কুরআন–এ তাঁর মতামত বিতর্কিত বিষয়। এ সম্বন্ধে বহু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। মওদূদীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ও সমালোচনার জবাব দিয়ে মুহম্মদ ইউসুফ, **মাওলানা মওদূদী** পর ইতে বাজাত কা ইলমি জায়েজা' নামক পুস্তকটি বাংলাতে : মুফতি মুহম্মদ ইউসুফ, **মাওলানা**

মওদূদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তাত্ত্বিক সমালোচনা (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯০। ২য় খণ্ড।

মওদূদী সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক : আব্বাস আলী খান, **আলেমে দ্বীন** সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, (ঢাকা : ১৯৮৫), পৃ. ৩২।

১২ আবদুল মান্নান, **কোরান শরীফ** (ঢাকা : ১৯৬৯), ভূমিকা, পৃ. ১।

১৩ **উপর্যুক্ত।**

১৪ মান্নান, **১ম পারা** (ঢাকা : ১৯৬২) মলাটের শেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞপ্তি।

১৫. **উপর্যুক্ত**, মলাটের শেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞপ্তি।

১৬ **উপর্যুক্ত।**

১৭ উপর্যুক্ত।

১৮ **উপর্যুক্ত** (ঢাকা : ১৯৬৯) 'প্রকাশকের আরজ"।

১৯ আবদুল কাদির, **প্রাগুক্ত**

২০ কুরআনুল করিম, ১ম পারা (ঢাকা : ১৯৬৩), ভূমিকা।

২১ উপর্যুক্ত, আমপারা, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : ১৯৬৭), ২য় খণ্ড (ঢাকা : ১৯৬৯) এবং ৩য় খণ্ড (ঢাকা: ১৯৭১) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২২ **উপর্যুক্ত** (ঢাকা : ১৯৮৩), ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২৩ আবদুর রহমান : **কোরআন ও জীবন দর্শন** (ঢাকা : ১৯৬০) ভূমিকা।

২৪ **লেখক সঙ্ঘ পত্রিকা** (কার্তিক ১৩৬৮ বাং), পৃ. ৩৮৪ ।

২৫ **মাহে-নও** (জুলাই ১৯৬১), পৃ. ৫৫।

২৬ **ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা**, ১ : ৩ (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৬১), পৃ. ৪৬৫।

২৭ সাইদ-উর-রহমান, **ওদুদ-চর্চা** (ঢাকা : ১৯৮২)

২৮ তাহের, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ১০।

২৯ অনুবাদক সম্বন্ধে প্রায় সমগ্র গ্রন্থই তাঁর অনূদিত তফসিরে **"নূরুল কোরআন"** প্রদত্ত ভূমিকা ও বিজ্ঞাপনাদি থেকে নেয়া হয়েছে।

৩০ সমালোচনার জন্য হাসান আবদুল কাইউম, "তফসিরে নূরুল কোরআন", **দৈনিক ইত্তেফাক**, ২৫ আষাঢ় ১৩৯৩ (বাং) সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩১ আলী হায়দার চৌধুরী, **কোরআন শরীফ** (ঢাকা : ১৯৬৭), ভূমিকা।

৩২ **উপর্যুক্ত, প্রকাশকের আরজ।**

৩৩ আলী হায়দার চৌধুরী, **হাদীসে রসূল** (ঢাকা : ১৯৭৫), শেষের বিজ্ঞাপন।

৩৪ এনামুল হক (১৯৬৮), **প্রাগুক্ত।**

৩৫ তোফায়েল, **নোয়াখালির লেখক ও বুদ্ধিজীবী পরিচিতি** (ঢাকা : ১৩৯৩ বাং), পৃ. ২৫।

৩৬ ছৈয়দ মারজুকউল্লা, **আল-কোরান** (ঢাকা : ১৯৬৭), **ভূমিকা।**

৩৭ ইব্রাহীমপুরী, তাঁর **তাওয়ারিখে মোহাম্মদী** (ঢাকা : ১৯৬৪), পৃ. ৯০৮-এ তাঁর পরিচিতি দিয়েছেন।

৩৮ শাহ্ কমরুজ্জমান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তদীয় অনুবাদের বিভিন্ন খণ্ডের ভূমিকা থেকে সংগৃহীত।

৩৯ অনুবাদ প্রারম্ভে তদীয় ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪০ মোহাম্মদ তাহের, **আল-কুরআন**, ১ম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৭০) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ আমলে কুরআন অনুবাদ

১৯৭২-১৯৯৫

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলা প্রচলন শুরু হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও মাদ্রাসাগুলোতেও বাংলা ভাষায় শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। ফলে কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, ইত্যাদি আরবি গ্রন্থ প্রচুর সংখ্যায় অনূদিত হতে থাকে।

আমাদের সমীক্ষায় আমরা ১৯৭২ থেকে ১৯৯৫, এ চব্বিশ বছরের মধ্যে ত্রিশটি বাংলা অনুবাদের সন্ধান পেয়েছি। এ ত্রিশটি অনুবাদের মধ্যে সাতটি অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাকি তেইশটি অনুবাদ অসম্পূর্ণ রয়েছে কিংবা ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। ।

বাংলাদেশোত্তর অনুবাদগুলির মধ্যে মোবারক করীম জওহর, ফজলুর রহমান আনওয়ারী, ফজলুর রহমান মুনশী, পিয়ার আলী নাজির, মাজহারউদ্দীন আহমদ-এর অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে। এ অনুবাদগুলোর প্রায় সবকটিরই একাধিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।

মওলানা মুহম্মদ শফি-র উর্দু তরজমা ও তফসিরটি ভারত উপমহাদেশে বিখ্যাত। তাঁর এ তফসিরটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মুহিউদ্দীন খান অনুবাদ করেন। "তফসিরে মা'আরেফুল কোরআন" নামে আখ্যায়িত ৮ খণ্ডে অনূদিত এ তফসিরটির প্রথম সংস্করণ ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪-এ পাঁচ বছরে প্রকাশিত হয়। ইতিমেধ্যেই এর বেশ কয়েকটি পুনর্মুদ্রণ বা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুজীবুর রহমান তফসির ইবনে কাসির অনুবাদের হাত দিয়েছেন। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে এ অনুবাদটির ১০ খণ্ডে নয় পারা মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। ইবনে কাসির-এর অন্য একটি অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রকাশিত হচ্ছে। এটির অনুবাদক প্রফেসর আখতার ফারুক। ইহার দুটি খন্ডে মাত্র চার পারা প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যান্য তফসিরের বঙ্গানুবাদের মধ্যে তফসির জালালাইন, তফসির তাবারী, সৈয়দ কুতুবের তফসির ফি জিলালিল কুরআন এবং আবদুল মজিদ দরিয়াবাদীর উর্দু তফসির তফসীর মাজেদী উল্লেখযোগ্য। এগুলির অনুবাদ এখন খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে।

জামিল-বিন-জিয়ারত (১৯৭৬), সুলতান আলী (১৯৭৬), ওয়াহেদ আলী আনছারী (১৯৭৮), মুহম্মদ হাদিসুর রহমান (১৯৭৮), নূর মোহাম্মদ (১৯৭৯), শামসুল হক (১৯৮২), মোহাম্মদ রেজাউল হক (১৯৮২) হাবিবুর রহমান ও আবদুল মান্নান (১৯৮৪), সদরউদ্দিন চিশতি (১৯৮৬), মোঃ শামছুল হক (১৯৮৭), আমিনুল এহছান (১৯৮৮), মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম (১৯৮৮), মতিউর রহমান খান (১৯৮৯), প্রমুখ-এর অনুবাদগুলি খণ্ডিত। এ গুলোর মধ্যে প্রায় সবগুলোই খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে।

ভারত উপমহাদেশে কাদিয়ানি বা আহমাদিয়ার অভ্যুদয় এ উপমহাদেশের জন্য এক দুর্ভাগ্য। ভণ্ড নবুয়তের দাবিদার পাঞ্জাবের গোলাম আহমদ ১৮৮৯ সালে এ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। এরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কুরআন অনুবাদ ব্যাখ্যার মাধ্যমে এদের মত ও পথ প্রচার করে। ইতিপূর্বে এ নব্য-কাফের সম্প্রদায় বাংলাদেশে বিশেষ প্রসার লাভ করতে পারে নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশ্যত বাংলাদেশোত্তর ধর্মনিরপেক্ষতার ছত্রছায়ায় এরা বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। এ সক্রিয়তার নিদর্শন স্বরূপ কাদিয়ানি ধর্ম প্রবর্তনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১৯৮৯ সালের জুন মাসে ঢাকার আহমদি জামাত "কুরআন মজীদ [এর একটি] বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা" প্রকাশ করে।

সুন্দর অফসেট কাগজে মুদ্রিত এ তরজমার প্রাথমিক বঙ্গানুবাদ করেন প্রাক্তন আহমদি আমির মোহাম্মদ এবং এ ধর্মের সদর মুরব্বী নামে অভিহিত আবদুল আযীম সাদেক। অনুবাদে সহায়তা করেন আহমদি ধর্মের ইংরেজি পত্রিকা রিভিউ অব রিলিজিয়নের প্রাক্তন সম্পাদক মোজাফফর উদ্দীন চৌধুরী। আহমদিয়া প্রচারিত কুরআনের ইংরেজি অনুবাদের টীকা-টিপনীগুলোরই বঙ্গানুবাদ এ তরজমার টীকা-টিপ্পনী। এ গুলোর অনুবাদক আহমদি মকবুল আহমদ খান ও এ. টি. এম. হক।

বিশ্বের যে কোনো ভাষায়ই হোক না কেন আহমদি (বা কাদিয়ানি) অনুবাদের উদ্দেশ্য হলো গোলাম আহমদের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করা তথা মুসলিম বা ইসলামের ছদ্মাবরণে মুসলিমদের ঈমান নষ্ট করে আহমদি ধর্মে দীক্ষিত করা। কাদিয়ানি বা আহমদি এবং বাহাই ধর্মাবলম্বীরা যে কাফের এ বিষয়ে সারা বিশ্বের মুসলিমগণ একমত। কাজেই এদের প্রকাশিত কুরআনের অনুবাদ সাবধানতার সঙ্গে পাঠ করা উচিত। অল্প শিক্ষিত ও সাধারণ মুসলমানের জন্য এ জাতীয় অমুসলিম অনুবাদ পরিহার করা বিধেয়।

www.pathagar.com